হা-মীম আস সাজদাহ

৪১

নামকরণ

দুটি শব্দের সমন্বয়ে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। একটি শব্দ حٰمٓ ও অপরটি السجدة । অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা শুরু হয়েছে হা–মীম শব্দ দিয়ে এবং যার মধ্যে এক স্থানে সিজদার আয়াত আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল হচ্ছে হযরত হামযার (রা) ঈমান আনার পর এবং হযরত উমরের (রা) ঈমান আনার পূর্বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাচীনতম জীবনীকার মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল–কারযীর বরাত দিয়ে এই কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন কিছু সংখ্যক কুরাইশ নেতা মসজিদে হারামের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল এবং মসজিদের অন্য এক কোণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী বসেছিলেন। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন হযরত হামযা ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাংগঠনিক উন্নতি দেখে অস্থির হয়ে উঠছিলো। এই সময় 'উতবা ইবনে রাবী'আ (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) কুরাইশ নেতাদের বললেন, ভাইসব, আপনারা যদি ভালো মনে করেন তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আলাপ করতে এবং তাঁর কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি। সে হয়তো তার কোনটি মেনে নিতে পারে এবং আমাদের কাছেও তা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে। আর এভাবে সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। উপস্থিত সবাই তার সাথে একমত হলো এবং 'উতবা উঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বসলো। নবী (সা) তার দিকে ফিরে বসলে সে বললো ঃ ভাতিজা, বংশ ও গোত্রের বিচারে তোমার কওমের মধ্যে তোমার যে মর্যাদা তা তুমি অবগত আছো। কিন্তু তুমি তোমার কওমকে এক মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছো। তুমি কওমের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছো। গোটা কওমকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছো। কওমের ধর্ম ও তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেছো এবং এমন কথা বলতে শুরু করেছো যার সারবস্তু হলো, আমাদের সকলের বাপ দাদা কাফের ছিল। এখন আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব রাখছি প্রস্তাবগুলো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো। "হয়তো তার কোনটি তুমি গ্রহণ করতে পার।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আপনি বলুন, আমি শুনবো। সে বললো ঃ ভাতিজা, তুমি যে কাজ শুরু করেছো তা দিয়ে সম্পদ অর্জন যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে এতো সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে সম্পদশালী হয়ে

যাবে। এভাবে তুমি যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে থাকো তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিচ্ছি, তোমাকে ছাড়া কোন বিষয়ে ফায়সালা করবো না। যদি তুমি বাদশাহী চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নিচ্ছি। আর যদি তোমার ওপর কোন জিন প্রভাব বিস্তার করে থাকে যাকে তুমি নিজে তাড়াতে সক্ষম নও তাহলে আমরা ভালো ভালো চিকিৎসক ডেকে নিজের খরচে তোমার চিকিৎসা করিয়ে দেই। 'উতবা এসব কথা বলছিলো আর নবী (সা) চুপচাপ তার কথা শুনছিলেন। অতপর তিনি বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আপনি কি আপনার সব কথা বলেছেন? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তাহলে এখন আমার কথা শুনুন। এরপর তিনি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে এই সূরা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। 'উতবা তার দুই হাত পেছনের দিকে মাটিতে হেলান দিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে থাকলো। সিজদার আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি সিজদা করলেন এবং মাথা তুলে বললেন ঃ হে আবুল ওয়ালীদ, আমার জবাবও আপনি পেয়ে গেলেন। এখন যা ইচ্ছা করেন।" 'উতবা উঠে কুরাইশ নেতাদের আসরের দিকে অগ্রসর হলে লোকজন দূর থেকে তাকে দেখেই বললো ঃ আল্লাহর শপথ! 'উতবার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল এটা সেই চেহারা নয়। সে এসে বসলে লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কি শুনে এলে? সে বললো ঃ "আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম! এটা না কবিতা, না যাদু, না গণনা বিদ্যা। হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, আমার কথা শোন এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। আমার বিশ্বাস, এ বাণী সফল হবেই। মনে করো আরবের লোকেরা যদি তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে তাহলে নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা থেকে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং অন্যরাই তাকে পরাভূত করবে। পক্ষান্তরে সে যদি আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব এবং তার সম্মান ও মর্যাদা তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা হবে।" তার এই কথা শোনা মাত্র কুরাইশ নেতারা বলে উঠলো ঃ "ওয়ালীদের বাপ, শেষ পর্যন্ত তোমার ওপর তার যাদুর প্রভাব পড়লো" 'উতবা বললো ঃ "আমি আমার মতামত তোমাদের সামনে পেশ করলাম। এখন তোমাদের যা ইচ্ছা করতে থাকো।" (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪)

আরো কতিপয় মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে শব্দগত কিছু মতপার্থক্য আছে। ঐ সব রেওয়ায়েতের কোন কোনটিতে এ কথাও আছে যে, নবী (সা) তিলাওয়াত করতে করতে যে সময়

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ –

(এখন যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এদেরকে বলে দাও আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির আযাবের মত অকস্মাত আগমনকারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।) আয়াতটি পড়লেন তখন 'উতবা আপনা থেকেই তাঁর মুখের ওপর হাত চেপে ধরে বললো ঃ "আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের কওমের প্রতি সদয় হও।" পরে সে কুরাইশ নেতাদের কাছে তার এ কাজের কারণ বর্ণনা করেছে, এই বলে যে, আপনারা জানেন, মুহাম্মাদের (সা) মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা সত্যে পরিণত হয়। তাই আমি আমাদের ওপর আযাব নাযিল না হয় এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০–৯১, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২)।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

'উতবার এই কথার জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বক্তব্য নাযিল হয়েছে তাতে সে নবীকে (সা) যে অর্থহীন কথা বলেছে সেদিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয়নি। কারণ, সে যা বলেছিলো তা ছিল প্রকৃতপক্ষে নবীর (সা) নিয়ত ও জ্ঞান–বুদ্ধির ওপর হামলা। তার গোটা বক্তব্যের পেছনে এই অনুমান কাজ করছিল যে, তাঁর নবী হওয়া এবং কুরআনের অহী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই অনিবার্যরূপে তাঁর এই আন্দোলনের চালিকা শক্তি হয় ধন–সম্পদ এবং শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের প্রেরণা, নয়তো তাঁর জ্ঞান–বুদ্ধিই লোপ পেয়ে বসেছে (নাউযুবিল্লাহ)। প্রথম ক্ষেত্রে সে নবীর (সা) সাথে বিকিকিনির কারবার করতে চাচ্ছিলো। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে এ কথা বলে নবীকে (সা) হেয় করছিলো যে, আমরা নিজের খরচে আপনার উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করে দিচ্ছি। এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিরোধীরা যখন এ ধরনের মূর্খতার আচরণ করতে থাকে তখন তাদের এ কাজের জবাব দেয়া শরীফ সম্ভ্রান্ত মানুষের কাজ হয় না। তার কাজ হয় তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরা। কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে সে সময় চরম হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রের মাধ্যমে যে বিরোধিতা করা হচ্ছিলো 'উতবার বক্তব্য উপেক্ষা করে এখানে সেই বিরোধিতাকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আপনি যাই করেন না কেন আমরা আপনার কোন কথাই শুনবো না। আমরা আমাদের মনের গায়ে চাদর ঢেকে দিয়েছি এবং কান বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের ও আপনার মাঝে একটি প্রাচীর আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, যা আপনাকে ও আমাদের কখনো এক হতে দেবে না।

তারা তাঁকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলো, আপনি আপনার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান, আপনার বিরোধিতায় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর সবই আমরা করবো।

তারা নবীকে (সা) পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী তৈরী করেছিলো তা হচ্ছে, যখনই তিনি কিংবা তাঁর অনুসারীদের কেউ সর্বসাধারণকে কুরআন শুনানোর চেষ্টা করবেন তখনই হৈ চৈ ও হট্টগোল সৃষ্টি করতে হবে এবং এতো শোরগোল করতে হবে যাতে কানে যেন কোন কথা প্রবেশ না করে।

কুরআন মজীদের আয়াত সমূহের উল্টা পাল্টা অর্থ করে জনসাধারণের মধ্যে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজ তারা পূর্ণ তৎপরতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছিলো। কোন কথা বলা হলে তারা তাকে ভিন্ন রূপ দিতো। সরল সোজা কথার বাঁকা অর্থ করতো। পূর্বাপর প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্থানের একটি শব্দ এবং আরেক স্থানের একটি বাক্যাংশ নিয়ে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরো অধিক কথা যুক্ত করে নতুন নতুন বিষয়বস্তু তৈরী করতো যাতে কুরআন ও তার উপস্থাপনকারী রাসূল সম্পর্কে মানুষের মতামত খারাপ করা যায়।

অদ্ভুত ধরনের আপত্তিসমূহ উত্থাপন করতো যার একটি উদাহরণ এ সূরায় পেশ করা হয়েছে। তারা বলতো, আরবী ভাষাভাষী একজন মানুষ যদি আরবী ভাষায় কোন কথা

শোনায় তাতে মু'জিযার কি থাকতে পারে? আরবী তো তার মাতৃভাষা। যে কেউ ইচ্ছা করলে তার মাতৃভাষায় একটি বাণী রচনা করে ঘোষণা করতে পারে যে, সেই বাণী তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। মু'জিযা বলা যেতো কেবল তখনই যখন হঠাৎ কোন ব্যক্তি তার অজানা কোন ভাষায় একটি বিশুদ্ধ ও উন্নত সাহিত্য রস সমৃদ্ধ বক্তৃতা শুরু করে দিতো। তখনই বুঝা যেতো, এটা তার নিজের কথা নয়, বরং তা ওপরে কোথাও থেকে তার ওপর নাযিল হচ্ছে।

অযৌক্তিক ও অবিবেচনা প্রসূত এই বিরোধিতার জবাবে যা বলা হয়েছে তার সারকথা হলো ঃ

(১) এ বাণী আল্লাহরই পক্ষ থেকে এবং আরবী ভাষায় নাযিলকৃত। এর মধ্যে যেসব সত্য স্পষ্টভাবে খোলামেলা বর্ণনা করা হয়েছে মূর্খেরা তাঁর মধ্যে জ্ঞানের কোন আলো দেখতে পায় না। কিন্তু জ্ঞান–বুদ্ধির অধিকারীরা সে আলো দেখতে পাচ্ছে এবং তা দ্বারা উপকৃতও হচ্ছে। এটা আল্লাহর রহমত যে, মানুষের হিদায়াতের জন্য তিনি এ বাণী নাযিল করেছেন। কেউ তাকে অকল্যাণ ভাবলে সেটা তার নিজের দুর্ভাগ্য। যারা এ বাণী কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছে তাদের জন্য সু–খবর। কিন্তু যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদের সাবধান হওয়া উচিত।

(২) তোমরা যদি নিজেদের মনের ওপর পর্দা টেনে এবং কান বধির করে দিয়ে থাকো, সে অবস্থায় নবীর কাজ এটা নয় যে, যে শুনতে আগ্রহী তাকে শুনাবেন আর যে শুনতে ও বুঝতে আগ্রহী নয় জোর করে তার মনে নিজের কথা প্রবেশ করাবেন। তিনি তোমাদের মতই একজন মানুষ। যারা শুনতে আগ্রহী তিনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারেন এবং যারা বুঝতে আগ্রহী কেবল তাদেরকেই বুঝাতে পারেন।

(৩) তোমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করে নাও আর মনের ওপর পর্দা টেনে দাও প্রকৃত সত্য এই যে, একজনই মাত্র তোমাদের আল্লাহ, তোমরা অন্য কোন আল্লাহর বান্দা নও। তোমাদের হঠকারিতার কারণে এ সত্য কখনো পরিবর্তিত হওয়ার নয়। তোমরা যদি এ কথা মেনে নাও এবং সে অনুসারে নিজেদের কাজকর্ম শুধরে নাও তাহলে নিজেদেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যদি না মানো তাহলে নিজেরাই ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

(৪) তোমরা কার সাথে শিরক ও কুফরী করছো সে বিষয়ে কি তোমাদের কোন অনুভূতি আছে? তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী করছো যিনি বিশাল ও অসীম এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন, যিনি যমীন ও আসমানের স্রষ্টা, যার সৃষ্ট কল্যাণ সমূহ দ্বারা তোমরা এই পৃথিবীতে উপকৃত হচ্ছো এবং যার দেয়া রিযিকের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছো? তাঁরই নগণ্য সৃষ্টি সমূহকে তোমরা তাঁর শরীক বানাচ্ছো আর এ বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করলে জিদ ও হঠকারিতা করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো?

(৫) ঠিক আছে, যদি মানতে প্রস্তুত না হও সে ক্ষেত্রে আদ ও সামূদ জাতির ওপর যে ধরনের আযাব এসেছিল অকস্মাত সে ধরনের আযাব আপতিত হওয়া সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও। এ আযাবও তোমাদের অপরাধের চূড়ান্ত শাস্তি নয়। বরং এর পরে আছে হাশরের জবাবদিহি ও জাহান্নামের আগুন।

(৬) সেই মানুষ বড়ই দুর্ভাগা যার পেছনে এমন সব জিন ও মানুষ শয়তান লেগেছে যারা তাকে তার চারদিকেই শ্যামল–সবুজ মনোহর দৃশ্য দেখায়, তার নির্বুদ্ধিতাকে তার সামনে সুদৃশ্য বানিয়ে পেশ করে এবং তাকে কখনো সঠিক চিন্তা করতে দেয় না। অন্যের কথা শুনতেও দেয় না। এই শ্রেণীর নির্বোধ লোকেরা আজ এই পৃথিবীতে পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্ছে ও লোভ দেখাচ্ছে এবং প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রশ্রয় পেয়ে দিনকাল ভালই কাটাচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দুর্ভাগ্যের পালা আসবে তখন তাদের প্রত্যেকেই বলবে, যারা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিলো তাদের হাতে পেলে পায়ের তলায় পিষে ফেলতাম।

(৭) এই কুরআন একটি অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ। তোমরা নিজেদের হীন চক্রান্ত এবং মিথ্যার অস্ত্র দিয়ে তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। বাতিল পেছন থেকে আসুক, মুখোশ পরে আসুক কিংবা পরোক্ষভাবে আক্রমণ করুক কখনো তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না।

(৮) তোমরা যাতে বুঝতে পার সে জন্য কুরআনকে আজ তোমাদের নিজেদের ভাষায় পেশ করা হচ্ছে। অথচ তোমরা বলছো, কোন অনারব ভাষায় তা নাযিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমাদের হিদায়াতের জন্য যদি আমি কুরআনকে আরবী ছাড়া ভিন্ন কোন ভাষায় নাযিল করতাম তাহলে তোমরাই বলতে, এ কোন ধরনের তামাশা, আরব জাতির হিদায়াতের জন্য অনারব ভাষায় বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে যা এখানকার কেউই বুঝে না। এর অর্থ, হিদায়াত লাভ আদৌ তোমাদের কাম্য নয়। কুরআনকে না মানার জন্য নিত্য নতুন বাহানা তৈরী করছো মাত্র।

(৯) তোমরা কি কখনো এ বিষয়টি ভেবে দেখেছো, যদি এটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় যে, এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাহলে তা অস্বীকার করে এবং তার বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হয়ে তোমরা কোন পরিণতির মুখোমুখি হবে?

(১০) আজ তোমরা এ কুরআনকে মানছো না। কিন্তু অচিরেই নিজের চোখে দেখতে পাবে, এ কুরআনের দাওয়াত দশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তোমরা নিজেরা তার কাছে পরাজিত হয়ে গিয়েছো। তখন তোমরা বুঝতে পারবে, ইতিপূর্বে তোমাদের যা বলা হয়েছিল তা ছিল সত্য।

বিরোধীদেরকে এসব জবাব দেয়ার সাথে সাথে এই চরম প্রতিকূল পরিবেশে ঈমানদারগণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যে সমস্যাবলীর সম্মুখীন ছিলেন সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। মু'মিনদের পক্ষে সে সময় তাবলীগ ও প্রচার তো দূরের কথা ঈমানের পথে টিকে থাকাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছিলো। যে ব্যক্তি সম্পর্কেই প্রকাশ হয়ে পড়তো যে, সে মুসলমান হয়ে গিয়েছে সে–ই শাস্তির যাঁতাকলে পিষ্ট হতো। শত্রুদের ভয়াবহ জোটবদ্ধতা এবং সর্বত্র বিস্তৃত শক্তির মোকাবিলায় তারা নিজেদেরকে একেবারেই অসহায় ও বন্ধুহীন মনে করছিলো। এই পরিস্থিতিতে প্রথমত এই বলে তাদেরকে সাহস যোগানো হয়েছে যে, তোমরা সত্যি সত্যিই বান্ধব ও সহায়হীন নও। বরং যে ব্যক্তিই একবার আল্লাহকে তার রব মেনে নিয়ে সেই আকীদা ও পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে তার কাছে আল্লাহর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং দুনিয়া থেকে শুরু করে

আখেরাত পর্যন্ত তার সাথে থাকে। অতপর তাকে সাহস ও উৎসাহ যোগানো হয়েছে এ কথা বলে যে, সেই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট যে নিজে সৎ কাজ করে, অন্যদের আল্লাহর দিকে আহবান জানায় এবং সাহসিকতার সাথে বলে, আমি মুসলমান।

সেই সময় যে প্রশ্নটি নবীর (সা) সামনে অত্যন্ত বিব্রতকর ছিল তা হচ্ছে, এসব জগদ্দল পাথর যখন এ আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন এসব পাথরের মধ্যে দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের রাস্তা কিভাবে বের করা যাবে? এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য নবীকে (সা) বলা হয়েছে, এসব প্রদর্শনীমূলক বাধার পাহাড় বাহ্যত অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু উত্তম নৈতিক চরিত্রের হাতিয়ার এমন হাতিয়ার যা ঐ সব বাধার পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ করে গলিয়ে দেবে। ধৈর্যের সাথে উত্তম নৈতিক চরিত্রকে কাজে লাগাও এবং যখনই শয়তান উত্তেজনা সৃষ্টি করে অন্য কোন হাতিয়ার ব্যবহার করতে উস্কানি দেবে তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾

হা–মীম। এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জিনিস। এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কুরআন। সেই সব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী।[১]

কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনতেই পায় না। তারা বলে ঃ তুমি আমাদের যে জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছো সে জিনিসের ব্যাপারে আমাদের মনের ওপর পর্দা পড়ে আছে,[২] আমাদের কান বধির হয়ে আছে এবং তোমার ও আমাদের মাঝে একটি পর্দা আড়াল করে আছে।[৩] তুমি তোমার কাজ করতে থাকো আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো।[৪]

১. এটা এই সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। পরবর্তী বক্তব্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে এ ভূমিকায় আলোচিত বিষয়বস্তুর পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে যে সাদৃশ্য আছে তা বুঝা যেতে পারে।

প্রথমে বলা হয়েছে, এ বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ যতদিন ইচ্ছা তোমরা এ অপপ্রচার চালাতে থাকো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ সব কথা রচনা করছেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, এ বাণী বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে এসেছে। তাছাড়া এ কথা বলে শ্রোতাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এ বাণী শুনে যদি তোমরা অসন্তুষ্ট হও তাহলে তোমাদের সেই অসন্তুষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নয়, আল্লাহর বিরুদ্ধে। যদি তা প্রত্যাখ্যান করো তাহলে

কোন মানুষের কথা প্রত্যাখ্যান করছো না, আল্লাহর নিজের কথা প্রত্যাখ্যান করছো। আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকো তাহলে কোন মানুষ থেকে মুখ ফিরাচ্ছো না বরং, খোদ আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।

দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তাহচ্ছে এই যে, এ বাণী নাযিলকারী মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান (রাহমান ও রাহীম)। এ বাণী নাযিলকারী আল্লাহর আর সব গুণাবলীর পরিবর্তে 'রহমত' গুণটি এ সত্যের প্রতি ইংগিত করে যে, তিনি তাঁর দয়ার দাবী অনুসারে এ বাণী নাযিল করেছেন। এর দ্বারা শ্রোতাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, কেউ যদি এ বাণীর প্রতি রুষ্ট হয় বা একে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা ভ্রুকুঞ্চিত করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে নিজের সাথেই শত্রুতা করে। এটা বিরাট এক নিয়ামত যা আল্লাহ মানুষকে পথ প্রদর্শন এবং তার সাফল্য ও সৌভাগ্যের জন্য সরাসরি নাযিল করেছেন। আল্লাহ যদি মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন তাহলে তাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরার জন্য পরিত্যাগ করতেন এবং তারা কোন গর্তে গিয়ে পতিত হবে তার কোন পরোয়াই করতেন না। কিন্তু সৃষ্টি করা ও খাদ্য সরবরাহ করার সাথে সাথে তার জীবনকে সুন্দর করে গোছানোর জন্য জ্ঞানের আলো দান করাও তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন এবং সে কারণেই তাঁর এক বান্দার কাছে এ বাণী নাযিল করছেন, এটা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই রহমত দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হয় তার চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ এবং নিজেই নিজের দুশমন আর কে হতে পারে?

তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এই কিতাবের আয়াত সমূহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এর কোন কথাই অস্পষ্ট ও জটিল নয়, যার ফলে এ কিতাবের বিষয়বস্তু কারো বোধগম্য হয় না বলে সে তা গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করতে পারে না। হক ও বাতিল কি, সত্য সঠিক আকীদা-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস কি, ভাল ও মন্দ নৈতিক চরিত্র কি, সৎ কাজ ও নেক কাজ কি, কোন পথের অনুসরণে মানুষের কল্যাণ এবং কোন পথ অবলম্বনে তার নিজের ক্ষতি এ গ্রন্থে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি এরূপ সুস্পষ্ট ও খোলামেলা হিদায়াত প্রত্যাখ্যান করে কিংবা সেদিকে মনযোগ না দেয় তাহলে সে কোন ওজর ও অক্ষমতা পেশ করতে পারে না। তার এই আচরণের সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে সে ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

চতুর্থ কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এটা আরবী ভাষার কুরআন। অর্থাৎ এ কুরআন যদি অন্য কোন ভাষায় নাযিল হতো তাহলে আরবরা অন্তত এ ওজর পেশ করতে পারতো যে, আল্লাহ যে ভাষায় তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন আমরা সে ভাষার সাথেই পরিচিত নই। কিন্তু এ গ্রন্থ তাদের নিজের ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তা না বুঝার অজুহাত পেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। (এখানে সূরার ৪৪ আয়াতটিও সামনে থাকা দরকার। এ আয়াতে এই বিষয়টিই অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনারবদের জন্য কুরআনের দাওয়াত গ্রহণ না করার যে যুক্তিসংগত ওজর বিদ্যমান আমরা ইতিপূর্বে তার জবাব দিয়েছি। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, টীকা ৫; রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২৩)

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

হে নবী, এদের বলে দাও, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ।[৫] আমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় যে, একজনই মাত্র তোমাদের ইলাহ[৬] কাজেই সোজা তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হও[৭] এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।[৮] মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত দেয় না।[৯] এবং আখেরাত অস্বীকার করে। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।[১০]

পঞ্চম কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এ কিতাব তাদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী। অর্থাৎ কেবল জ্ঞানী লোকেরাই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। অজ্ঞ লোকদের কাছে তা ঠিক তেমনি মূল্যহীন যেমন একটি মূল্যবান হীরক খণ্ড এমন ব্যক্তির কাছে মূল্যহীন যে সাধারণ পাথর ও হীরক খণ্ডের পার্থক্য জানে না।

ষষ্ঠ কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এ কিতাব সু-সংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ এটা শুধু এমন নয় যে, এটা শুধু এক কল্পনাচারিতা, একটি দর্শন এবং একটি আদর্শ রচনা শৈলী পেশ করে, যা মানা না মানায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এ গ্রন্থ বরং চিৎকার করে ডেকে ডেকে গোটা দুনিয়াকে সাবধান করে দিচ্ছে যে, একে মেনে চলার ফলাফল অত্যন্ত শুভ ও মহিমময় এবং না মানার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও ধ্বংসকর। এ ধরনের গ্রন্থকে কেবল কোন নির্বোধই অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করতে পারে।

২. অর্থাৎ আমাদের মন পর্যন্ত তার পৌছার কোন পথই খোলা নেই।

৩. অর্থাৎ এই আন্দোলন আমাদের ও তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তা আমাদের ও তোমাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এটা এমন এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আমাদের ও তোমাদেরকে এক হতে দেয় না।

৪. এর দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমার সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে তোমার কোন সংঘাত নেই। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তুমি যদি তোমার আন্দোলন থেকে বিরত না হও তাহলে নিজের কাজ করে যেতে থাকো। আমরাও তোমার বিরোধিতা পরিত্যাগ করবো না এবং তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আমরা সাধ্যমত সব কিছুই করবো।

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾

২ রুকূ’

হে নবী, এদের বলো, তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরী করছো এবং অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তিনিই বিশ্ব জাহানের সবার রব। তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) ওপর থেকে তার ওপর পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দান করেছেন।[১১] আর তার মধ্যে সব প্রার্থীর জন্য প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পরিমাপে খাদ্য সরবরাহ করেছেন।[১২] এসব কাজ চার দিনে হয়েছে।[১৩] তার পর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন যা সেই সময় কেবল ধূঁয়া ছিল।[১৪] তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন : ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো : আমরা অনুগতদের মতই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম।[১৫]

৫. অর্থাৎ তোমাদের মনের ওপরের পর্দা উন্মোচন করা, বধির কানকে শ্রবণ শক্তি দান করার এবং যে পর্দা দিয়ে তোমরা নিজেরা আমার ও তোমাদের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেছো তা সরিয়ে দেয়ার সাধ্য আমার নেই। আমিতো মানুষ। যে বুঝার জন্য প্রস্তুত আমি কেবল তাকেই বুঝাতে পারি, যে শোনার জন্য প্রস্তুত কেবল তাকেই শোনাতে পারি এবং যে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত কেবল তার সাথেই মিলতে পারি।

৬. অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মনের দুয়ারে পর্দা টাঙ্গিয়ে দাও আর কান বধির করে নাও, প্রকৃত সত্য হলো তোমাদের আল্লাহ অনেক নয়, বরং শুধু মাত্র একজনই। আর তোমরা সেই আল্লাহরই বান্দা। এটা আমার চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান–ধারণা প্রসূত কোন দর্শন নয় যে, তার সঠিক ও ভ্রান্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। আমার কাছে অহী পাঠিয়ে এ সত্য তুলে ধরা হয়েছে, যার ভুল–ত্রুটির লেশমাত্র থাকার সম্ভাবনা নেই।

৭. অর্থাৎ অন্য কাউকে আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করবে না, অন্য কারো দাসত্ব ও পূজা–অর্চনা করবে না, অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকবে না। আর কারো সামনে

আনুগত্যের মাথা নত করো না এবং অন্য কারো রীতি ও নিয়ম–কানুনকে অবশ্য অনুসরণীয় বিধান হিসেবে মেনে নিও না।

৮. আজ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের আল্লাহর সাথে যে বিশ্বাস হীনতার কাজ করে এসেছো এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে শিরক, কুফরী, নাফরমানি ও গোনাহ করে এসেছো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।

৯. এখানে 'যাকাত' শব্দের অর্থ কি তা নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস ও তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ছাত্র ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেন ঃ এখানে 'যাকাত' অর্থ আত্মার সেই পবিত্রতা যা তাওহীদের আকীদা এবং আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা অর্জিত হয়। এই তাফসীর অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হবে, 'যেসব মুশরিক পবিত্রতা অবলম্বন করে না তাদের জন্য ধ্বংস। তাফসীরকারদের আরেকটি গোষ্ঠী যার মধ্যে কাতাদা, সুদ্দী, হাসান বাসারী, দাহহাক, মুকাতিল ও ইবনুস সাইয়েবের মত তাফসীরকারও আছেন তাঁরা এখানে 'যাকাত' শব্দটিকে অর্থ–সম্পদের যাকাত অর্থ গ্রহণ করেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে, 'যারা শিরক করে আল্লাহর হক এবং যাকাত না দিয়ে বান্দার হক মারে তাদের জন্য ধ্বংস।'

১০. মূল আয়াতে أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথাটির আরো দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা কখনো হ্রাস পাবে না। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে না বা সে জন্য খোঁটা দেয়া হবে না, যেমন কোন কৃপণ হিম্মত করে কোন কিছু দিলেও সে দানের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

১১. পৃথিবীর বরকতসমূহ অর্থ অঢেল ও সীমা সংখ্যাহীন উপকরণ যা কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমাগত পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং শুধু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায় এমন ক্ষুদ্র কীট থেকে শুরু করে মানুষের উন্নত সভ্যতার দৈনন্দিন চাহিদা সমূহ পূরণ করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বরকত হচ্ছে বাতাস ও পানি। কারণ, পানির বদৌলতেই ভূ–পৃষ্ঠে উদ্ভিদ, জীবকূল ও মানুষের জীবন সম্ভব হয়েছে।

১২. মূল আয়াতের বাক্য হচ্ছে قَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ – سَوَآءً لِّلسَّائِلِينَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ কতিপয় স্বতন্ত্র মতামত পেশ করেছেন।

কিছুসংখ্যক মুফাসসির এর অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ "পৃথিবীতে প্রার্থীদের সঠিক হিসাব অনুসারে তাদের সমুদয় রিযিক পুরা চার দিনে রাখা হয়েছে।" অর্থাৎ পুরো চার দিনে রাখা হয়েছে এর কম বা বেশী নয়।

ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা ও সুদ্দী এর অর্থ করেন ঃ "পৃথিবীতে তার রিযিকসমূহ চার দিনে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞেসকারীদের জবাব সম্পূর্ণ হয়েছে।" অর্থাৎ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, এ কাজ কতদিনে সম্পন্ন হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ জবাব হচ্ছে চার দিনে সম্পন্ন হয়েছে। ইবনে যায়েদ এর অর্থ বর্ণনা করেন ঃ "প্রার্থীদের জন্য পৃথিবীতে চার দিনের মধ্যে তাদের রিযিকসমূহ সঠিক পরিমাণে প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে রেখেছেন।"

ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম অনুসারে আয়াতের বাক্যাংশে এ তিনটি অর্থই গ্রহণ করার অবকাশ আছে। তবে আমাদের মতে প্রথমোক্ত অর্থ দুটিতে গুণগত কোন বিষয় নেই। স্থানকাল অনুসারে বিচার করলে এ কথা এমনকি গুরুত্ব বহন করে যে, কাজটি চার দিনের এক ঘন্টা কমে বা বেশীতে নয় বরং পূর্ণ চার দিনে সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহর কুদরত, রবুবিয়াত ও হিকমতে কি অপূর্ণতা ছিল যা পূরণ করার জন্য এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে? আয়াতের পূর্বের ও পরের বিষয়ের মধ্যে কোথাও এমন কোন ইংগিত নেই যা দ্বারা বুঝা যায় তখন কোন জিজ্ঞেসকারী এ প্রশ্ন করেছিলো যে এসব কাজ কতদিনে সম্পন্ন হয়েছিলো যার জবাব দিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো। এসব কারণে আমরা অনুবাদের মধ্যে তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছি। আমাদের মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকারের যত মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করবেন তাদের প্রত্যেকের সঠিক চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যের সব সরঞ্জাম হিসাব করে তিনি পৃথিবীর বুকে রেখে দিয়েছেন। স্থল ভাগে ও পানিতে অসংখ্য প্রকারের উদ্ভিদ রয়েছে। এদের প্রতিটি শ্রেণীর খাদ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন অন্য সব শ্রেণী থেকে ভিন্ন। আল্লাহ বায়ুমণ্ডল, স্থল ও পানিতে অসংখ্য প্রজাতির জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি প্রজাতিরই স্বতন্ত্র ধরনের খাদ্য প্রয়োজন। তাছাড়া এসব প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সৃষ্টি মানুষ। মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন শুধু দেহের লালন ও পরিপুষ্টি সাধনের জন্যই নয়, তার রুচির পরিতৃপ্তির জন্যও নানা রকম খাদ্যের প্রয়োজন। আল্লাহ ছাড়া আর কার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল মাটির তৈরী এই গ্রহটির ওপরে জীবনের উৎপত্তি থেকে শুরু করে তার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত কোন্ কোন্ শ্রেণীর সৃষ্টিকুল কত সংখ্যায় কোথায় কোথায় এবং কোন্ কোন্ সময় অস্তিত্ব লাভ করবে এবং তাদের প্রতিপালনের জন্য কোন প্রকারের খাদ্য কত পরিমাণে দরকার হবে। নিজের সৃষ্টি পরিকল্পনা অনুসারে যেভাবে তিনি খাদ্যের মুখাপেক্ষী এসব মাখলুককে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিলেন অনুরূপভাবে তাদের চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য সরবরাহেরও পূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন।

বর্তমান যুগে যেসব লোক মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইসলামী সংস্করণ কুরআনী নেজামে রবুবিয়াতের নামে বের করেছেন তারা سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ এর অনুবাদ করেন "সমস্ত প্রার্থীর জন্য সমান" আর এর ওপর যুক্তি প্রমাণের প্রাসাদ নির্মাণ করেন এই বলে যে, আল্লাহ পৃথিবীতে সব মানুষের জন্য সমপরিমাণে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য পূরণার্থে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন যা সবাইকে খাদ্যের সমান রেশন সরবরাহ করবে। কারণ, এই কুরআন যে সাম্য দাবী করে ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থায় তা কায়েম হতে পারে না। কিন্তু কুরআনের দ্বারা নিজেদের মতবাদসমূহের খেদমত করানোর অতি আগ্রহে তারা এ কথা ভুলে যান যে سَائِلِينَ বা প্রার্থী বলে এ আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে শুধু মানুষ নয় বিভিন্ন শ্রেণীর অন্যান্য সৃষ্টিও রয়েছে, জীবন ধারণের জন্য যাদের খাদ্যের প্রয়োজন। আল্লাহ কি প্রকৃতই এসব সৃষ্টির মধ্যে কিংবা তাদের এক একটি শ্রেণীর সবার মধ্যে জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে সাম্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রকৃতির গোটা ব্যবস্থাপনায় কোথাও কি আপনি সমানভাবে খাদ্য বন্টনের ব্যবস্থা দেখতে পান? প্রকৃত ব্যাপার যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ

হচ্ছে, উদ্ভিদ এবং জীবজগতের মধ্যে, যেখানে মানুষের পরিচালিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নেই, বরং আল্লাহর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সরাসরি রিযিক বন্টনের ব্যবস্থা করছে সেখানে আল্লাহ নিজেই এই "কুরআনী বিধান" লংঘন করেছেন—এমনকি (নাউযুবিল্লাহ) বে-ইনসাফী করেছেন? তারা এ কথাও ভুলে যায়, মানুষ যেসব জীবজন্তু পালন করে এবং যাদের খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব মানুষেরই তারাও سَائِلِيْنَ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ঃ ভেড়া, বকরী, গরু, মোষ, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ও উট প্রভৃতি। সব প্রার্থীকে সমান খাদ্য দিতে হবে এটাই যদি কুরআনী বিধান হয় এবং এ বিধান চালু করার জন্য "নেজামে রবুবিয়াত" পরিচালনাকারী একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে তাহলে সেই রাষ্ট্র কি মানুষ এবং এসব জীবজন্তুর মধ্যেও আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করবে?

১৩. এ স্থানের ব্যাখ্যায় সাধারণভাবে মুফাসসিরদেরকে একটি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জটিলতাটি হচ্ছে, যদি পৃথিবী সৃষ্টির দুই দিন এবং সেখানে পাহাড় স্থাপন, বরকত দান এবং খাদ্যোপকরণ সৃষ্টির জন্য চার দিন ধরা হয় সে ক্ষেত্রে পরে আসমান সৃষ্টির জন্য যে দুই দিনের কথা বলা হয়েছে সেই দুই দিনসহ মোট আট দিন হয়। কিন্তু আল্লাহ কুরআন মজীদের বেশ কিছু জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পৃথিবী ও আসমান সর্বমোট ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন— সূরা আল আরাফ ৫৪, সূরা ইউনুস ৩, সূরা হুদ ৭ এবং সূরা আল ফুরকান ৫৯ আয়াত সমূহ।)

এ কারণে প্রায় সমস্ত মুফাসসিরই বলেন ঃ এই চার দিন পৃথিবী সৃষ্টির দু' দিন সহ। অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির দু' দিন এবং উপরে যেসব জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীতে সেসব জিনিস সৃষ্টির জন্য আরো দু' দিন। এভাবে মোট চার দিনে পৃথিবী তার সব রকম উপায় উপকরণসহ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু একদিকে এটা কুরআন মজীদের বাহ্যিক বক্তব্যের পরিপন্থী আর মূলত যে জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে তা একান্তই কাল্পনিক। যে দু দিনে সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করা হয়েছে মূলত পৃথিবী সৃষ্টির দু দিন তা থেকে ভিন্ন নয়। পরবর্তী আয়াত সমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন দেখতে পাবেন সেখানে এক সাথে পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, আল্লাহ দু' দিনে সাত আসমান নির্মাণ করেছেন। এই সাত আসমান বলে বুঝানো হয়েছে গোটা বিশ্ব জাহান, আমাদের এই পৃথিবীও যার একটা অংশ। তারপর যখন বিশ্ব জাহানের অন্যান্য অসংখ্য তারকা ও গ্রহের মত এই পৃথিবীও উক্ত দু দিনে একটি গ্রহের আকৃতি ধারণ করলো। তখন আল্লাহ সেটিকে জীবকুলের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করলেন এবং চার দিনের মধ্যে সেখানে সেই সব উপকরণ সৃষ্টি করলেন পূর্বোক্ত আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। এ চার দিনে অন্যান্য তারকা ও গ্রহের কি উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে আল্লাহ এখানে তা উল্লেখ করেননি। কারণ যে যুগে কুরআন নাযিল হয়েছিলো সেই যুগের মানুষ তো দূরের কথা এ যুগের মানুষও সেসব তথ্য হজম করার সামর্থ রাখে না।

১৪. এখানে তিনটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। এক, এখানে আসমান অর্থ সমগ্র বিশ্ব জাহান। পরবর্তী আয়াতাংশ থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। অন্য কথায় আসমানের দিকে মনোনিবেশ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বিশ্ব জাহান সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করলেন।

দুই, বিশ্ব জাহানকে আকৃতি দানের পূর্বে তা আকৃতিহীন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গো ধূলির মত মহাশূন্যে বস্তুর প্রাথমিক অবস্থায় ছড়ানো ছিল। ধোঁয়া বলতে বস্তুর এই প্রাথমিক অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ এ জিনিসকেই নীহারিকা (Nebula) বলে ব্যাখ্যা করেন। বিশ্ব জাহান সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় সম্পর্কে তাদের ধ্যান–ধারণাও হচ্ছে, যে বস্তু থেকে বিশ্ব জাহান সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে তা এই ধোঁয়া অথবা নীহারিকার আকারে ছড়ানো ছিল।

তিন, "তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন" বাক্য দ্বারা এ কথা বুঝা ঠিক নয় যে, প্রথমে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তারপর তার ওপরে পাহাড় স্থাপন, বরকত দান এবং খাদ্য উপকরণ সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এসব করার পর তিনি বিশ্ব জাহান সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। পরবর্তী বাক্যাংশ "তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন ঃ তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো, আমরা অনুগতদের মতই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম" এই ভুল ধারণা নিরসন করে দেয়া এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন আসমান ও যমীন কিছুই ছিল না, বরং বিশ্ব জাহান সৃষ্টির সূচনা করা হচ্ছিলো শুধু ثُمَّ (তারপর, অতপর বা পরে) শব্দটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না যে আসমান সৃষ্টির পূর্বেই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিলো। ثُمَّ শব্দটি যে অনিবার্যরূপে সময়–ক্রম বুঝাতে ব্যবহৃত হয় না বর্ণনা–ক্রম বুঝাতেও ব্যবহৃত হয় কুরআন মজীদে তার বেশ কিছু উদাহরণ বিদ্যমান। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুমার, টীকা নম্বর ১২)

কুরআন মজীদের ভাষ্য অনুসারে প্রথমে যমীন না আসমান সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন যুগের মুফাসসিরদের মধ্যে এ নিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিতর্ক চলেছে। একদল এ আয়াত এবং সূরা বাকারার ২৯ আয়াতের মাধ্যমে যুক্তি পেশ করেন যে পৃথিবীই প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। অপর দল সূরা নাযিয়াতের ২৭ থেকে ৩৩ পর্যন্ত আয়াত হতে দলীল পেশ করে বলেন, আসমান প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আসমানের পরে যমীন সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পদার্থ বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যা শেখানোর জন্য কুরআন মজীদের কোথাও বিশ্ব জাহান সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করা হয়নি, বরং তাওহীদ ও আখেরাতের আকীদার প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে আরো অসংখ্য নিদর্শনের মত যমীন ও আসমানের সৃষ্টির বিষয়টিও চিন্তা–ভাবনা করে দেখার জন্য পেশ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আসমান ও যমীন সৃষ্টির সময়–ক্রম বর্ণনা করে যমীন আগে সৃষ্টি হয়েছে না আসমান আগে সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ একেবারেই অপ্রয়েজনীয় ছিল। দুটি বস্তুর মধ্যে এটি বা সেটি যেটিই প্রথমে সৃষ্টি হয়ে থাকুক সর্বাবস্থায় দুটিই আল্লাহর একমাত্র ইলাহ হওয়ার প্রমাণ। তা এ কথাও প্রমাণ করে যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা এ সমগ্র কারখানা কোন খেলোয়াড়ের খেলনা হিসেবে সৃষ্টি করেননি। এ কারণেই কুরআন কোন জায়গায় পৃথিবী সৃষ্টির কথা প্রথমে উল্লেখ করে আবার কোন জায়গায় প্রথমে উল্লেখ করে আসমান সৃষ্টির কথা যে ক্ষেত্রে মানুষের মনে আল্লাহর নিয়ামত সমূহের অনুভূতি সৃষ্টি উদ্দেশ্য হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণত যমীন সৃষ্টির উল্লেখ প্রথমে করেন। কারণ, তা মানুষের সবচেয়ে কাছে। আর যে ক্ষেত্রে আল্লাহর মহত্ব এবং তাঁর কুদরতের পূর্ণতার ধারণা দেয়া উদ্দেশ্য হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণত আসমানের উল্লেখ প্রথমে করেন৷ কারণ, সুদূরবর্তী আসমান চিরদিনই মানুষের মনের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আছে।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۚ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

তারপর তিনি দু'দিনের মধ্যে সাত আসমান বানালেন এবং প্রত্যেক আসমানে তিনি তাঁর বিধান অহী করলেন। আর পৃথিবীর আসমানকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং ভালভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম।[১৬] এসবই এক মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা।

এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়[১৭] তাহলে এদের বলে দাও আদ ও সামূদের ওপর যে ধরনের আযাব নাযিল হয়েছিলো আমি তোমাদেরকে অকস্মাত সেই রূপ আযাব আসার ব্যাপারে সাবধান করছি। সামনে ও পেছনে সব দিক থেকে যখন তাদের কাছে আল্লাহর রসূল এলো[১৮] এবং তাদেরকে বুঝালো আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না তখন তারা বললো ঃ আমাদের রব ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। সুতরাং তোমাদেরকে যে জন্য পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না।[১৯]

১৫. আল্লাহ এ আয়াতাংশে তাঁর সৃষ্টি পদ্ধতির অবস্থা এমন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন যার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি ও মানবীয় সৃষ্টি ক্ষমতার পার্থক্য পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যখন কোন জিনিস বানাতে চায় তখন প্রথমেই নিজের মন–মগজে তার একটা নকশা ফুটিয়ে তোলে এবং সে জন্য পরে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। তারপর ঐ সব উপকরণকে নিজের পরিকল্পিত নকশা ও কাঠামো অনুসারে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য পরিশ্রম করে ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালায়। যেসব উপকরণকে সে নিজের মগজে অংকিত নকশায় রূপদানের চেষ্টা করে চেষ্টার সময় তা একের পর এক বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। কখনো উপকরণের বাধা সফল হয় এবং কাংখিত বস্তু পরিকল্পিত নকশা অনুসারে ঠিকমত তৈরী হয় না। আবার কখনো ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রবল হয় এবং সে উপকরণ সমূহকে কাংখিত রূপদানে সফল হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ কোন দর্জি একটি জামা তৈরী করতে

চায়। এ জন্য সে প্রথমে তার মন–মগজে জামার নকশা ও আকৃতি কল্পনা করে। তারপর কাপড় সংগ্রহ করে নিজের পরিকল্পিত জামার নকশা অনুসারে কাপড় কাটতে ও সেলাই করতে চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টার সময় তাকে উপর্যুপরি কাপড়ের প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হয়। কারণ কাপড় তার পরিকল্পিত নকশা অনুসারে তৈরী হতে সহজে প্রস্তুত হয় না। এমনকি এ ক্ষেত্রে কখনো কাপড়ের প্রতিবন্ধকতা সফল হয় এবং জামা ঠিকমত তৈরী হয় না। আবার কখনো দর্জির প্রচেষ্টা সফল হয় এবং সে কাপড়কে তার পরিকল্পিত নকশায় রূপদান করে। এবার আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করুন। বিশ্ব জাহান সৃষ্টির উপরকণ ধূঁয়ার আকারে ছড়িয়ে ছিলো। বিশ্ব জাহানের বর্তমান যে রূপ আল্লাহ তাকে সেই রূপ দিতে চাইলেন। এ উদ্দেশ্যে তাকে বসে বসে কোন মানুষ কারিগরের মত পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য এবং অন্যান্য তারকা ও গ্রহ–উপগ্রহ বানাতে হয়নি। বরং তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্ব জাহানের যে নকশা ছিল সে অনুসারে তাকে অস্তিত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ তিনি যে ছায়াপথ, তারকারাজি এবং গ্রহ–উপগ্রহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন ঐ সব উপকরণ যেন সেই আকৃতি ধারণ করে সেই নির্দেশ দান করলেন। আল্লাহর আদেশের পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা ঐ সব উপকরণের ছিল না। ঐ উপকরণ সমূহকে বিশ্ব জাহানের আকৃতি দান করতে আল্লাহকে কোন পরিশ্রম করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়নি। একদিকে আদেশ হয়েছে আরেকদিকে ঐ সব উপকরণ সংকুচিত ও একত্রিত হয়ে অনুগতদের মত প্রভুর পরিকল্পিত নকশা অনুযায়ী তৈরী হতে শুরু করেছে এবং ৪৮ ঘন্টায় পৃথিবীসহ সমস্ত বিশ্ব জাহান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির এই অবস্থাকে কুরআন মজীদের আরো কতিপয় স্থানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু এই নির্দেশ দেন, 'হয়ে যাও' আর তখনি তা হয়ে যায়। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১১৫; আল ইমরান, টীকা ৪৪ ও ৫৩; আন নাহল, টীকা ৩৫ ও ৩৬; মার্‌য়াম, টীকা ২২; ইয়াসীন, আয়াত ৮২ এবং আল মু'মিন, আয়াত ৬৮)।

১৬. এসব আয়াত বুঝার জন্য তাফহীমুল কুরআনের নিম্ন বর্ণিত স্থান সমূহ অধ্যয়ন করা সহায়ক হবে ঃ আল বাকারা, টীকা ৩৪; আর রা'আদ, টীকা ২; আল–হিজর, টীকা ৮ থেকে ১২; আল আম্বিয়া, টীকা ৩৪ ও ৩৫; আল–মু'মিনুন, টীকা ১৫; ইয়াসীন, টীকা ৩৭ এবং আস সাফফাত, টীকা ৫ ও ৬।

১৭. অর্থাৎ যিনি এই পৃথিবী ও সারা বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করেছেন তিনি একাই আল্লাহ ও উপাস্য এ কথা মানে না এবং বাস্তবে যারা তাঁর সৃষ্টি ও দাস তাদেরকে উপাস্য বানাবার এবং আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারে তাদেরকে শরীক করার জন্য জিদ করে যেতে থাকে।

১৮. এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, তাদের কাছে একের পর এক রসূল এসেছেন। দুই, রসূলগণ সব উপায়ে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন এং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য কোন উপায় ও পন্থা গ্রহণ করতেই কসুর করেননি। তিন, তাদের নিজ দেশেও তাদের কাছে রসূল এসেছেন এবং তাদের আশেপাশের দেশসমূহেও রসূল এসেছেন।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ
مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي
أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

তাদের অবস্থা ছিল এই যে, পৃথিবীতে তারা অন্যায়ভাবে নিজেদেরকে বড় মনে করে বসেছিলো এবং বলতে শুরু করেছিল ঃ আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা একথা বুঝলোনা যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকারই করে চললো। অবশেষে আমি কতিপয় অমঙ্গলকর দিনে তাদের ওপর প্রবল ঝড়ো বাতাশ পাঠালাম[২০] যেন পার্থিব জীবনেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনাকর আযাবের মজা চাখাতে পারি।[২১] আখেরাতের আযাব তো এর চেয়েও অধিক অপমানকর। সেখানে কেউ তাদের সাহায্যকারী থাকবে না।

আর আমি সামূদের সামনে সত্য পথ পেশ করেছিলাম কিন্তু তারা পথ দেখার চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকা পসন্দ করলো। অবশেষে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়লো। যারা ঈমান এনেছিলো এবং গোমরাহী ও দুষ্কৃতি থেকে দূরে অবস্থান করতো[২২] আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ যদি আমাদের এই ধর্ম পসন্দ না করতেন এবং এ ধর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠাতে চাইতেন তাহলে ফেরেশতা পাঠাতেন। তোমরা যেহেতু ফেরেশতা নও, বরং আমাদের মত মানুষ। তাই তোমাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আমরা এ কথা মানতে প্রস্তুত নই আর তোমরা যে দীন পেশ করছো আমরা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তা গ্রহণ করি এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তোমাদের পাঠিয়েছেন আমরা একথা মানতেও প্রস্তুত নই। "যে উদ্দেশ্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে" তা আমরা মানি না-কাফেরদের এ উক্তি ছিল তীব্র কটাক্ষ। এর অর্থ এ নয় যে,

তারা সেটাকে আল্লাহর প্রেরিত বলে জানতো কিন্তু তা সত্ত্বেও তা মানতে অস্বীকৃতি জানাতো। বরং ফেরাউন হযরত মূসা সম্পর্কে তার সভাসদদেরকে যে ধরনের বিদ্রূপাত্মক উক্তি করেছিলো এটাও সে ধরনের বিদ্রূপাত্মক বর্ণনাভঙ্গি। ফেরাউন তার সভাসদদের বলেছিলো ঃ

اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ (الشعرا ايت – ٢٧)

"যে রসূল সাহেবকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তাকে তো বদ্ধ পাগল বলে মনে হয়।" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, টীকা ১১)

২০. অমঙ্গলকর দিনের অর্থ এ নয় যে, দিনগুলোর মধ্যেই অমঙ্গল নিহিত ছিল। আর আদ জাতির ওপর এই অমঙ্গলকর দিন এসেছিলো বলেই যে আযাব এসেছিল তাও ঠিক নয়। এর অর্থ যদি তাই হতো এবং ঐ দিনগুলোই অমঙ্গলকর হতো তাহলে দূরের ও কাছের সব কওমের ওপরই আযাব আসতো। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে যেহেতু সেই দিনগুলোতে ঐ কওমের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিলো তাই আদ কওমের জন্য সেই দিনগুলো ছিল অমঙ্গলকর। এ আয়াতের সাহায্যে দিনসমূহের মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক হওয়ার প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বুঝাতে "رِيْحًا صَرْصَرًا" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষাবিদদের মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এর অর্থ মারাত্মক 'লু' প্রবাহ; কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস এবং কারো কারো মতে এর অর্থ এমন বাতাস যা প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি হয়। তবে এ অর্থে সবাই একমত যে, শব্দটি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ আযাব সম্পর্কে যেসব বিস্তারিত বর্ণনা আছে তা হচ্ছে, এ বাতাস উপর্যুপরি সাত দিন এবং আট রাত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিলো। এর প্রচণ্ডতায় মানুষ পড়ে গিয়ে এমনভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং মরে মরে পড়ে থাকে যেমন খেজুরের ফাঁপা কাণ্ড পড়ে থাকে (আল হাক্কাহ, আয়াত ৭)। এ বাতাস যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেলেছে (আয যারিয়াত, আয়াত ৪২)। যে সময় এ বাতাস এগিয়ে আসছিলো তখন আদ জাতির লোকেরা এই ভেবে আনন্দে মেতে উঠেছিলো যে, মেঘ চারদিক থেকে ঘিরে আসছে। এখন বৃষ্টি হবে এবং তাদের আশা পূর্ণ হবে। কিন্তু তা এমনভাবে আসলো যে গোটা এলাকাই ধ্বংস করে রেখে গেল (আল আহকাফ, আয়াত ২৪ ও ২৫)।

২১. যে অহংকার ও গর্বের কারণে তারা পৃথিবীতে বড় সেজে বসেছিলো এবং বুক ঠুকে বলতো ঃ আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে অপমান ও লাঞ্ছনাকর এ আযাব ছিল সেই অহংকার ও গর্বের জবাব। আল্লাহ এমনভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত করলেন যে, তাদের জনপদের একটি বড় অংশকে ধ্বংস করে দিলেন, তাদের সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন এবং যে ক্ষুদ্র অংশটি অবশিষ্ট রইলো তারা পৃথিবীর সেই সব জাতির হাতেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলো যাদের কাছে একদিন তারা শক্তির বড়াই করতো। (আদ জাতির বিস্তারিত কাহিনীর জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ,

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝١٩ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٢٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٢١

৩ রুকূ’

আর সেই সময়ের কথাও একটু চিন্তা করো যখন আল্লাহর এসব দুশমনকে দোযখের দিকে যাওয়ার জন্য পরিবেষ্টিত করা হবে।[২৩] তাদের অগ্রবর্তীদেরকে পশ্চাদবর্তীদের আগমন করা পর্যন্ত থামিয়ে রাখা হবে।[২৪] পরে যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।[২৫] তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা জবাব দেবে, সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন।[২৬] তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

টীকা ৫১ থেকে ৫৩; হুদ, টীকা ৫৪ থেকে ৬৬; আল মু'মিনূন, টীকা ৩৪ থেকে ৩৭; আশ–শু'আরা, টীকা ৮৮ থেকে ৯৪; আল আনকাবূত, টীকা ৬৫)।

২২. সামূদ জাতির বিস্তারিত কাহিনী জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫৭ থেকে ৫৯; হূদ, টীকা ৬৯ থেকে ৭৪; আল হিজর, টীকা ৪২ থেকে ৪৬; বনী ইসরাইল, টীকা ৬৮; আশ শুআরা, টীকা ৯৫ থেকে ১০৬; আন নামল, টীকা ৫৮ থেকে ৬৬।

২৩. মূল উদ্দেশ্য একথা বলা যে আল্লাহর আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তাদের পরিবেষ্টন করে আনা হবে। কিন্তু এ বিষয়টিকেই এ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, দোযখের দিকে যাওয়ার জন্য পরিবেষ্টন করে আনা হবে। কেননা দোযখে যাওয়াই তাদের শেষ পরিণাম।

২৪. অর্থাৎ এক একটি বংশ ও প্রজন্মের হিসাব–নিকাশ করে একটার পর একটা সিদ্ধান্ত দেয়া হবে তা নয়। বরং আগের ও পরের সমস্ত বংশ ও প্রজন্মকে একই সময়ে একত্র করা হবে এবং এক সাথেই তাদের হিসাব–নিকাশ নেয়া হবে। কারণ, কোন

মানুষ তার জীবনে ভাল মন্দ যে কাজই করুক না কেন তার জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার প্রভাব শেষ হয় না, বরং তার মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রভাবের জন্য সে-ই দায়ী। অনুরূপ একটি প্রজন্ম তার সময়ে যা কিছুই করে পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের মধ্যে তার প্রভাব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকে। এই উত্তরাধিকারের জন্য মূলত সে:ই দায়ী হয়। ভুল-ত্রুটি নির্ণয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এই সমস্ত প্রভাব ও ফলাফল পর্যালোচনা করা এবং তার সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে ধরা অপরিহার্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন প্রজন্মসমূহ একের পর এক আসতে থাকবে এবং তাদেরকে অবস্থান করানো হতে থাকবে। যখন আগের ও পরের সবাই এসে একত্রিত হবে তখনি কেবল আদালতের কার্যক্রম শুরু হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৩০)।

২৫. বিভিন্ন হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা এসেছে তা হচ্ছে যখন কোন একগুঁয়ে অপরাধী তার অপরাধ সমূহ অস্বীকার করতে থাকবে এবং সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণকেও মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতে তৎপর হবে তখন আল্লাহর আদেশে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ এক এক করে সাক্ষ্য দিবে, সে ঐগুলোর সাহায্যে কি কি কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। হযরত আনাস (রা), হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, টীকা ৫৫)।

যেসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আখিরাত শুধু একটি আত্মিক জগত হবে না, বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এই পৃথিবীতে জীবিত আছে—এ আয়াতটি তারই একটি। শুধু তাই নয়, যে দেহ নিয়ে তারা এই পৃথিবীতে আছে ঠিক সেই দেহই তাদের দেয়া হবে। যেসব উপাদান, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং অণু-পরমাণুর (Atoms) সমন্বয়ে এই পৃথিবীতে তাদের দেহ গঠিত কিয়ামতের দিন সেগুলোই একত্রিত করে দেয়া হবে এবং যে দেহে অবস্থান করে সে পৃথিবীতে কাজ করেছিলো পূর্বের সেই দেহ দিয়েই তাকে উঠানো হবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত দেহ নিয়ে সে পূর্বের জীবনে কোন অপরাধ করেছিলো সেই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই যদি সে অবস্থান করে কেবল তখনি সে সেখানে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে। কুরআন মজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলোও এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। বনী ইসরাঈল, আয়াত ৪৯ থেকে ৫১ ও ৯৮; আল মু'মিনূন, আয়াত ৩৫ থেকে ৩৮ এবং ৮২ ও ৮৩; আস সিজদা, আয়াত ১০; ইয়াসীন, আয়াত ৬৫, ৭৮ ও ৭৯; আস সাফফাত, আয়াত ১৬ থেকে ১৮; আল ওয়াকিয়া, ৪৭ থেকে ৫০ এবং আন নাযিআত, আয়াত ১০ থেকে ১৪।

২৬. এ থেকে জানা গেল কিয়ামতের দিন মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শুধু সাক্ষ্য দেবে না, যেসব জিনিসের সামনে মানুষ কোন কাজ করেছিলো তার প্রতিটি জিনিসই কথা বলে উঠবে। সূরা যিলযালে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ
وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾
وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ
مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾

পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় যখন তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের খবর আল্লাহও রাখেন না। তোমাদের এই ধারণা—যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে—তোমাদের সর্বনাশ করেছে এবং এর বদৌলতেই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।[২৭] এ অবস্থায় তারা ধৈর্য ধারণ করুক (বা না করুক) আগুনই হবে তাদের ঠিকানা। তারা যদি প্রত্যাবর্তনের সুযোগ চায় তাহলে কোন সুযোগ দেয়া হবে না।[২৮] আমি তাদের ওপর এমন সব সঙ্গী চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা তাদেরকে সামনের ও পেছনের প্রতিটি জিনিস সুদৃশ্য করে দেখাতো।[২৯] অবশেষে তাদের ওপরও আযাবের সেই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হলো যা তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানব দলসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিলো। নিশ্চিতভাবেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

"মাটির গভীরে যেসব ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে আছে তা সে বের করে দেবে। মানুষ বলবে এ কি ব্যাপার। সে দিন যমীন তার সব কথা শুনাবে (অর্থাৎ মানুষ তার উপরি ভাগে যা যা করেছে তার সব কাহিনী বলে দেবে।)। কারণ, তোমার রব তাকে বর্ণনা করার আদেশ প্রদান করবেন।"

২৭. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বাসারী (র) খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকে তার রব সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তার আচার-আচরণ সেই ধারণা অনুসারেই নির্ধারিত হয়। সৎ কর্মশীল ঈমানদারের আচরণ সঠিক হওয়ার কারণ সে তার রব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করে। আর কাফের, মুনাফিক ফাসেক ও জালেমের আচরণ ভ্রান্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, রব সম্পর্কে তার ধারণাই ভ্রান্ত হয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক হাদীসে এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ তোমাদের রব বলেন, انا عند ظن عبدى بى 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আমি তার জন্য সেই ধারণার অনুরূপ।'

২৮. এ কথার অর্থ হতে পারে, দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইলে আসতে পারবে না। এ অর্থও হতে পারে যে, দোযখ থেকে বের হতে চাইলে বের হতে পারবে না। আবার এও হতে পারে যে, তওবা করতে বা অক্ষমতা প্রকাশ করতে চাইলে তা গ্রহণ করা হবে না।

২৯. এটা আল্লাহর স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বিধান। খারাপ নিয়ত ও খারাপ আকাংখা পোষণকারী মানুষকে তিনি কখনো ভাল সংগী যোগান না। তার ঝোঁক ও আগ্রহ অনুসারে তিনি তাকে খারাপ সঙ্গীই জুটিয়ে দেন। সে যতই দুষ্কর্মের নিকৃষ্টতার গহবরে নামতে থাকে ততই জঘন্য থেকে জঘন্যতর মানুষ ও শয়তান তার সহচর, পরামর্শদাতা ও কর্মসহযোগী হতে থাকে। কারো কারো উক্তি, অমুক ব্যক্তি নিজে খুব ভালো কিন্তু তার সহযোগী ও বন্ধু-বান্ধব জুটেছে খারাপ, এটা বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রকৃতির বিধান হলো, প্রতিটি ব্যক্তি নিজে যেমন তার বন্ধু জোটে ঠিক তেমনি। একজন সৎ ও নেক মানুষের সাহচর্যে খারাপ মানুষ আসলেও বেশী সময় সে তার সাথে থাকতে পারে না। অনুরূপ অসৎ উদ্দেশ্যে কর্মরত একজন দুষ্কর্মশীল মানুষের সাথে হঠাৎ সৎ ও সম্ভ্রান্ত মানুষের বন্ধুত্ব হলেও তা বেশী সময় টিকে থাকতে পারে না। অসৎ মানুষ প্রকৃতিগত-ভাবে অসৎ মানুষদেরই তার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তার প্রতি অসৎরাই আকৃষ্ট হয়। যেমন নোংরা ময়লা আবর্জনা মাছিকে আকৃষ্ট করে এবং মাছি নোংরা ময়লা আবর্জনার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আর বলা হয়েছে, তারা সামনের ও পেছনের প্রতিটি জিনিস সুদৃশ্য করে দেখাতো। এর অর্থ তারা তাদের মধ্যে এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতো যে, আপনার অতীত মর্যাদা ও গৌরবে ভরা এবং ভবিষ্যতও অত্যন্ত উজ্জ্বল। তারা তাদের চোখে এমন চশমা পরিয়ে দিতো যে, তারা চারদিকে কেবল সবুজ শ্যামল সোভাই দেখতে পেতো। তারা তাদের বলতো, আপনার সমালোচকরা নির্বোধ। আপনি কি কোন ভিন্ন ও বিরল প্রকৃতির কাজ করছেন? আপনি যা করছেন পৃথিবীতে প্রগতিবাদীরা তো তাই করে থাকে আর ভবিষ্যতে প্রথমত আখেরাত বলে কিছুই নেই, যেখানে আপনাকে নিজের সব কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তবে কতিপয় নির্বোধ আখেরাত সংঘটিত হওয়ার যে দাবী করে থাকে তা যদি সংঘটিত হয়ও তাহলে যে আল্লাহ এখানে আপনাকে নিয়ামত রাজি দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন সেখানেও তিনি আপনার ওপর পুরস্কার ও সম্মানের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। দোযখ আপনার জন্য তৈরী করা হয়নি, তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ এখানেও তাঁর নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

এসব কাফেররা বলে, এ কুরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন হট্টগোল বাধিয়ে দেবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে।[৩০] *আমি এসব কাফেরদের কঠিন শাস্তির মজা চাখাবো এবং যে জঘন্যতম তৎপরতা তারা চালিয়ে যাচ্ছে তার পুরো বদলা তাদের দেবো। প্রতিদানে আল্লাহর দুশমনরা যা লাভ করবে তা হচ্ছে দোযখ। সেখানেই হবে তাদের চির দিনের বাসস্থান। তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। এটা তাদের সেই অপরাধের শাস্তি। সেখানে এসব কাফের বলবে, 'হে আমাদের রব, সেই সব জিন ও মানুষ আমাদের দেখিয়ে দাও যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো। আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।*[৩১]

৩০. মক্কার কাফেররা যেসব পরিকল্পনার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন ও তার প্রচারকে ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছিলো এটি ছিল তারই একটি। কুরআন কি অসাধারণ প্রভাব ক্ষমতার অধিকারী, কুরআনের দাওয়াত পেশকারী ব্যক্তি কেমন অতুলনীয় মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ এবং তাঁর এহেন ব্যক্তিত্বের সাথে উপস্থাপনার ভঙ্গি কেমন বিস্ময়করভাবে কার্যকর তা তারা ভালো করেই জানতো। তারা মনে করতো, এ রকম উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মুখ থেকে এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে এই নজিরবিহীন বাণী যেই শুনবে সে শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হবেই। অতএব তারা পরিকল্পনা করলো, এ বাণী না নিজে শুনবে, না কাউকে শুনতে দেবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই তা শুনাতে আরম্ভ করবেন তখনই হৈ চৈ করবে। তালি বাজাবে, বিদ্রূপ করবে, আপত্তি ও সমালোচনার ঝড় তুলবে এবং চিৎকার জুড়ে দেবে যেন তার মধ্যে তাঁর কথা হারিয়ে যায়। তারা আশা করতো, এই কৌশল অবলম্বন করে তারা আল্লাহর নবীকে ব্যর্থ করে দেবে।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝٣٠ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝٣١ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝٣٢

যারা [৩২]ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে[৩৩] নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে[৩৪] এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না[৩৫] এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশী হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাংখা করবে তাই লাভ করবে। এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দায়াবান।

৩১. অর্থাৎ পৃথিবীতে তো এরা তাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রতারক শয়তানদের ইংগিতে নাচছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বুঝতে পারবে এসব নেতা তাদের কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে তখন এরাই আবার তাদেরকে অভিশাপ দিতে থাকবে এবং চাইবে কোনভাবে তাদেরকে হাতের কাছে পেলে পায়ের নীচে ফেলে পিষ্ট করতে।

৩২. এ পর্যন্ত কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতা এবং ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করার পর এখন ঈমানদারদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

৩৩. অর্থাৎ হঠাত কখনো আল্লাহকে রব বলে ঘোষণা করেই থেকে যায়নি এবং এ ভ্রান্তিতেও লিপ্ত হয়নি যে, আল্লাহকে রব বলে ঘোষণাও করেছে এবং তার সাথে অন্যদেরকেও রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। বরং একবার এ আকীদা পোষণ করার পর সারা জীবন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, তার পরিপন্থী অন্য কোন আকীদা গ্রহণ করেনি কিংবা এর সাথে কোন বাতিল আকীদার সংমিশ্রণও ঘটায়নি এবং নিজের কর্মজীবনে তাওহীদের আকীদার দাবীসমূহও পূরণ করেছে।

তাওহীদের ওপর দৃঢ় থাকার অর্থ কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বড় বড় সাহাবা তার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام

"বহু মানুষ আল্লাহকে তাদের রব বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আবার কাফের হয়ে গিয়েছে। দৃঢ় পদ সেই ব্যক্তি যে মৃত্যু পর্যন্ত এই আকীদা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।" (ইবনে জারির, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

لم يشركوا بالله شيئا لم يلتفتوا الى اله غيره

"এরপর আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেনি, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্যের প্রতি আকৃষ্টও হয়নি।" (ইবনে জারির)

একবার হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু মিম্বরে উঠে এ আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ "আল্লাহর শপথ, নিজ আকীদায় দৃঢ় ও স্থির তারাই যারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিয়ালের মত এদিক থেকে সেদিকে এবং সেদিক থেকে এদিকে ছুটে বেড়ায়নি।" (ইবনে জারির)।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ"নিজের আমলকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।" (কাশ্শাফ)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ "আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ করা ফরয সমূহ আনুগত্যের সাথে আদায় করেছে।" (কাশশাফ)

৩৪. উপলব্ধি করা যায় এমন অবস্থায় ফেরেশতারা নাযিল হবে এবং ঈমানদারগণ চর্মচোখে তাদের দেখবে কিংবা তাদের আওয়াজ কানে শুনতে পাবে এটা জরুরী নয়। যদিও মহান আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা ফেরেশতাকে প্রকাশ্যে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সাধারণত ঈমানদারদের কাছে বিশেষত যখন তারা ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের হাতে নাজেহাল হতে থাকে সেই সময় তাদের অবতরণ অমনুভূত পন্থায় হয় এবং তাদের কথা কানের পর্দায় প্রতিধ্বনিত হওয়ার পরিবর্তে হৃদয়ের গভীরে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি হয়ে প্রবেশ করে। কোন কোন তাফসীরকার ফেরেশতাদের এই আগমনকে মৃত্যুর সময় কিংবা কবরে অথবা হাশরের ময়দানের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করেছেন। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা যায় তাহলে এই পার্থিব জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সমুন্নত করার জন্য যারা জীবনপাত করছে তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতরণের কথা বর্ণনা করাই যে এখানে মূল উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। যাতে তারা প্রশান্তি লাভ করতে পারে, মনোবল ফিরে পায় এবং এই অনুভূতিতে তাদের হৃদয়-মন পরিতৃপ্ত হয় যে, তারা সহযোগী ও বন্ধুহীন নয়, বরং আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের সাথে আছে। যদিও মৃত্যুর সময়ও ফেরেশতারা ঈমানদারদের স্বাগত জানাতে আসে, কবরে (আলমে বরযখ)ও তারা তাদের স্বাগত জানায় এবং যেদিন কিয়ামত হবে সেদিনও হাশরের শুরু থেকে জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত সব সময় তারা তাদের সাথে থাকবে। তবে তাদের এই সাহচর্য সেই জগতের জন্য নির্দিষ্ট নয়, এ পৃথিবীতেও চলছে। কথার ধারাবাহিকতা বলছে হক ও বাতিলের সংঘাতে বাতিলের অনুসারীদের সাথে যেমন শয়তান ও অপরাধীরা থাকে তেমনি ঈমানদারদের সাথে ফেরেশতারাও

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৫ রুকূ'

সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান।[৩৬]

হে নবী, সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।[৩৭] *ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না।*[৩৮] *এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।*[৩৯] *যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্ররোচনা আঁচ করতে পার তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো*[৪০] *তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন।*[৪১]

থাকে। এক দিকে বাতিলপন্থীদের কৃতকর্মসমূহকে তাদের সংগী সাথীরা সুদৃশ্য করে দেখায় এবং তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয় যে, হককে হেয় করার জন্য তোমরা যে জুলুম–অত্যাচার ও বে–ঈমানী করছো সেটিই তোমাদের সফলতার উপায় এবং এভাবে পৃথিবীতে তোমাদের নেতৃত্ব নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে হকপন্থীদের কাছে আল্লাহর ফেরেশতারা এসে সেই সুখবরটি পেশ করে যা পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হচ্ছে।

৩৫. এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক কথা যা দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত ঈমানদারদের জন্য প্রশান্তির একটি নতুন বিষয় বহন করে। পৃথিবীতে ফেরেশতাদের এই উপদেশের অর্থ হচ্ছে, বাতিল শক্তি যতই পরাক্রমশালী ও স্বৈরাচারী হোক না কেন তাদের দেখে কখনো ভীত হয়ো না এবং হকের অনুসারী হওয়ার কারণে যত দুঃখ–কষ্ট ও বঞ্চনাই সইতে হোক সে জন্য দুঃখ করবে না। কেননা, ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য এমন কিছু আছে যার কাছে দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তুচ্ছ। মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা যখন এই কথাগুলো বলে তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, তুমি সামনে যে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর

হচ্ছো সেখানে তোমার জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই। কারণ, সেখানে জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষমান। আর দুনিয়াতে তুমি যা কিছু ছেড়ে যাচ্ছো সে জন্য তোমার দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা, এখানে আমি তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু। আলমে বরযখ ও হাশরের ময়দানে যখন ফেরেশতারা এ কথাগুলো বলবে তখন তার অর্থ হবে, এখানে তোমাদের জন্য কেবল শান্তি আর শান্তি। পার্থিব জীবনে তোমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছো। সে জন্য দুঃখ করো না এবং আখেরাতে যা কিছু সামনে আসবে সে জন্য ভয় করবে না। কারণ, আমরা তোমাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছি যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হচ্ছে।

৩৬. মু'মিনদের সান্ত্বনা দেয়া এবং মনোবল সৃষ্টির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগের আয়াতে তাদের বলা হয়েছিলো, আল্লাহর বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন একটা মৌলিক নেকী যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু এবং জান্নাতের উপযুক্ত বানায়। এখন তাদের বলা হচ্ছে, এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ–মুসিবতকে আহবান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করো। আমি মুসলমান। মানুষের জন্য এর চেয়ে উচ্চস্তর আর নেই। এ কথার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্য যে পরিস্থিতিতে তা বলা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সে সময় অবস্থা ছিল এই যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করতো সে হঠাৎ করেই অনুভব করতো যেন হিংস্র শ্বাপদ ভরা জংগলে পা দিয়েছে যেখানে সবাই তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য ছুটে আসছে। যে ব্যক্তি আরো একটু অগ্রসর হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য মুখ খুলেছে সে যেন তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য হিংস্র পশুকুলকে আহবান জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করে সোজা পথ গ্রহণ করা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া নিসন্দেহে বড় ও মৌলিক কাজ।

কিন্তু আমি মুসলমান বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা, পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার নেকী।

৩৭. এ কথার অর্থও পুরোপুরি বুঝার জন্য যে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা বিবেচনা থাকা দরকার। তখন অবস্থা ছিল এই যে, চরম হঠকারিতার এবং আক্রমণাত্মক বিরোধিতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলা করা হচ্ছিলো যেখানে নৈতিকতা, মানবতা এবং ভদ্রতার সমস্ত সীমা লংঘন করা হয়েছিলো। নবী (সা) ও তাঁর সংগী সাথীদের বিরুদ্ধে সব রকমের মিথ্যা আরোপ করা হচ্ছিলো। তাঁকে বদনাম করা এবং তাঁর সম্পর্কে লোকের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য সব রকমের দুষ্টবুদ্ধি ও কূটকৌশল কাজে লাগানো হচ্ছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিলো এবং শত্রুতামূলক প্রচারনার জন্য পুরো একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের মনে

সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো। তাঁকে তাঁর সংগীদেরকে সর্ব প্রকার কষ্ট দেয়া হচ্ছিলো। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর ইসলাম প্রচারের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক হৈ চৈ ও হট্টগোলকারী একদল লোককে সব সময় ওঁত পেতে থাকার জন্য তৈরী করা হয়েছিলো। যখনই তিনি ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্য কথা বলতে শুরু করবেন তখনই তারা শোরগোল করবে এবং কেউ তাঁর কথা শুনতে পাবে না। এটা এমনই একটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক পরিস্থিতি ছিল যে, বাহ্যিকভাবে আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ বলে মনে হচ্ছিলো। বিরোধিতা নস্যাত করার জন্য সেই সময় নবীকে (সা) এসব পন্থা বলে দেয়া হয়েছিল।

প্রথম কথা বলা হয়েছে, সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম সমান নয়। অর্থাৎ তোমাদের বিরোধীরা যত ভয়ানক তুফানই সৃষ্টি করুক না কেন এবং তার মোকাবিলায় নেকীকে যত অক্ষম ও অসহায়ই মনে হোক না কেন দুষ্কর্মের নিজের মধ্যেই এমন দুর্বলতা আছে যা শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থ করে দেয়। কারণ, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বভাব প্রকৃতি দুষ্কর্মকে ঘৃণা না করে পারে না। দুষ্কর্মের সহযোগীই শুধু নয় তার ধ্বজাধারী পর্যন্ত মনে মনে জানে যে, সে মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী এবং সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হঠকারিতা করছে। এ জিনিসটি অন্যদের মনে তার প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা নিজের কাছেই তাকে খাটো করে দেয়। এভাবে তার নিজের মনের মধ্যেই এক চোর জন্ম নেয়। শত্রুতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এই চোর ভেতর থেকেই তার সংকল্প ও মনোবলের ওপর সংগোপনে হানা দিতে থাকে। এই দুষ্কর্মের মোকাবিলায় যে সৎ কর্মকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় বলে মনে হয় তা যদি ক্রমাগত তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সে–ই বিজয়ী হয়। কারণ, প্রথমত সৎ কর্ম নিজেই একটি শক্তি যা হৃদয়–মনকে জয় করে এবং ব্যক্তি যতই শত্রুতাভাবাপন্ন হোক না কেন সে নিজের মনে তার জন্য সম্মানবোধ না করে পারে না। তাছাড়া নেকী ও দুষ্কর্ম যখন সামনা সামনি সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং উভয়ের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট পুরোপুরি উন্মোচিত হয় এমন পরিস্থিতিতে কিছুকাল সংঘাতে লিপ্ত থাকার পর এমন খুব কম লোকই থাকতে পারে যারা দুষ্কর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না এবং সৎ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, দুষ্কর্মের মোকাবিলা শুধুমাত্র সৎ কর্ম দিয়ে নয়, অনেক উচ্চমানের সৎকর্ম দিয়ে করো। অর্থাৎ কেউ যদি তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে আর তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে শুধু সৎকর্ম। উন্নত পর্যায়ের সৎকর্ম হচ্ছে, যে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করবে সুযোগ পেলে তুমি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করো।

এর সুফল বলা হয়েছে এই যে, জঘন্যতম শত্রুও এভাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। কারণ, এটিই মানুষের প্রকৃতি। আপনি যদি গালির জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন তাহলে নিসন্দেহে তা হবে একটি নেকী বা সৎকর্ম। অবশ্য তা গালিদাতার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু গালির জবাবে আপনি যদি তার কল্যাণ কামনা করেন তাহলে চরম নির্লজ্জ শত্রুও লজ্জিত হবে এবং আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলার জন্য মুখ খোলা তার জন্য কঠিন হবে। একজন লোক আপনার ক্ষতি করার কোন সুযোগই হাত ছাড়া হতে দেয় না। আপনি যদি তার অত্যাচার বরদাশত করে যেতে থাকেন তাহলে সে

হয়তো তার দুষ্কর্মের ব্যাপারে আরো সাহসী হয়ে উঠবে। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন যদি আপনি তাকে রক্ষা করেন তাহলে আপনার একান্ত অনুগত হয়ে যাবে। কারণ, ঐ সুকৃতির মোকাবিলায় কোন দুষ্কৃতিই টিকে থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও এই সাধারণ নিয়মকে এ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, উন্নত পর্যায়ের সৎকর্মের মাধ্যমে সব রকমের শত্রুর অনিবার্যরূপে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন জঘন্য মনের মানুষও আছে যে, তার অত্যাচার ক্ষমা করা ও দুষ্কৃতির জবাব অনুকম্পা ও সুকৃতির মাধ্যমে দেয়ার ব্যাপারে আপনি যতই তৎপর হোন না কেন তার বিচ্ছুর ন্যায় বিষাক্ত হুলের দংশনে কখনো ভাটা পড়বে না। তবে এ ধরনের মূর্তিমান খারাপ মানুষ প্রায় ততটাই বিরল যতটা বিরল মূর্তিমান ভাল মানুষ।

৩৮. অর্থাৎ এটা অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা হলেও তা কাজে লাগানো কোন ছেলেখেলা নয়। এ জন্য দরকার সাহসী লোকের। এ জন্য দরকার দৃঢ় সংকল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। সাময়িকভাবে কেউ কোন দুষ্কর্মের মোকাবিলায় সৎকর্ম করতে পারে। এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে এমন সব বাতিলপন্থী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করতে হয় যারা নৈতিকতার যে কোন সীমালংঘন করতে দ্বিধা করে না এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় চুর হয়ে আছে সেখানে দুষ্কর্মের মোকাবিলা সৎকর্ম দিয়ে করে যাওয়া তাও আবার উচ্চ মাত্রার সৎকর্ম দিয়ে এবং একবারও নিয়ন্ত্রণের বাগডোর হাত ছাড়া হতে না দেয়া কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কেবল সেই ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে যে বুঝে শুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে, যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকী ও সততা এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, বিরোধীদের কোন অপকর্ম ও নোংরামি তাকে তার উচ্চাসন থেকে নীচে নামিয়ে আনতে সফল হতে পারেনা।

৩৯. এটা প্রকৃতির বিধান। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার মানুষই কেবল এসব গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব গুণাবলীর অধিকারী হয় দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের মনযিলে মকসুদে পৌঁছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। নীচ প্রকৃতির মানুষ তাদের হীন চক্রান্ত, জঘন্য কৌশল এবং কুৎসিত আচরণ দ্বারা তাকে পরাস্ত করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

৪০. শয়তান যখন দেখে হক ও বাতিলের লড়াইয়ে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দ্বারা হীনতার এবং সুকৃতি দ্বারা দুষ্কৃতির মোকাবিলা করা হচ্ছে তখন সে চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়। সে চায় কোনভাবে একবারের জন্য হলেও হকের জন্য সংগ্রামকারী বিশেষ করে তাদের বিশিষ্ট লোকজন ও নেতৃবৃন্দের দ্বারা এমন কোন ত্রুটি সংঘটিত করিয়ে দেয়া যাতে সাধারণ মানুষকে বলা যায়, দেখুন খারাপ কাজ এক তরফা হচ্ছে না। এক পক্ষ থেকে নীচ ও জঘন্য কাজ করা হচ্ছে বটে, কিন্তু অপর পক্ষের লোকেরাও খুব একটা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ নয়, তারাও তো অমুক হীন আচরণ করেছে। এক পক্ষের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি এবং অপর পক্ষের জবাবী তৎপরতার মধ্যে ইনসাফের সাথে তুলনা মূলক বিচারের যোগ্যতা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না। যতক্ষণ তারা দেখে বিরোধীরা সব

রকমের জঘন্য আচরণ করছে কিন্তু এই লোকগুলো ভদ্রতা ও শিষ্টাচার এবং মর্যাদা নেকী ও সত্যবাদিতার পথ থেকে বিন্দুমাত্রও দূরে সরে যাচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়তে থাকে। কিন্তু যদি কোথাও তাদের পক্ষ থেকে কোন অযৌক্তিক বা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী আচরণ হয়ে যায়, তা কোন বড় জুলুমের প্রতিবাদে হলেও তাদের দৃষ্টিতে তারা উভয়েই সমান হয়ে যায় এবং বিরোধীরাও একটি শক্ত কথার জবাব হঠকারিতার সাহায্যে দেয়ার অজুহাত পেয়ে যায়। এ কারণে বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণার ব্যাপারে সাবধান থাকো। সে অত্যন্ত দরদী ও মঙ্গলকামী সেজে এই বলে তোমাদেরকে উত্তেজিত করবে যে, অমুক অত্যাচার কখনো বরদাশত করা উচিত নয়, অমুক কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া উচিত এবং এই আক্রমণের জবাবে লড়াই করা উচিত। তা না হলে তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করা হবে এবং তোমাদের আদৌ কোন প্রভাব থাকবে না। এ ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে কোন অযথা উত্তেজনা অনুভব করবে তখন সাবধান হয়ে যাও। কারণ, তা শয়তানের প্ররোচনা। সে তোমাদের উত্তেজিত করে কোন ভুল সংঘটিত করাতে চায়। সাবধান হয়ে যাওয়ার পর মনে করো না, আমি আমার মেজাজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখছি, শয়তান আমাকে দিয়ে কোন ত্রুটি করাতে পারবে না। নিজের এই ইচ্ছা শক্তির বিভ্রম হবে শয়তানের আরেকটি বেশী ভয়ংকর হাতিয়ার। এর চেয়ে বরং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ তিনি যদি তাওফীক দান করেন ও রক্ষা করেন তবেই মানুষ ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে যে ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন সেটি এ বিষয়ের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে একবার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকলো। হযরত আবু বকর চুপচাপ তার গালি শুনতে থাকলেন আর তাঁর দিকে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসতে থাকলেন। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন এবং জবাবে তিনিও তাকে একটি কঠোর কথা বলে ফেললেন। তার মুখ থেকে সে কথাটি বের হওয়া মাত্র নবীর (সা) ওপর চরম বিরক্তি ভাব ছেয়ে গেল এবং ক্রমে তা তাঁর পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠতে থাকলো। তিনি তখনই উঠে চলে গেলেন। হযরত আবু বকরও উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং পথিমধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে যখন আমাকে গালি দিচ্ছিলো তখন আপনি চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু যখনই আমি তাকে জবাব দিলাম তখনই আপনি অসন্তুষ্ট হলেন? নবী (সা) বললেন ঃ তুমি যতক্ষণ চুপচাপ ছিলে ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিল এবং তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু যখন তুমি নিজেই জবাব দিলে তখন ফেরেশতার স্থানটি শয়তান দখল করে নিল। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না।

৪১. বিরোধিতার তুফানের মুখে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর যে জিনিসটি মু'মিনের হৃদয়ে ধৈর্য, প্রশান্তি ও তৃপ্তির গভীর শীতলতা সৃষ্টি করে তা এই বিশ্বাস যে আল্লাহ বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত নন। আমরা যা করছি তাও তিনি জানেন এবং আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে তাও তিনি জানেন। আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের সব কথাই তিনি শুনছেন এবং উভয়ের কর্মনীতি যা কিছুই হোক না কেন তা তিনি দেখছেন। এই

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۭ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝۳۷ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ۝۳۸ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۗءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۭ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ اِنَّهٗ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۳۹

এই[৪২] রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।[৪৩] সূর্য ও চাঁদকে সিজদা করো না, সেই আল্লাহকে সিজদা করো যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি সত্যিই তোমরা তাঁর ইবাদতকারী হও।[৪৪] কিন্তু যদি অহংকার করে এসব লোকেরা নিজেদের কথায় গোঁ ধরে থাকে।[৪৫] তবে পরোয়া নেই। যেসব ফেরেশতা তোমার রবের সান্নিধ্য লাভ করেছে তারা রাত দিন তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করছে এবং কখনো ক্লান্ত হয় না।[৪৬]

আর এটিও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি যে তোমরা দেখতে পাও ভূমি শুষ্ক শস্যহীন পড়ে আছে। অতপর আমি যেই মাত্র সেখানে পানি বর্ষণ করি অকস্মাত তা অঙ্কুরোদগমে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। যে আল্লাহ এই মৃত ভূমিকে জীবন্ত করে তোলেন, নিশ্চিতভাবেই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করবেন।[৪৭] নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।

আস্থার কারণেই মু'মিন বান্দা নিজের এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

কুরআন মজীদের এই পঞ্চম বার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে দীনে ইসলামের দাওয়াত এবং সমাজ সংস্কারের এ কৌশল শেখানো হয়েছে। এর পূর্বে আরো চারবার চারটি স্থানে এ কৌশল শেখানো হয়েছে। সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ১১০ থেকে ১১৪ আয়াত, টীকাসহ; সূরা আন নাহল, আয়াত ১২৫ থেকে ১২৭ টীকাসহ; সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত ৯৬ টীকাসহ; সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৬ টীকাসহ।

৪২. এখানে জনসাধারণকে উদ্দেশ করে বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করানোর জন্য কয়েকটি কথা বলা হচ্ছে।

৪৩. অর্থাৎ এসব আল্লাহর প্রতিভূ নয় যে, এগুলোর আকৃতিতে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করছেন বলে মনে করে তাদের ইবাদত করতে শুরু করবে। বরং এগুলো আল্লাহর নিদর্শন এসব নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তোমরা বিশ্ব জাহান ও তার ব্যবস্থাপনার সত্যতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবে এবং এ কথাও জানতে পারবে যে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ সম্পর্কে যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাই প্রকৃত সত্য। সূর্য ও চাঁদের উল্লেখের পূর্বে দিন ও রাতের উল্লেখ করা হয়েছে এ বিষয়ে সাবধান করে দেয়ার জন্য যে রাতের বেলা সূর্যের অদৃশ্য হওয়া ও চাঁদের আবির্ভূত হওয়া এবং দিনের বেলা চাঁদের অদৃশ্য হওয়া ও সূর্যের আবির্ভূত হওয়া সুস্পষ্ট ভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, এ দু'টির কোনটিই আল্লাহ বা আল্লাহ প্রতিভূ নয়। উভয়েই তাঁর একান্ত দাস। তারা আল্লাহর আইনের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আবর্তন করছে।

৪৪. শিরককে যুক্তিসংগত প্রমাণ করার জন্য কিছুটা অধিক মেধাবী শ্রেণীর মুশরিকরা সাধারণত যে দর্শনের বুলি কপচিয়ে থাকে এটা তারই জবাব। তারা বলে, আমরা এসব জিনিসকে সিজদা করি না। বরং এদের মাধ্যমে আল্লাহকেই সিজদা করি। এর জবাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর ইবাদতকারী হয়ে থাকো তাহলে এসব মাধ্যমের প্রয়োজন কি? সরাসরি তাঁকেই সিজদা করো না কেন?

৪৫. "অহংকার করে" অর্থ যে অজ্ঞতার মধ্যে এরা ডুবে আছে যদি তোমাদের কথা মেনে নেয়াকে নিজেদের অপমান মনে করে সেই অজ্ঞতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।

৪৬. অর্থাৎ এসব ফেরেশতার মাধ্যমে গোটা বিশ্ব জাহানের যে ব্যবস্থাপনা চলছে তা আল্লাহর একত্ব ও দাসত্বের অধীনেই চলছে এবং এই ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক ফেরেশতারা প্রতি মুহূর্তে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের রবের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও দাসত্বে অন্য কারো শরীক হওয়া থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। তবে বুঝানো সত্ত্বেও যদি কতিপয় আহাম্মক না মানে এবং গোটা বিশ্ব জাহান যে পথে চলছে সে পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শিরকের পথে চলতেই গোঁ ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতার পথেই হাবুডুবু খেতে দাও।

এ স্থানটিতে সিজদা করতে হবে এ বিষয়ে সবাই একমত। তবে উপরোক্ত দু'টি আয়াতের কোনটিতে সিজদা করতে হবে সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ বিনে মাসউদ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করে সিজদা করতেন। ইমাম মালেক এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। এর সমর্থনে ইমাম শাফেয়ীর একটি মতও উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, মাসরূক, কাতাদা, হাসান বাসারী, আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী, ইবনে সিরীন, ইবরাহীম নাখায়ী এবং আরো কতিপয় শিক্ষক وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ এর কাছে সিজদা করার পক্ষপাতী। এটি ইমাম আবু হানিফারও মত। তাছাড়া শাফেয়ীদের দৃষ্টিতেও এটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত।

৪৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহল, আয়াত ৬৫ টীকাসহ; সূরা হজ্জ, আয়াত ৫ ও ৭ টীকাসহ; সূরা আর রূম, আয়াত ১৯ ও ২০ টীকাসহ; সূরা ফাতের, টীকা ১৯।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

যারা[৪৮] আমার আয়াতসমূহের উল্টা অর্থ করে[৪৯] তারা আমার অগোচরে নয়।[৫০] নিজেই চিন্তা করে দেখো যে ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সেই ব্যক্তিই ভাল না যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিরাপদ অবস্থায় হাজির হবে সেই ভালো? তোমরা যা চাও করতে থাকো, আল্লাহ তোমাদের সব কাজ দেখছেন। এরা সেই সব লোক যাদের কাছে উপদেশ বাণী আসলে মানতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু বাস্তব এই যে, এটি একটি মহা শক্তিশালী গ্রন্থ।[৫১] বাতিল না পারে সামনে থেকে এর ওপর চড়াও হতে না পারে পেছন থেকে।[৫২] এটা মহাজ্ঞানী ও পরম প্রশংসিত সত্তার নাযিলকৃত জিনিস।

হে নবী, তোমাকে যা বলা হচ্ছে তার মধ্যে কোন জিনিসই এমন নেই যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলদের বলা হয়নি। নিসন্দেহে তোমার রব বড় ক্ষমাশীল[৫৩] এবং অতীব কষ্টদায়ক শাস্তিদাতাও বটে।

৪৮. যে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম আহবান জানাচ্ছেন সেটি যুক্তিসংগত এবং বিশ্ব জাহানের নিদর্শনাবলী তারই সত্যতা প্রতিপাদন করছে, কয়েকটি বাক্যে জনসাধারণকে একথা বুঝানোর পর পুনরায় বক্তব্যের মোড় সেই সব বিরোধীদের দিকে ফিরছে যারা হঠকারিতার মাধ্যমে বিরোধিতা করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়েছিলো।

৪৯. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا (আমার আয়াতসমূহে ইলহাদ করে) 'ইলহাদ' অর্থ ফিরে যাওয়া, সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথের দিকে যাওয়া, বক্রতা অবলম্বন করা। আল্লাহর আয়াত সমূহে ইলহাদের অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সোজা কথার বাঁকা অর্থ করার চেষ্টা করা। আল্লাহর আয়াতসমূহের শুদ্ধ ও সঠিক অর্থ গ্রহণ না করে সব রকম মিথ্যা ও ভুল অর্থ করে নিজেও পথভ্রষ্ট হওয়া এবং অন্যদেরকেও

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

আমি যদি একে আজমী কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম তাহলে এসব লোক বলতো, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য কথা, আজমী বাণীর শ্রোতা আরবী ভাষাভাষী[৫৪] এদের বলো, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রোগমুক্তি বটে। কিন্তু যারা ঈমান আনে না এটা তাদের জন্য পর্দা ও চোখের আবরণ। তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন যেন দূর থেকে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।[৫৫]

পথভ্রষ্ট করতে থাকা। মক্কার কাফেররা কুরআন মজীদের দাওয়াত ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে চক্রান্ত করছিলো তার মধ্যে ছিল, তারা কুরআনের আয়াত শুনে তারপর কোন আয়াতকে পূর্বাপর প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কোন আয়াতের শাব্দিক বিকৃতি ঘটিয়ে কোন বাক্যাংশ বা শব্দের ভুল বা মিথ্যা অর্থ করে নানা রকমের প্রশ্ন উত্থাপন করতো এবং এই বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতো যে, আজ নবী সাহেব কি বলেছেন তা শোন।

৫০. এ কথাটির মধ্যে একটি হুমকি প্রচ্ছন্ন আছে। ক্ষমতাবান শাসক যদি বলেন, "অমুক ব্যক্তি যে আচরণ করছে তা আমার কাছে গোপন নয়" তাহলে আপনা থেকেই সে কথার অর্থ দাঁড়ায়, তার বাঁচার কোন উপায় নেই।

৫১. অর্থাৎ অনড় ও অবিচল। বাতিলের পূজারীরা এর বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত করছে তার দ্বারা একে পরাভূত করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে আছে সততার শক্তি, সত্য জ্ঞানের শক্তি, যুক্তি-প্রমাণের শক্তি, প্রেরণকারী আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের শক্তি এবং উপস্থাপনকারী রসূলের ব্যক্তিত্বের শক্তি। কেউ যদি মিথ্যা ও অন্তসারশূন্য প্রচারের হাতিয়ার দিয়ে একে ব্যর্থ করে দিতে চায় তাহলে কি তা সম্ভব?

৫২. সামনের দিক থেকে না আসতে পারার অর্থ হচ্ছে কেউ যদি কুরআনের ওপর সরাসরি আক্রমণ করে তার কোন কথা ভুল এবং কোন শিক্ষা বাতিল ও বিকৃত প্রমাণ করতে চায় তাহলে এ ক্ষেত্রে সে সফলকাম হতে পারে না। পেছন দিক থেকে না আসতে পারার অর্থ হচ্ছে কখনো এমন কোন বাস্তব ও সত্য দেখা দিতে পারে না যা কুরআনের পেশকৃত সত্যতা ও বাস্তবতার পরিপন্থী, এমন কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্ভাবিত হতে পারে না যা প্রকৃতই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কুরআনের বর্ণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে।

এমন কোন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে না যা আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন–কানুন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জীবন প্রণালী ও সামাজিকতা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে কুরআন মানুষকে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা ভ্রান্ত প্রমাণ করবে। যে জিনিসকে এ গ্রন্থ ন্যায় ও সত্য বলে ঘোষণা করেছে তা কখনো বাতিল প্রামাণিত হতে পারে না। এর এ অর্থও হতে পারে যে বাতিল সম্মুখ দিক থেকে এসে হামলা করুক বা প্রতারণামূলক পথে এসে অকস্মাত হামলা করুক কুরআন যে দাওয়াত পেশ করছে তাকে সে কোন ভাবেই পরাজিত করতে পারবে না। সমস্ত বিরোধিতা এবং বিরোধীদের সব রকম গোপন ও প্রকাশ্য চক্রান্ত সত্ত্বেও এ আন্দোলন প্রসার লাভ করবে এবং কেউ একে ব্যর্থ করতে পারবে না।

৫৩. অর্থাৎ তাঁর রসূলদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, গালি দেয়া হয়েছে, কষ্ট দেয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি বছরের পর বছর তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। এটা তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫৪. যেসব হঠকারিতার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলা করা হচ্ছিলো এটা তার আরেকটি নমুনা। কাফেররা বলতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব। আরবী তাঁর মাতৃভাষা। তিনি যখন আরবীতে কুরআন পেশ করছেন তখন কি করে বিশ্বাস করা যায়, একথা তিনি নিজে রচনা করেননি, বরং আল্লাহ তাঁর ওপর নাযিল করেছেন। তাঁর একথাকে আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী হিসেবে কেবল তখনই মেনে নেয়া যেতো যদি তিনি এমন কোন ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে শুরু করতেন যা জানেন না। যেমন ফারসী, রোমান বা গ্রীক ভাষা। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ এদের নিজের ভাষায় কুরআন পাঠানো হয়েছে যা এরা বুঝতে সক্ষম। কিন্তু এদের আপত্তি হচ্ছে, একজন আরবের মাধ্যমে আরবদের জন্য আরবী ভাষায় এ বাণী নাযিল করা হলো কেন? কিন্তু অন্য কোন ভাষায় যদি নাযিল করা হতো তাহলে তখনও এই সব লোকই আপত্তি তুলে বলতো— আজব ব্যাপার তো! আরব জাতির কাছে একজন আরবকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে এমন এক ভাষায় বাণী নাযিল করা হয়েছে যা রসূল বা গোটা জাতি কেউই বুঝে না।

৫৫. দূর থেকে যখন কাউকে ডাকা হয় তখন তার কানে একটা আওয়াজ প্রবেশ করে ঠিকই তবে আওয়াজ দাতা কি বলছে তা সে বুঝতে পারে না। এটা এমন একটা নজির বিহীন উপমা যার মাধ্যমে হঠকারী বিরোধীদের পুরো মনস্তাত্বিক চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বিদ্বেষ বা পক্ষপাত দোষ মুক্ত লোকের সামনে যদি আপনি কথা বলেন, তাহলে সে তা শোনে, বুঝার চেষ্টা করে এবং যুক্তিসংগত কথা হলে খোলা মনে তা গ্রহণ করে। এটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে শুধু বিদ্বেষই পোষণ করে না, বরং শত্রুতাও পোষণ করে তাকে আপনি আপনার কথা যতই বুঝাতে চেষ্টা করবেন সে আদৌ সে কথার প্রতি মনোযোগী হবে না। আপনার সব কথা শোনার পরও এত সময় ধরে আপনি তাকে কি বললেন তা সে বুঝবে না। আপনিও মনে করবেন যেন আপনার কথা তার কানের পর্দায় ধাক্কা খেয়ে বাইরে দিয়েই চলে গেছে, মন ও মগজে প্রবেশ করার মত কোন রাস্তাই খুঁজে পায়নি।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

৬ রুকূ'

এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। সে কিতাব নিয়েও এই মতানৈক্য হয়েছিলো[৫৬] তোমার রব যদি পূর্বেই একটি বিষয় ফায়সালা না করে থাকতেন তাহলে এই মতানৈক্যকারীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হতো।[৫৭] প্রকৃত ব্যাপার হলো, এসব লোক সে ব্যাপারে চরম অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত।[৫৮]

যে নেক কাজ করবে সে নিজের জন্যই কল্যাণ করবে। আর যে দুষ্কর্ম করবে তার মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার রব বান্দাদের জন্য জালেম নন।[৫৯]

৫৬. অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক তা মেনেছিলো আর কিছু সংখ্যক লোক তার বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো।

৫৭. একথার দুটি অর্থ একটি অর্থ হচ্ছে, চিন্তা–ভাবনা করা ও বুঝার জন্য মানুষকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হবে আল্লাহ যদি পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকতেন তাহলে এ ধরনের বিরোধিতাকারীদের ধ্বংস করে দেয়া হতো। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, সব রকম মতানৈক্যের চূড়ান্ত ফায়সালা আখেরাতে করা হবে আল্লাহ যদি পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন তাহলে প্রকৃত সত্যকে এই পৃথিবীতেই উন্মুক্ত করে দেয়া হতো এবং কে ন্যায় ও সত্যের অনুসারী আর কে বাতিলের অনুসারী তাও পরিষ্কার করে দেয়া হতো।

৫৮. এই সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে মক্কার কাফেরদের রোগ পুরাপুরি চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তারা কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত আছে। এই সন্দেহ তাদেরকে চরম অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ বাহ্যত তারা অত্যন্ত তোড়জোড়ের সাথেই কুরআনের আল্লাহর বাণী হওয়া এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রসূল হওয়া অস্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এই অস্বীকৃতি কোন নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, বরং এ ব্যাপারে তাদের মনে রয়েছে চরম দোদুল্যমানতা। এক দিকে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ, প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা এবং অজ্ঞতামূলক বিদ্বেষ কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার এবং পূর্ণ শক্তিতে বিরোধিতা করার দাবী করে। অপরদিকে ভেতর থেকে তাদের মন বলে, এ কুরআন সত্যি সত্যিই এক নজিরবিহীন বাণী। কোন সাহিত্যিক

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي

সেই সময়ের[৬০] জ্ঞান আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়[৬১] এবং সেসব ফল সম্পর্কেও তিনিই অবহিত যা সবে মাত্র তার কুঁড়ি থেকে বের হয়। তিনিই জানেন কোন্ মাদি গর্ভধারণ করেছে এবং কে বাচ্চা প্রসব করেছে।[৬২] যে দিন তিনি এসব লোকদের ডেকে বলবেন, "আমার সেই সব শরীকরা কোথায়?" তারা বলবে ঃ আমরা তো বলেছি, আজ আমাদের কেউ–ই এ সাক্ষ্য দিবে না।[৬৩] তখন সেই সব উপাস্যের সবাই এদের সামনে থেকে উধাও হয়ে যাবে যাদের এরা ইতিপূর্বে ডাকতো।[৬৪] এসব লোক বুঝতে পারবে এখন তাদের জন্য কোন আশ্রয় স্থল নেই।

কল্যাণ চেয়ে দোয়া করতে মানুষ কখনো ক্লান্ত হয় না।[৬৫] আর যখন কোন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ ও মনভাঙা হয়ে যায়। কিন্তু কঠিন সময় কেটে যাওয়ার পর যেই মাত্র আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ চাখাই সে বলতে থাকে, আমি তো এরই উপযুক্ত।[৬৬]

বা কবির নিকট থেকে এ ধরনের বাণী কখনো শোনা যায়নি। না কোন পাগল উম্মাদনার সময় এ ধরনের কথা বলতে পারে। না মানুষকে আল্লাহভীরুতা সৎ কর্ম ও পবিত্রতার শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কখনো শয়তানদের আগমন ঘটতে পারে। একই ভাবে যখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলে তখন ভেতর থেকে তাদের মন বলে, আল্লাহর বান্দারা, কিছু লজ্জাও তো তোমাদের থাকা উচিত এ ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? যখন তারা তাঁকে পাগল বলে তখন তাদের বিবেক তাদেরকে ডেকে বলে ওঠে, 'জালেমের দল, তোমরা কি সত্যিই এ ব্যক্তিকে পাগল বলে মনে করো?' যখন তারা তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত সব কিছু ন্যায় ও সত্যের জন্য করছেন না বরং নিজের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

প্রকাশ করার জন্য করছেন তখন তাদের বিবেক ভেতর থেকে তিরস্কার করে বলে, তোমাদের প্রতি লা'নত, যাঁকে তোমরা কখনো ধন–সম্পদ, ক্ষমতা ও খ্যাতির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে দেখনি, যাঁর গোটা জীবন স্বার্থপরতার ক্ষুদ্রতম কালিমা থেকেও মুক্ত, যিনি সর্বদা নেকী ও কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন, কিন্তু কখনো নিজের প্রবৃত্তি ও ব্যক্তি স্বার্থের জন্য কোন অন্যায় কাজ করেননি এমন সৎ ও পবিত্র মানুষকে তোমরা স্বার্থপর বলছো?

৫৯. অর্থাৎ সৎ মানুষের সৎ কর্মকে ধ্বংস করে দিবেন এবং দুষ্কর্মকারীকে তার দুষ্কর্মের শাস্তি দিবেন না, তোমার রব এ ধরনের জুলুম কখনো করতে পারেন না।

৬০. সেই সময় অর্থ কিয়ামত। অর্থাৎ সেই বিশেষ সময় যখন দুষ্কর্মকারীদেরকে তাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে এবং সৎ কর্মশীল সেই সব মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে, যাদের বিরুদ্ধে দুষ্কর্ম করা হয়েছিলো।

৬১. অর্থাৎ সে সময়টি কখন আসবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কাফেররা বলতো, আমাদের ওপর দুষ্কর্মের যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে তা কখন পূরণ হবে? এখানে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রশ্নের উল্লেখ না করেই তার জবাব দিয়েছেন।

৬২. একথা বলে শ্রোতাদেরকে দুটি বিষয় বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে, শুধু কিয়ামত নয়, বরং সমস্ত গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেই অপরটি হচ্ছে, যে আল্লাহ খুঁটিনাটি বিষয় সমূহের এত বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন, কোন ব্যক্তির কাজ কর্ম তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার আওতায় নির্ভয়ে যা ইচ্ছা তাই করা ঠিক নয়। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এই বাক্যাংশের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যাংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একথাটির পরেই যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে বক্তব্যের ধারাক্রম থেকে আপনা আপনি একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের তারিখ জানার ধান্ধায় কোথায় পড়ে আছ? বরং চিন্তা করো কিয়ামত যখন আসবে তখন নিজের এসব গোমরাহীর জন্য কি দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিয়ামতের তারিখ সম্পর্কে প্রশ্নকারী এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার মাধ্যমেই জবাব দিয়েছিলেন। সহীহ, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি দূর থেকে ডাকলো, হে মুহাম্মাদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, কি বলতে চাও, বলো। সে বললো : কিয়ামত কবে হবে? তিনি জবাবে বললেন : ويحك انها كائنة لا محالة فما اعددت لها "হে আল্লাহর বান্দা, কিয়ামত তো আসবেই। তুমি সে জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো?"

৬৩. অর্থাৎ এখন আমাদের কাছে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়েছে। আমরা যা বুঝেছিলাম তা যে একেবারেই ভ্রান্ত ছিল তা আমরা জানতে পেরেছি। এখন আমাদের মধ্যকার এক জনও একথা বিশ্বাস করে না যে, আপনার খোদায়ীতে আদৌ অন্য কোন অংশীদার আছে। "আমরা আগেই বলেছি" কথা থেকে বুঝা যায়, কিয়ামতের দিন প্রতিটি পর্যায়ে

وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ
فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَآ
أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ
عَرِيضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيٓ أَنْفُسِهِمْ
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

আমি মনে করি না কিয়ামত কখনো আসবে। তবে সত্যিই যদি আমাকে আমার রবের কাছে নিয়ে হাজির করা হয় তাহলে সেখানেও আমার জন্য থাকবে মজা করার উপকরণসমূহ। অথচ আমি নিশ্চিতরূপেই কাফেরদের জানিয়ে দেব তারা কি কাজ করে এসেছে। আর তাদেরকে আমি অত্যন্ত জঘন্য শাস্তির মজা চাখাবো।

আমি যখন মানুষকে নিয়ামত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্বিত হয়ে ওঠে।[৬৭] কিন্তু যখনই কোন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে।[৬৮]

হে নবী, এদের বলে দাও, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো যে, সত্যিই এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে আর তোমরা তা অস্বীকার করতে থাকো তাহলে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে যে এর বিরোধিতায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।[৬৯]

অচিরেই আমি এদেরকে সর্বত্র আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও। যাতে এদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ কুরআন যথার্থ সত্য[৭০] এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব প্রতিটি জিনিস দেখছেন?[৭১] জেনে রাখো, এসব লোক তাদের রবের সাথে সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।[৭২] শুনে রাখো, তিনি সব জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছেন।[৭৩]

কাফেরদের বার বার জিজ্ঞেস করা হবে, পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর রসূলদের কথা মানতে অস্বীকার করেছিলে। এখন বলো দেখি, তারাই সত্যের অনুসারী ছিলেন না তোমরা? প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাফেররা স্বীকার করতে থাকবে যে রসূলগণ যা বলেছিলেন তাই ছিল সত্য। আর সেই জ্ঞানের বিষয় পরিত্যাগ করে অজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরে থেকে আমরা ভুল করেছিলাম।

৬৪. অর্থাৎ তারা নিরাশ হয়ে এই আশায় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকবে যে, সারা জীবন তারা যাদের সেবা করলো হয়তো তাদের মধ্য থেকে কেউ আসবে এবং আল্লাহর আযাব থেকে তাদের উদ্ধার করবে কিংবা অনন্ত শাস্তির মাত্রা কমিয়ে দেবে। কিন্তু কোথাও তারা কোন সাহায্যকারীকে দেখতে পাবে না।

৬৫. কল্যাণ অর্থ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অঢেল রিযিক, সুস্থতা, সন্তান–সন্ততির কল্যাণ ইত্যাদি। এখানে মানুষ অর্থ প্রতটি মানুষ নয়। কেননা নবী–রসূল ও নেককার মানুষেরাও মানুষের মধ্যে শামিল, কিন্তু তাঁরা এমনটা নন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এখানে মানুষ বলতে নীচমনা ও অদূরদর্শী মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা কঠিন সময়ে কাকুতি–মিনতি করতে থাকে কিন্তু পার্থিব আরাম আয়েশ ও ভোগের উপকরণ লাভ করা মাত্র আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই যেহেতু এ দুর্বলতা আছে তাই একে মানব জাতির দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৬৬. অর্থাৎ এসব কিছুই আমি আমার যোগ্যতা বলে লাভ করেছি এবং এসব পাওয়া আমার অধিকার।

৬৭. অর্থাৎ আমার আনুগত্য ও দাসত্ব পরিত্যাগ করে এবং আমার সামনে মাথা নত করাকে নিজের অপমান মনে করতে থাকে।

৬৮. কুরআন মজীদে এ বিষয় সম্পর্কিত আরো কতিপয় আয়াত আমরা পেয়েছি। বিষয়টি পুরোপুরি বুঝার জন্য নিচে বর্ণিত স্থানসমূহ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ১২; সূরা হুদ, আয়াত ৯ ও ১০ টীকাসহ; বানী ইসরাঈল, আয়াত ৮৩; সূরা–রূম, আয়াত ৩৩ থেকে ৩৬ টীকাসহ; আয যুমার, আয়াত ৮, ৯ ও ৪৯।

৬৯. এর অর্থ এ নয় যে, কুরআন সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়ে থাকলে এর বিরোধিতার ফলে আমাদের ওপর দুর্ভাগ্য নেমে আসতে পারে শুধু এই ভয়ে এর ওপর ঈমান আনো। বরং এর অর্থ হলো, যেভাবে তোমরা না বুঝে শুনে কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা না করে কুরআনকে অস্বীকার করছো, বুঝার চেষ্টা করার পরিবর্তে কানে আঙুল দিচ্ছো এবং অযথা জিদ করে বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়েছো তা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি এবং আল্লাহ তা পাঠাননি বলে জানতে পেরেছো এ দাবীও তোমরা করতে পারো না। একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিতে তোমাদের অস্বীকৃতি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়, ধারণার ভিত্তিতে। বাহ্যত এ ধারণা যেমন অভ্রান্ত হওয়া সম্ভব তেমনি ভ্রান্ত হওয়াও সম্ভব। এই উভয় সম্ভাবনাকে একটু পর্যালোচনা করে দেখো। মনে করো তোমাদের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হলো। এ ক্ষেত্রে তোমাদের ধারণা অনুসারে বড় জোর এতটুকু হবে যে, মান্যকারী ও অমান্যকারী উভয়ের পরিণাম একই হবে। কারণ, মৃত্যুর পর উভয়েই

মাটিতে মিশে যাবে। এর পরে আর কোন জীবন থাকবে না। যেখানে কুফর ও ঈমানের কোন ভাল মন্দ ফলাফল দেখা দিতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং কুরআন যা বলছে তা যদি বাস্তব রূপ নিয়ে সামনে আসে তাহলে বলো তা অস্বীকার করে ও বিরোধিতার ক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হয়ে তোমরা কোন্ পরিণামের মুখোমুখি হবে? কাজেই তোমাদের আপন স্বার্থই দাবী করে, জিদ ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন সম্পর্কে ভেবে দেখো। চিন্তা ভাবনার পরও যদি তোমরা ঈমান না আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাও তবে তাই করো। কিন্তু বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে এ আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করার জন্য এতটা অগ্রসর হয়ো না যে মিথ্যা, চক্রান্ত, প্রতারণা এবং জুলুম-নির্যাতনের অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দেবে এবং শুধু নিজেদের ঈমান আনা থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট মনে না করে অন্যদেরকেও ঈমান আনা থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে।

৭০. এ আয়াতের দু'টি অর্থ। আর দু'টি অর্থই বর্ণনা করেছেন বড় বড় মুফাস্‌সিরগণ। একটি অর্থ হচ্ছে, অচিরেই এরা নিজ চোখে দেখতে পাবে এ কুরআনের আন্দোলন আশেপাশের সব দেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং এরা নিজেরা তার সামনে নতশির। সে সময় তারা জানতে পারবে আজ তাদের যা বলা হচ্ছে তাই ছিল পুরোপুরি ন্যায় ও সত্য। অথচ এখন তারা তা মেনে নিচ্ছে না। কেউ কেউ এ অর্থ সম্পর্কে এই বলে আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, কোন আন্দোলনের শুধু বিজয়ী হওয়া এবং বিরাট বিরাট এলাকা জয় করা তার ন্যায় ও সত্য হওয়ার প্রমাণ নয়। বাতিল আন্দোলনসমূহও বিস্তার লাভ করে এবং তার অনুসারীরাও দেশের পর দেশ জয় করে থাকে। কিন্তু এটা একটা হাল্কা ও গুরুত্বহীন আপত্তি। গোটা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করেই এ আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলাম যেসব বিস্ময়কর বিজয় লাভ করেছে তা কেবল এ অর্থে আল্লাহর নিদর্শন ছিল না যে, একদল ঈমানদার লোক দেশের পর দেশ জয় করেছে। বরং তা এ অর্থে আল্লাহর নিদর্শন যে তা পৃথিবীর আর দু'দশটি বিজয়ের মত ছিল না। কারণ, ঐ সব পার্থিব বিজয়ে এক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিকে অন্যদের প্রাণ ও সম্পদের মালিক মোখতার বানিয়ে দেয় এবং আল্লাহর পৃথিবী জুলুম নির্যাতনে ভরে ওঠে। অপরদিকে এই বিজয় তার সাথে এক বিরাট ধর্মীয়, নৈতিক, চিন্তাগত ও মানসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব নিয়ে এসেছিলো। যেখানেই এর প্রভাব পড়েছে সেখানেই মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম যোগ্যতা ও গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে এবং কুপ্রবৃত্তি ও অসৎ স্বভাবসমূহ অবদমিত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ কেবল মাত্র দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ এবং নিভৃত বসে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' জপকারীদের মধ্যে যেসব গুণাবলী দেখার আশা করতো এবং দুনিয়ার কায়কারবার পরিচালনাকারীদের মধ্যে যা পাওয়ার চিন্তাও কখনো করতে পারতো না এই বিপ্লব সেই সব গুণাবলী ও নৈতিকতা শাসকদের রাজনীতিতে, ন্যায় বিচারের আসনে সমাসীন বিচারকদের আদালতে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী সেনাধ্যক্ষদের পরিচালিত যুদ্ধে বিজয় অভিযানসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে, রাজস্ব আদায়কারীদের আচরণে এবং বড় বড় কারবার পরিচালনাকারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখিয়েছে। এই বিপ্লব তার সৃষ্ট সমাজে সাধারণ মানুষকে নৈতিক চরিত্র ও আচরণ এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এত উর্ধে তুলে ধরেছে যে, অপরাপর সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তার চেয়ে

অনেক নীচু পর্যায়ের বলে প্রতিভাত হয়েছে। এ বিপ্লব মানুষকে কুসংস্কার ও অমূলক ধ্যান-ধারণার আবর্ত থেকে বের করে জ্ঞান-গবেষণা এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও কর্মনীতির সুস্পষ্ট রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছে। এ বিপ্লব সামাজিক জীবনের সেই সব রোগ ব্যাধির চিকিৎসা করেছে অপরাপর ব্যবস্থায় যার চিকিৎসার ধারণা পর্যন্ত ছিল না। কিংবা থাকলেও সেসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সফলকাম হয়নি। যেমন ঃ বর্ণ, গোত্র এবং দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য, একই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ এবং তাদের মধ্যে উচ্চ নীচের বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, আইনগত অধিকার ও বাস্তব আচরণে সাম্যের অভাব, নারীদের পশ্চাদপদতা ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চনা, অপরাধের আধিক্য, মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন, জবাবদিহি ও সমালোচনার উর্ধে সরকারের অবস্থান, মৌলিক অধিকার থেকেও জনগণের বঞ্চনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চুক্তিসমূহের অমর্যাদা, যুদ্ধের সময় বর্বর ও পশুসুলভ আচরণ এবং এরূপ আরো অনেক ব্যাধি। সবচেয়ে বড় কথা, এ বিপ্লব দেখতে দেখতে আরব ভূমিতে রাজনৈতিক অরাজকতার জায়গায় শৃংখলা, খুন-খারাবি ও নিরাপত্তাহীনতার জায়গায় নিরাপত্তা, পাপাচারের জায়গায় তাকওয়া ও পবিত্রতা, জুলুম ও বে-ইনসাফির জায়গায় ন্যায় বিচার, নোংরামি ও অশিষ্টতার জায়গায় পবিত্রতা ও রুচিশীলতা, অজ্ঞতার জায়গায় জ্ঞান এবং পুরুষাণুক্রমিক শত্রুতার জায়গায় ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে এবং যে জাতির লোকেরা নিজ গোত্রের সরদারী ছাড়া বড় আর কোন স্বপ্নও দেখতে পারতো না তাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর নেতা বানিয়ে দিল। এগুলোই ছিল সেই নিদর্শনাবলী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াত শুনিয়েছিলেন সেই প্রজন্মের লোকেরাই নিজেদের চোখে এসব নিদর্শন দেখেছিলো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে এসব নিদর্শন দেখিয়ে যাচ্ছেন। মুসলমানরা নিজেদের পতন যুগেও নৈতিক চরিত্রের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে যারা সভ্যতা ও শিষ্টাচারের ঝাণ্ডাবাহী সেজে আছে তারা কখনো তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া এবং এমনকি ইউরোপেরও পরাজিত জাতিসমূহের সাথে যে নির্যাতন মূলক আচরণ করেছে মুসলমানদের ইতিহাসের কোন যুগেই তার কোন নজির পেশ করা সম্ভব নয়। কুরআনের কল্যাণকারিতাই মুসলমানদের মধ্যে এতটা মানবিক গুণাবলী সৃষ্টি করেছে যে, বিজয় লাভ করেও তারা কখনো ততটা অত্যাচারী হতে পারেনি ইতিহাসের প্রতিটি যুগে অমুসলিমরা যতটা অত্যাচারী হতে পেরেছে এবং আজও পারছে। চোখ থাকলে যে কেউ নিজেই দেখে নিতে পারে, মুসলমানরা যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্পেনের শাসক ছিল তখন তারা খৃষ্টানদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলো। কিন্তু খৃষ্টানরা সেখানে বিজয়ী হয়ে তাদের সাথে কি আচরণ করেছিলো? হিন্দুস্থানে দীর্ঘ আটশ' বছরের শাসনকালে মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলো। কিন্তু এখন হিন্দুরা বিজয়ী হয়ে তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করছে! বিগত তেরশ' বছর যাবত মুসলমানরা ইহুদীদের সাথে কি আচরণ করেছে আর বর্তমানে ফিলিস্তিনে মুসলমানদের সাথে তাদের আচরণ কেমন!

• এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার মধ্যেও মানুষকে এমন সব নিদর্শন দেখাবেন যা দ্বারা কুরআন যে শিক্ষা দান করছে তা যে সত্য সে কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। কেউ কেউ এ অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে এই

বলে আপত্তি উত্থাপন করেছে যে, আসমান ও যমীনের দিগন্তরাজি এবং নিজের সত্তাকে মানুষ তখনো দেখছিলো। তাই ভবিষ্যতে এসব জিনিসের মধ্যে নিদর্শনাবলী দেখানোর অর্থ কি? কিন্তু ওপরে বর্ণিত অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে আপত্তি যেমন হাল্কা ও গুরুত্বহীন এ আপত্তিও তেমনি হাল্কা ও গুরুত্বহীন। আসমান ও যমীনের দিগন্তরাজি নিসন্দেহে ছিল এবং মানুষ তা সব সময় দেখে এসেছে। তাছাড়া সব যুগে মানুষ তার আপন সত্তাকে যেমনটা দেখেছে এখনো ঠিক তেমনটাই দেখছে। কিন্তু এসব জিনিসের মধ্যে আল্লাহর এত অসংখ্য নিদর্শন আছে যে, মানুষ কখনো তা পূর্ণরূপে জ্ঞানের আওতায় আনতে সক্ষম হয়নি এবং হবেও না। প্রত্যেক যুগে মানুষের সামনে নতুন নতুন নিদর্শন এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে।

৭১. অর্থাৎ মানুষকে মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করার জন্য এতটুকু কথা কি যথেষ্ট নয় যে, ন্যায় ও সত্যের এই আন্দোলনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও ব্যর্থ করার জন্য তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তাদের প্রতিটি আচরণ ও তৎপরতা দেখছেন।

৭২. অর্থাৎ তাদের কখনো আপন রবের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে তারা এ বিশ্বাস পোষণ করে না। তাদের এরূপ আচরণের এটাই মৌলিক কারণ।

৭৩. অর্থাৎ তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করে তারা কোথাও যেতে সক্ষম নয়। তাছাড়া তাঁর রেকর্ড থেকে তাদের কোন আচরণ বাদ পড়াও সম্ভব নয়।

আশ শূরা

৪২

নামকরণ

৩৮ আয়াতের وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এ নামের তাৎপর্য হলো, এটি সেই সূরা যার মধ্যে শূরা শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময় কাল জানা যায়নি। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি حٰمٓ السجدة সূরা নাযিল হওয়ার পরপরই নাযিল হয়েছে। কারণ, এ সূরাটিকে সূরা হা–মীম আস সাজদার এক রকম সম্পূরক বলে মনে হয়। যে ব্যক্তিই মনযোগ সহকারে প্রথমে সূরা হা–মীম আস সাজদা পড়বে এবং তারপর এ সূরা পাঠ করবে সে–ই এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে।

সে দেখবে এ সূরাটিতে কুরাইশ নেতাদের অন্ধ ও অযৌক্তিক বিরোধিতার ওপর বড় মোক্ষম আঘাত হানা হয়েছিল। এভাবে পবিত্র মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকায় অবস্থানকারী যাদের মধ্যেই নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও যুক্তিবাদিতার কোন অনুভূতি আছে তারা জানতে পরবে জাতির উচ্চস্তরের লোকেরা কেমন অন্যায়ভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে আর তাদের মোকাবিলায় তাঁর কথা কত ভারসাম্যপূর্ণ, ভূমিকা কত যুক্তিসঙ্গত এবং আচার–আচরণ কত ভদ্র। ঐ সতর্কীকরণের পরপরই এ সূরা নাযিল করা হয়েছে। ফলে এটি যথাযথভাবে দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছে এবং একান্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের বাস্তবতা বুঝিয়ে দিয়েছে। কাজেই যার মধ্যেই সত্য প্রীতির কিছুমাত্র উপকরণ আছে এবং জাহেলিয়াতের গোমরাহীর প্রেমে যে ব্যক্তি একেবারে অন্ধ হয়ে যায়নি তার পক্ষে এর প্রভাবমুক্ত থাকা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে ঃ তোমরা আমার নবীর পেশকৃত বক্তব্য শুনে এ কেমন আজেবাজে কথা বলে বেড়াচ্ছ? কোন ব্যক্তির কাছে অহী আসা এবং তাকে মানব জাতির পথপ্রদর্শনের হিদায়াত বা পথনির্দেশনা দেয়া কোন নতুন বা অদ্ভুত কথা নয় কিংবা কোন অগ্রহণযোগ্য ঘটনাও নয় যে, ইতিহাসে এই বারই সর্বপ্রথম এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর আগে আল্লাহ নবী–রসূলদের কাছে এ রকম দিক নির্দেশনা দিয়ে একের পর এক অনুরূপ অহী পাঠিয়েছেন। আসমান ও যমীনের অধিকর্তাকে উপাস্য ও শাসক মেনে নেয়া অদ্ভুত ও অভিনব কথা নয়। তাঁর বান্দা হয়ে, তাঁর খোদায়ীর অধীনে বাস করে অন্য

কারো খোদায়ী মেনে নেয়াটাই বরং অদ্ভুত ও অভিনব ব্যাপার। তোমরা তাওহীদ পেশকারীর প্রতি ক্রোধান্বিত হচ্ছো। অথচ বিশ্ব জাহানের মালিকের সাথে তোমরা যে শিরক করছো তা এমন মহা অপরাধ যে আকাশ যদি তাতে ভেঙ্গে পড়ে তাও অসম্ভব নয়। তোমাদের এই ধৃষ্টতা দেখে ফেরেশতারাও অবাক। তারা এই ভেবে সর্বক্ষণ ভীত সন্ত্রস্ত যে কি জানি কখন তোমাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে।

এরপর মানুষকে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে নবী হিসেবে নিয়োজিত করা এবং সেই ব্যক্তির নিজেকে নবী বলে পেশ করার অর্থ এ নয় যে, তাঁকে আল্লাহর সৃষ্টির ভাগ্য বিধাতা বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেই দাবী নিয়েই সে মাঠে নেমেছে। সবার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ নিজের হাতেই রেখেছেন। নবী এসেছেন শুধু গাফিলদের সাবধান এবং পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে। তাঁর কথা অমান্যকারীদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া এবং তাদেরকে আযাব দেয়া বা না দেয়া আল্লাহর নিজের কাজ। নবীকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তাই তোমাদের সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় নেতা ও পীর ফকীররা যে ধরনের দাবী করে অর্থাৎ যে তাদের কথা মানবে না, কিংবা তাদের সাথে বে–আদবী করে তারা তাকে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, নবী এ ধরনের কোন দাবী নিয়ে এসেছেন বলে মনে করে থাকলে সে ভ্রান্ত ধারণা মন–মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলো। এ প্রসঙ্গে মানুষকে একথাও বলা হয়েছে যে, নবী তোমাদের অমঙ্গল কামনার জন্য আসেননি। তিনি বরং তোমাদের কল্যাণকামী। তোমরা যে পথে চলছো সে পথে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস রয়েছে, তিনি শুধু এ বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করছেন।

অতপর আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে সুপথগামী করে কেন সৃষ্টি করেননি এবং মতানৈক্যের এই সুযোগ কেন রেখেছেন, যে কারণে মানুষ চিন্তা ও কর্মের যে কোন উল্টা বা সোজা পথে চলতে থাকে, এ বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে, এ জিনিসের বদৌলতেই মানুষ যাতে আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করতে পারে সে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ইখতিয়ার বিহীন অন্যান্য সৃষ্টিকুলের জন্য এ সুযোগ নেই। এ সুযোগ আছে শুধু স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী সৃষ্টিকুলের জন্য যারা প্রকৃতিগতভাবে নয়, বরং জ্ঞানগত–ভাবে বুঝে শুনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহকে নিজেদের অভিভাবক (PATRON, GUARDIAN) বানিয়েছে। যে মানুষ এই নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করার মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেন এবং সৎ কাজের তাওফীক দান করে তাঁর বিশেষ রহমতের মধ্যে শামিল করে নেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার ভুল পন্থায় ব্যবহার করে যারা প্রকৃত অভিভাবক নয় এবং হতেও পারে না তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা এই রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের ও গোটা সৃষ্টিকুলের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ। অন্যরা না প্রকৃত অভিভাবক, না আছে তাদের প্রকৃত অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ক্ষমতা। মানুষ তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রয়োগ করে নিজের অভিভাবক নির্বাচনে ভুল করবে না এবং যে প্রকৃতই অবিভাবক তাকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে। এর ওপরেই তার সফলতা নির্ভর করে।

তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীন পেশ করছেন তা প্রকৃতপক্ষে কি সে বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ

সেই দীনের সর্বপ্রথম ভিত্তি হলো, আল্লাহ যেহেতু বিশ্ব জাহান ও মানুষের স্রষ্টা, মালিক এবং প্রকৃত অভিভাবক তাই মানুষের শাসনকর্তাও তিনি। মানুষকে দীন ও শরীয়ত (বিশ্বাস ও কর্মের আদর্শ) দান করা এবং মানুষের মধ্যেকার মতানৈক্য ও মতদ্বৈধতার ফায়সালা করে কোন্‌টি হক এবং কোন্‌টি নাহক তা বলে আল্লাহর অধিকারে অন্তর্ভুক্ত। অন্য কোন সত্তার মানুষের জন্য আইনদাতা ও রচয়িতা (Law giver) হওয়ার আদৌ কোন অধিকার নেই। অন্য কথায় প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্বের মত আইন প্রণয়নের সার্বভৌমত্বও আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। মানুষ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা এই সার্বভৌমত্বের ধারক হতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর এই সার্বভৌমত্ব না মানে তাহলে তার আল্লাহর প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব মানা অর্থহীন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য প্রথম থেকেই একটি দীন নির্ধারিত করেছেন।

সে দীন ছিল একটিই। প্রত্যেক যুগে সমস্ত নবী–রসূলকে ঐ দীনটিই দেয়া হতো। কোন নবীই স্বতন্ত্র কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য প্রথম দিন হতে ঐ দীনটিই নির্ধারিত হয়ে এসেছে এবং সমস্ত নবী–রসূল ছিলেন সেই দীনেরই অনুসারী ও আন্দোলনকারী।

শুধু মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকার জন্য সে দীন পাঠানো হয়নি। বরং পৃথিবীতে সেই দীনই প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত থাকবে এবং যমীনে আল্লাহর দীন ছাড়া অন্যদের রচিত দীন যেন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সবসময় এ উদ্দেশ্যেই তা পাঠানো হয়েছে। শুধু এ দীনের তাবলীগের জন্য নবী–রসূলগণ আদিষ্ট ছিলেন না, বরং কায়েম করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন।

এটিই ছিল মানব জাতির মূল দীন। কিন্তু নবী–রসূলদের পরবর্তী যুগে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা আত্মপ্রীতি, স্বেচ্ছাচার এবং আত্মম্ভরিতার কারণে স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ দীনের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করে নতুন নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে যত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম দেখা যায় তার সবই ঐ একমাত্র দীনকে বিকৃত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো তিনি যেন বহুবিধ পথ, কৃত্রিম ধর্মসমূহ এবং মানুষের রচিত দীনের পরিবর্তে সেই আসল দীন মানুষের সামনে পেশ করেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে তোমরা যদি আরো বিগড়ে যাও এবং সংঘাতের জন্য তৎপর হয়ে ওঠো তাহলে সেটা তোমাদের অজ্ঞতা। তোমাদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণে নবী তাঁর কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেবেন না। তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আপনার ভূমিকায় অটল থাকেন এবং যে কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন তা সম্পাদন করেন। যেসব কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস এবং জাহেলী রীতিনীতি ও আচার–অনুষ্ঠান দ্বারা ইতিপূর্বে আল্লাহর দীনকে বিকৃত করা হয়েছে তিনি তোমাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দীনের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করবেন তোমরা তাঁর কাছে এ প্রত্যাশা করো না।

আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করে অন্যদের রচিত দীন ও আইন গ্রহণ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে কত বড় ধৃষ্টতা সে অনুভূতি তোমাদের নেই। নিজেদের দৃষ্টিতে তোমরা একে দুনিয়ার সাধারণ ব্যাপার মনে করছো। তোমরা এতে কোন দোষ দেখতে পাও না। কিন্তু আল্লাহর

দৃষ্টিতে এটা জঘন্যতম শিরক এবং চরমতম অপরাধ। সেই সব লোককে এই শিরক ও অপরাধের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের দীন চালু করেছে এবং যারা তাদের দীনের অনুসরণ ও আনুগত্য করেছে।

এভাবে দীনের একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করার পর বলা হয়েছে, তোমাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য যেসব উত্তম পন্থা সম্ভব ছিল তা কাজে লাগানো হয়েছে। একদিকে আল্লাহ তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। সে কিতাব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পন্থায় তোমাদের নিজের ভাষায় তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য পেশ করছে। অপর দিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী–সাথীদের জীবন তোমাদের সামনে বর্তমান, যা দেখে তোমরা জানতে পার এ কিতাবের দিক নির্দেশনায় কেমন মানুষ তৈরী হয়। এভাবেও যদি তোমরা হিদায়াত লাভ করতে না পার তাহলে দুনিয়ার আর কোন জিনিসই তোমাদেরকে সঠিক পথে আনতে সক্ষম নয়। কাজেই এখন এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যে গোমরাহীতে ডুবে আছো তার মধ্যেই ডুবে থাকো এবং এ রকম পথভ্রষ্টদের জন্য আল্লাহর কাছে যে পরিণতি নির্ধারিত আছে সেই পরিণতির মুখোমুখি হও।

এসব সত্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সংক্ষেপে তাওহীদ ও আখেরাতের স্বপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, দুনিয়া পূজার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, আখেরাতের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং কাফেরদের সেই সব নৈতিক দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে যা তাদের আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মূল কারণ ছিল। তার পর বক্তব্যের সমাপ্তি পর্যায়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে ঃ

এক ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর কিতাব কি—এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এবং ঈমান ও ঈমান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলেন। তারপর হঠাৎ এ দু'টি জিনিস নিয়ে তিনি মানুষের সামনে এলেন। এটা তাঁর নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

দুই ঃ তাঁর পেশকৃত শিক্ষাকে আল্লাহর শিক্ষা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথাবার্তা বলার দাবীদার। আল্লাহর এই শিক্ষা অন্য সব নবী–রসূলদের মত তাঁকেও তিনটি উপায়ে দেয়া হয়েছে। এক–অহী, দুই–পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দেয়া এবং তিন—ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গাম। এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যাতে বিরোধীরা এ অপবাদ আরোপ করতে না পারে যে, নবী (সা) আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথা বলার দাবী করছেন। সাথে সাথে ন্যায়বাদী মানুষেরা যেন জানতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মানুষটিকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তাঁকে কোন্ কোন্ উপায় ও পন্থায় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾

হা মীম, আইন সীন ক্বাফ। মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের (রসূল) কাছে এভাবেই অহী পাঠিয়ে আসছেন।[১] আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর। তিনি সর্বোন্নত ও মহান।[২] আসমান ওপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়।[৩] ফেরেশতারা প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যায়।[৪] জেনে রাখো, প্রকৃতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৫] যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের অভিভাবক[৬] বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহই তাদের তত্বাবধায়ক। তুমি তাদের জিম্মাদার নও।[৭]

১. বক্তব্য শুরু করার এই ভঙ্গি থেকেই বুঝা যায়, সেই সময় পবিত্র মক্কার প্রতিটি মাহফিল ও গ্রাম্য বিপণী, প্রতিটি গলি ও বাজার এবং প্রতিটি বাড়ী ও বিপনীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন ও কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে যে জোর গুজব, কানাঘুষা ও আলোচনা চলছিলো তা–ই ছিল এর পটভূমি। লোকেরা বলতো ঃ এ ব্যক্তি কোথা থেকে এসব অভিনব কথা নিয়ে আসছে তা কে জানে। এ রকম কথা আমরা

কখনো শুনিনি বা হতেও দেখিনি। তারা বলতো ঃ বাপ–দাদা থেকে যে দীন চলে আসছে, গোটা জাতি যে দীন অনুসরণ করছে, সমগ্র দেশে যে নিয়ম পদ্ধতি শত শত বছর ধরে প্রচলিত আছে এ লোকটি তার সব কিছুকেই ভুল বলে আখ্যায়িত করছে এবং বলছে, আমি যে দীন পেশ করছি সেটিই ঠিক। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারা বলতো ঃ এ লোকটি যদি এই বলে তার বক্তব্য পেশ করতো যে, বাপ–দাদার ধর্ম এবং প্রচলিত নিয়ম–পদ্ধতির মধ্যে তার দৃষ্টিতে কিছু দোষ–ত্রুটি আছে এবং সে চিন্তা–ভাবনা করে নিজে কিছু নতুন বিষয় বের করেছে তাহলে তা নিয়েও আলোচনা করা যেতো। কিন্তু সে বলে, আমি তোমাদের যা শুনাচ্ছি তা আল্লাহর বাণী। একথা কি করে মেনে নেয়া যায়। আল্লাহ কি তার কাছে আসেন? না কি সে নিজে আল্লাহর কাছে যায়। না তার ও আল্লাহর মধ্যে কথাবার্তা হয়? এসব আলোচনা ও কানাঘুষার জবাবে বাহ্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু মূলত কাফেরদের শুনিয়ে বলা হয়েছে ঃ হাঁ, মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ অহীর মাধ্যমে এসব কথাই বলছেন এবং পূর্বের সমস্ত নবী–রসূলদের কাছে এসব বিষয় নিয়েই অহী নাযিল হতো।

অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দ্রুত ইংগিত এবং গোপন ইংগিত অর্থাৎ এমন ইংগিত যা অতি দ্রুত এমনভাবে করা হবে যে তা কেবল ইংগিতদাতা এবং যাকে ইংগিত করা হয়েছে সেই জানতে ও বুঝতে পারবে। তাছাড়া অন্য কেউ তা জানতে পারবে না। এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে এমন দিক নির্দেশনা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কোন বান্দার মনে বিদ্যুৎ চমকের মত নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহর এ বাণীর উদ্দেশ্য হলো, কোন বান্দার কাছে আল্লাহর আসার কিংবা তাঁর কাছে কোন মানুষের যাওয়ার এবং সামনাসামনি কথা বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়। মানুষের হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার জন্য যখনই তিনি কোন বান্দার সাথে যোগাযোগ করতে চান তখন কোন অসুবিধাই তাঁর ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এ কাজের জন্য তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা অহী পাঠানোর পথ অবলম্বন করেন। সূরার শেষ আয়াতগুলোতে এ বিষয়টিরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং সেখানে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

তাদের ধারণা ছিল এসব হচ্ছে অদ্ভুত ও অভিনব কথা। তার জবাবে বলা হয়েছে, এসব অদ্ভুত ও অভিনব কথা নয়। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যত নবী–রসূল এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকেই এসব হিদায়াতই দান করা হতো।

২. শুধু আল্লাহর প্রশংসার জন্য এই প্রারম্ভিক বাক্যটি বলা হচ্ছে না। যে পটভূমিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এর প্রতিটি শব্দ তার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে শোরগোল ও কানাঘুষা করছিলো তাদের আপত্তির প্রথম ভিত্তি হলো, নবী (সা) তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এতে তারা উৎকর্ণ হয়ে বলতো ঃ যদি শুধুমাত্র আল্লাহ একাই উপাস্য, প্রয়োজন পূরণকারী এবং আইনদাতা হন তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ কোন্ মর্যাদার অধিকারী? এর জবাবে বলা হয়েছে এই গোটা বিশ্ব জাহান আল্লাহর সাম্রাজ্য। মালিকের মালিকানায় অন্য কারো খোদায়ী কি করে চলতে পারে? বিশেষ করে যাদের খোদায়ী মানা হয় কিংবা যারা

নিজেদের খোদায়ী চালাতে চায়। তারা নিজেরাও তাঁর মালিকানাভুক্ত তারপর বলা হয়েছে তিনি সর্বোন্নত ও মহান। তাই কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার এবং অধিকারের মধ্যে কোনটিতেই অংশীদার হতে পারে না।

৩. অর্থাৎ কোন সৃষ্টির বংশধারা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা এবং তাকে আল্লাহর পুত্র বা কন্যা আখ্যায়িত করা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। কাউকে অভাব পূরণকারী ও বিপদ ত্রাণকারী বানিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তার কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেছে। কাউকে সারা দুনিয়ার সাহায্যকারী মনে করে নেয়া হয়েছে এবং প্রকাশ্যে বলতে শুরু করা হয়েছে যে, আমাদের হযরত সব সময় সব স্থানে সবার কথা শোনেন। তিনিই প্রত্যেকের সাহায্যের জন্য হাজির হয়ে তার কাজ উদ্ধার করে দেন। কাউকে আদেশ নিষেধ এবং হালাল ও হারামের মালিক মোখতার মেনে নেয়া হয়েছে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ এমনভাবে তার নির্দেশের আনুগত্য করতে শুরু করেছে যেন সে–ই তাদের আল্লাহ। এগুলো আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন ধৃষ্ঠতা যে এতে আসমান ভেঙে পড়াও অসম্ভব নয়। (সূরা মারয়ামের ৮৮ থেকে ৯১ আয়াতে এই একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে)।

৪. অর্থাৎ মানুষের এসব কথা শুনে শুনে ফেরেশতারা এই বলে কানে হাত দেয় যে, আমাদের রব সম্পর্কে এসব কি বাজে বলা হচ্ছে এবং পৃথিবীর এই মাখলুক এ কি ধরনের বিদ্রোহ করেছে? তারা বলে ঃ সুবহানাল্লাহ! কে এমন মর্যাদার অধিকারী হতে পারে যে, বিশ্ব জাহানের রবের সাথে 'উলুহিয়াত' ও সার্বভৌম ক্ষমতায় শরীক হতে পারে। তিনি ছাড়া আমাদের ওসব বান্দার জন্য আর কে পৃষ্ঠপোষক আছে যে তার প্রশংসা গীতি গাইতে হবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া তারা উপলব্ধি করে যে, পৃথিবীতে এটা এমন এক মহা অপরাধ করা হচ্ছে যার কারণে যে কোন সময় আল্লাহর গযব নেমে আসতে পারে। তাই তারা পৃথিবীতে বসবাসকারী এই আত্মসংহারী বান্দাদের জন্য বার বার এই বলে দয়া ও করুণার আবেদন জানায় যে, তাদেরকে যেন এখনই শাস্তি দেয়া না হয় এবং সামলে নেয়ার জন্য তাদেরকে আরো কিছুটা সুযোগ দেয়া হয়।

৫. অর্থাৎ এটা তাঁর উদারতা, দয়া ও ক্ষমাশীলতা যার কল্যাণে কুফর, শিরক ও নাস্তিকতা এবং পাপাচার ও চরম জুলুম–নির্যাতনে লিপ্ত ব্যক্তিরাও বছরের পর বছর, এমনকি এ ধরনের পুরো এক একটা সমাজ শত শত বছর পর্যন্ত এক নাগাড়ে অবকাশ পেয়ে থাকে। তারা শুধু রিযিকই লাভ করে না, পৃথিবীতে তাদের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে তাছাড়া পৃথিবীর এমন সব উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম দ্বারা তারা অনুগৃহীত হয় যা দেখে নির্বোধ লোকেরা এই ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হয় যে, হয়তো এ পৃথিবীর কোন খোদা–ই নেই।

৬. মূল আয়াতে اولياء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আরবী ভাষায় যার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভিন্ন আকীদা–বিশ্বাস এবং ভিন্ন ভিন্ন অনেক কর্মপদ্ধতি আছে। কুরআন মজীদে এগুলোকেই "আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক বানানো" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন মজীদে অনুসন্ধান করলে ولى শব্দটির নিম্নবর্ণিত অর্থসমূহ জানা যায় ঃ

এক ঃ মানুষ যার কথামত কাজ করে, যার নির্দেশনা মেনে চলে এবং যার রচিত নিয়ম–পন্থা, রীতিনীতি এবং আইন–কানুন অনুসরণ করে (আন নিসা, আয়াত ১১৮ থেকে ১২০; আল–আ'রাফ, আয়াত ৩ ও ২৭ থেকে ৩০)।

দুই ঃ যার দিকনির্দেশনার (Guidance) ওপর মানুষ আস্থা স্থাপন করে এবং মনে করে সে তাকে সঠিক রাস্তা প্রদর্শনকারী এবং ভ্রান্তি থেকে রক্ষাকারী। (আল বাকারা–২৫৭; বানী ইসরাঈল–৯৭; আল কাহাফ–১৭ ও আল জাসিয়া–১৯ আয়াত)।

তিন ঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, আমি পৃথিবীতে যাই করি না কেন সে আমাকে তার কুফল থেকে রক্ষা করবে। এমনকি যদি আল্লাহ থাকেন এবং আখেরাত সংঘটিত হয় তাহলে তার আযাব থেকেও রক্ষা করবেন (আন নিসা– ১২৩–১৭৩; আল আনআম–৫১; আর রা'দ ৩৭; আল আনকাবুত–২২; আল আহযাব–৬৫; আয–যুমার–৩ আয়াত)।

চার ঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, পৃথিবীতে তিনি অতি প্রাকৃতিক উপায়ে তাকে সাহায্য করেন, বিপদাপদে তাকে রক্ষা করেন। রুজি–রোজগার দান করেন, সন্তান দান করেন, ইচ্ছা পূরণ করেন এবং অন্যান্য সব রকম প্রয়োজন পূরণ করেন (হুদ–২০, আর রা'দ–১৬ ও আল আনকাবুত–৪১ আয়াত)।

অলী (ولى) শব্দটি কুরআন মজীদের কোন কোন জায়গায় ওপরে বর্ণিত অর্থসমূহের কোন একটি বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও সবগুলো অর্থ একত্রেও বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি তারই একটি। এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অলী বা অভিভাবক বানানোর অর্থ ওপরে বর্ণিত চারটি অর্থেই তাদেরকে পৃষ্টপোষক, সহযোগী ও সাহায্যকারী মনে করা।

৭. আল্লাহই তাদের তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ তিনি তাদের সমস্ত কাজকর্ম দেখছেন এবং তাদের আমলনামা প্রস্তুত করছেন। তাদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া ও তাদেরকে পাকড়াও করা তাঁরই কাজ। "তুমি তাদের জিম্মাদার নও"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়নি যে, যারা তোমার কথা মানবে না তাদেরকে তুমি জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে, কিংবা ক্ষমতাচ্যুত করবে অথবা তছনছ করে ফেলবে। একথার অর্থ আবার এও নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে সে রকম মনে করতেন। তাই তাঁর ভুল ধারণা বা আত্মবিভ্রম দূর করার জন্য একথা বলা হয়েছে। বরং কাফেরদের শুনানোই এর মূল উদ্দেশ্য। যদিও বাহ্যিকভাবে নবীকেই (সা) সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের মধ্যে যারা খোদাপ্রাপ্তি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রহসন করে সাধারণত যেভাবে ঘটা করে তা দাবী করে আল্লাহর নবী তেমন কোন দাবী করেন না। জাহেলী সমাজে সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, 'দরবেশ' শ্রেণীর লোকেরা এমন প্রতিটি মানুষের ভাগ্য নষ্ট করে দেয় যারা তাদের সাথে বে–আদবী করে। এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও কেউ যদি তাদের কবরেরও অবমাননা করে এবং অন্য কিছু না করলেও যদি তাদের মনের মধ্যে কোন খারাপ ধারণার উদয় হয় তাহলেই তাকে ধ্বংস করে দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ ধারণা ঐ সব "দরবেশ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۝ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ؗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

হে নবী, এভাবেই আমি এই আরবী কুরআন অহী করে তোমার কাছে পাঠিয়েছি[৮] যাতে তুমি জনপদসমূহের কেন্দ্র (মক্কানগরী) ও তার আশেপাশের অধিবাসীদের সতর্ক করে দাও[৯] এবং একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও[১০] যার আগমনে কোন সন্দেহ নেই। এক দলকে জান্নাতে যেতে হবে এবং অপর দলকে যেতে হবে দোযখে।

আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এদের সবাইকে এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করেন। জালেমদের না আছে কোন অভিভাবক না আছে সাহায্যকারী।[১১] এরা কি (এমনই নির্বোধ যে) তাকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে? অভিভাবক তো একমাত্র আল্লাহ। তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিশালী।[১২]

মহামান্যরা" নিজেরাই প্রচার করেন এবং যেসব নেককার লোক নিজেরা এ কাজ করেন না কিছু ধূর্ত লোক তাদের হাড্ডিসমূহকে নিজেদের ব্যবসায়ের পুঁজি বানানোর জন্য তাদের সম্পর্কে এ ধারণা প্রচার করতে থাকে। যাই হোক মানুষের ভাগ্য গড়া ও ভাঙার ক্ষমতা–ইখতিয়ার থাকাকেই সাধারণ মানুষ রূহানিয়াত ও খোদাপ্রাপ্তির অতি আবশ্যকীয় দিক বলে মনে করেছে। প্রতারণার যাদুর এই মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য আল্লাহ কাফেরদের শুনিয়ে তাঁর রসূলকে বলছেন, নিসন্দেহে তুমি আমার নবী এবং আমি তোমাকে আমার অহী দিয়ে সম্মানিত করেছি। শুধু মানুষকে সঠিক পথ দেখানোই তোমার কাজ। তাদের ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়নি। তা আমি নিজের হাতেই রেখেছি। বান্দার কাজকর্ম বিচার করা এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়া বা না দেয়া আমার নিজের দায়িত্ব।

৮. বক্তব্যের প্রারম্ভে যা বলা হয়েছিলো সে কথার পুনরাবৃত্তি করে আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে। 'আরবী ভাষার কুরআন' বলে শ্রোতাদের বুঝানো হয়েছে, এটা অন্য কোন ভাষায় নয় তোমাদের নিজেদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তোমরা নিজেরাই তা সরাসরি বুঝতে পারো। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখো, আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া এই পাক-পবিত্র ও নিস্বার্থ দিক নির্দেশনা কি আর কারো পক্ষ থেকে হতে পারে?

৯. অর্থাৎ তাদেরকে গাফলতি থেকে জাগিয়ে দাও এবং এই মর্মে সতর্ক করে দাও যে, ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের যে গোমরাহী এবং নৈতিকতা ও চরিত্রের যে অকল্যাণ ও ধ্বংসকারিতার মধ্যে তোমরা ডুবে আছ এবং তোমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবন যে বিকৃত নীতিমালার ওপর চলছে তার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়।

১০. অর্থাৎ তাদেরকে এও বলে দাও যে, এই ধ্বংস শুধু দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, ভবিষ্যতে এমন দিনও আসবে যখন আল্লাহ সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে তাদের হিসাব নিবেন। কোন ব্যক্তি যদি তার গোমরাহী ও দুষ্কর্মের পরিণাম ফল থেকে পৃথিবীতে বেঁচে গিয়েও থাকে তাহলে সেদিন তার বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। আর সেই ব্যক্তি তো বড়ই দুর্ভাগা যে এখানেও অকল্যাণ লাভ করলো, সেখানেও দুর্ভাগ্যের শিকার হলো।

১১. এখানে এই বক্তব্যের মধ্যে একথাটি বলার তিনটি উদ্দেশ্য আছে ঃ

প্রথমত–এ কথা বলার উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা এবং সান্ত্বনা দান করা। এতে নবীকে (সা) বুঝানো হয়েছে, তিনি মক্কার কাফেরদের অজ্ঞতা, গোমরাহী ও বাহ্যিক ভাবে তাদের একগুঁয়েমী ও হঠকারিতা দেখে যেন বেশী মনোকষ্ট ও দুঃখ না পান। মানুষকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও নির্বাচন করার স্বাধীনতা দেয়াই আল্লাহর ইচ্ছা। তারপর যে হিদায়াত চাইবে সে হিদায়াত লাভ করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হতে চাইবে সে পথভ্রষ্ট হবে। সে যেদিকে যেতে চায় সেদিকেই যাবে। আল্লাহর অভিপ্রায় ও বিবেচ্য যদি এটা না হতো তাহলে নবী-রসূল ও কিতাব পাঠানোর প্রয়োজনই বা কি ছিল? সে জন্য মহান আল্লাহর একটি সৃষ্টিসূচক ইংগিতই যথেষ্ট ছিল। এভাবে সমস্ত মানুষ ঠিক তেমনি তাঁর আদেশ মেনে চলতো যেমন আদেশ মেনে চলে নদী, পাহাড়, গাছ, মাটি, পাথর ও সমস্ত জীবজন্তু। (এ উদ্দেশ্যে এ বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য জায়গায়ও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ৩৫, ৩৬ ও ১০৭ টীকাসহ।

দ্বিতীয়ত–আল্লাহ যদি সত্যিই মানুষকে পথ দেখাতে চাইতেন আর মানুষের মধ্যে আকীদা ও কর্মের যে পার্থক্য বিস্তার লাভ করে আছে তা তাঁর পসন্দ না হতো এবং মানুষ ঈমান ও ইসলামের পথ অনুসরণ করুক তাই যদি তাঁর মনঃপুত, তাহলে এই কিতাব ও নবুওয়াতের কি প্রয়োজন ছিল? এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে যেসব মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছিলো এখানে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি সব মানুষকে মু'মিন ও মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করে এ কাজ সহজেই করতে পারতেন। এই বিভ্রান্তি ও দ্বিধা দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি হিসেবে যুক্তি দেখানো হয় যে, আল্লাহ যখন তা করেননি তখন নিশ্চয়ই তিনি ভিন্ন কোন পথ পসন্দ করেন। আমরা যে পথে চলছি সেটিই সেই পথ আর যা কিছু করছি তাঁরই ইচ্ছায় করছি। তাই এ ব্যাপারে আপত্তি করার অধিকার কারো নেই। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর

করার জন্যও এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১১২, ১৩৮, ১৪৮, ১৪৯ টীকাসহ; সূরা নূর এর (তাফহীম) ভূমিকা; ইউনুস আয়াত ৯৯, টীকাসহ; হূদ আয়াত ১১৮ টীকাসহ; আন নাহল, আয়াত ৯ টীকাসহ, আয়াত ৩৬ ও ৩৭ টীকাসহ।

তৃতীয়ত–এর উদ্দেশ্য দীনের প্রচার ও আল্লাহর সৃষ্টির সংশোধন ও সংস্কারের পথে যেসব বিপদাপদ আসে ঈমানদারদেরকে তার বাস্তবতা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করানো। যারা আল্লাহর দেয়া বাছাই ও ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং তার ভিত্তিতে স্বভাব-চরিত্র ও পন্থা-পদ্ধতির ভিন্ন হওয়ার বাস্তবতা উপলব্ধি করে না তারা কখনো সংস্কার কার্যের মন্থর গতি দেখে নিরাশ হতে থাকে। তারা চায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু 'কারামত' ও 'মু'জিযা' দেখানো যা দেখামাত্র মানুষের মন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আবার কখনো তারা প্রয়োজনের অধিক আবেগ-উত্তেজনার বশে সংস্কারের অবৈধ পন্থা-পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে (এ উদ্দেশ্যেও কুরআন মজীদের কয়েকটি জায়গায় এ বিষয়টি বলা হয়েছে। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা রা'দ আয়াত ৩১ টীকাসহ; সূরা নাহল, আয়াত ৯০ থেকে ৯৩ টীকাসহ।)

এ উদ্দেশ্যে একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ কয়টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব এবং আখেরাতে তাঁর জান্নাত কোন সাধারণ রহমত নয় যা মাটি ও পাথর এবং গাধা ও ঘোড়ার মত মর্যাদার সৃষ্টিকুলকে সাধারণ ভাবে বন্টন করে দেয়া যায়। এটা তো একটা বিশেষ এবং অনেক উচ্চ পর্যায়ের রহমত যার জন্য ফেরেশতাদেরকেও উপযুক্ত মনে করা হয়নি। এ কারণেই মানুষকে একটি স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টির মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁর পৃথিবীর এসব অঢেল উপায়-উপকরণ তার কর্তৃত্বাধীনে দিয়েছেন এবং এসব সাংঘাতিক শক্তিও তাকে দান করেছেন। যাতে সে সেই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে এবং এতে কামিয়াব হওয়ার পরই কেবল কোন বান্দা তাঁর এই বিশেষ রহমত লাভের উপযুক্ত হতে পারে। এ রহমত আল্লাহর নিজের জিনিস। এর ওপর আর কারো ইজারাদারী নেই। কেউ তার ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে তা দাবী করেও নিতে পারে না। এমন শক্তিও কারো নেই যে, জোর করেই তা লাভ করতে পারে। সে-ই কেবল তা নিতে পারে যে আল্লাহর কাছে তার দাসত্ব পেশ করবে, তাঁকেই নিজের অভিভাবক বানাবে এবং তাঁরই সাথে লেগে থাকবে। এ অবস্থায় আল্লাহ তাকে সাহায্য ও দিকনির্দেশনা দান করেন এবং তাকে নিরাপদে এ পরীক্ষা পাস করার তাওফীক দান করেন যাতে সে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু যে জালেম আল্লাহর দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে নিজের অভিভাবক বানিয়ে নেয়, অযথা জোর করে তাঁর অভিভাবক হওয়ার এমন কোন প্রয়োজন আল্লাহর পড়েনি। সে অন্য যাদেরকে অভিভাবক বানায় তাদের আদৌ এমন কোন জ্ঞান, শক্তি বা ক্ষমতা-ইখতিয়ার নেই যার ভিত্তিতে অভিভাবকত্বের হক আদায় করে তাকে সফল করিয়ে দিতে পারে।

১২. অর্থাৎ অভিভাবকত্ব কোন মনগড়া বস্তু নয় যে, আপনি যাকে ইচ্ছা আপনার অভিভাবক বানিয়ে নিবেন আর বাস্তবেও সে আপনার অভিভাবক হয়ে যাবে এবং

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

তোমাদের[১৩] মধ্যে যে ব্যাপারেই মতানৈক্য হোকনা কেন তার ফয়সালা করা আল্লাহর কাজ।[১৪] সেই আল্লাহই আমার[১৫] রব, আমি তাঁর ওপরেই ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই আমি ফিরে যাই।[১৬] আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি তোমাদের আপন প্রজাতি থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ অন্যান্য জীবজন্তুর ও (তাদের নিজ প্রজাতি থেকে) জোড়া বানিয়েছেন এবং এই নিয়মে তিনি তোমাদের প্রজন্মের বিস্তার ঘটান। বিশ্ব জাহানের কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।[১৭] তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন।[১৮] আসমান ও যমীনের ভাণ্ডারসমূহের চাবি তাঁরই হাতে, যাকে ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। তিনি সব কিছু জানেন।[১৯]

অভিভাবকত্বের হক আদায় করবে। এটা এমন এক বাস্তব জিনিস যা মানুষের আশা আকাংখা অনুসারে হয় না বা পরিবর্তিতও হয় না। আপনি মানেন আর না মানেন বাস্তবে যিনি অভিভাবক তিনিই আপনার অভিভাবক। আর বাস্তবে যে অভিভাবক নয় আপনি মৃত্যু পর্যন্ত তাকে মানলেও এবং অভিভাবক মনে করলেও সে অভিভাবক নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু আল্লাহই অভিভাবক আর কেউ অভিভাবক নয় তার প্রমাণ কি? এর জবাব হচ্ছে, মানুষের প্রকৃত অভিভাবক হতে পারেন তিনি যিনি মৃত্যুকে জীবনে রূপ দেন, যিনি প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে জীবন দান করে জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করার শক্তি ও ইখতিয়ারের অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ যদি তেমন থাকে তাহলে তাকে অভিভাবক বানাও। আর যদি শুধু আল্লাহই তেমন হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৩. এই গোটা অনুচ্ছেদটি যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে বলা হয়েছে, কিন্তু বক্তা এখানে আল্লাহ নন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মহান আল্লাহ যেন তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি একথা ঘোষণা করো। কুরান মজীদে এ ধরনের বিষয়বস্তুত কোথাও قُلْ (হে নবী, তুমি বলো) শব্দ দ্বারা শুরু হয় এবং কোথাও তা ছাড়াই শুরু হয়। সে ক্ষেত্রে কথার ভঙ্গিই বলে দেয়, এখানে বক্তা আল্লাহ নন, আল্লাহর রসূল। কোন কোন স্থানে তো আল্লাহর বাণীর বক্তা থাকেন ঈমানদারগণ। এর উদাহরণ সূরা ফাতেহা, কিংবা ফেরেশতাগণ। যেমন সূরা মারয়ামের ৬৪ থেকে ৬৫ আয়াত।

১৪. এটা আল্লাহর বিশ্ব জাহানের অধিপতি এবং সত্যিকার অভিভাবক হওয়ার স্বাভাবিক ও যৌক্তিক দাবী। রাজত্ব ও অভিভাবকত্ব যখন তাঁরই তখন শাসকও অনিবার্যরূপে তিনিই এবং মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া–বিবাদ ও মতানৈক্যের ফায়সালা করাও তাঁরই কাজ। যারা এ বিষয়টিকে আখেরাতের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করে তারা ভুল করে। আল্লাহর এই সার্বভৌম মর্যাদা যে এই দুনিয়ার জন্য নয়, শুধু মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য তার কোন প্রমাণ নেই। একইভাবে যারা তাঁকে শুধু এই দুনিয়ার আকীদা–বিশ্বাস এবং কতিপয় ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করে তারাও ভুল করে। কুরআন মজীদের ভাষা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক। তাতে সব রকম বিবাদ ও মতানৈক্যের ক্ষেত্রে তা একমাত্র আল্লাহকেই ফায়সালা করার প্রকৃত অধিকারী বলে পরিষ্কার ও সুনিশ্চিতভাবে আখ্যায়িত করছে। সেই অনুসারে আল্লাহ যেমন আখেরাতের مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (প্রতিদান দিবসের মালিক) তেমনি এই পৃথিবীরও أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (সব শাসকের চাইতে বড় শাসক)। আকীদাগত মতানৈক্যের ক্ষেত্রে হক কোনটি আর বাতিল কোনটি সে বিষয়ের ফায়সালা যেমন তিনিই করবেন তেমনি আইনগত ক্ষেত্রেও তিনিই ফায়সালা করবেন মানুষের জন্য কোন্‌টি পবিত্র আর কোন্‌টি অপবিত্র, কোনটি বৈধ ও হালাল আর কোন্‌টি হারাম ও মাকরূহ? নৈতিকতার ক্ষেত্রে অন্যায় ও অশোভন কি আর ন্যায় ও শোভনীয় কি? পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন্‌টি কার প্রাপ্য আর কোনটি প্রাপ্য নয়? জীবনাচার, সভ্যতা, রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা ও পদ্ধতি বৈধ আর কোনটি ভুল ও অবৈধ তাঁর সবই তিনি স্থির করবেন। এর ওপর ভিত্তি করেই তো আইনের মূলনীতি হিসেবে কুরআন মজীদে একথা বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে যে,

فَاِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ – النساء : ٥٩

(যদি কোন ব্যাপারে তোমরা বিবাদে জড়িয়ে পড়ো তাহলে সেটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দাও)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ – الاحزب : ٣٦

(আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর জন্য সে ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকে না) এবং

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ – الاعراف : ٣

(তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না।)

তাছাড়া যে প্রসঙ্গে এ আয়াত এসেছে তার মধ্যেও এটি আরো একটি অর্থ প্রকাশ করছে। সেটি হচ্ছে আল্লাহ শুধু মতবিরোধসমূহের মীমাংসা করার আইনগত অধিকারীই নন, যা মানা বা না মানার ওপর ব্যক্তির কাফের বা মু'মিন হওয়া নির্ভরশীল। বরং প্রকৃতপক্ষে কার্যত তিনিই হক ও বাতিলের ফায়সালা করছেন, যে কারণে বাতিল ও তার পূজারীরা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয় এবং হক ও তার অনুসারীরা সফলকাম হয়। পৃথিবীর মানুষ যে ফায়সালা কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে বলে যতই মনে করুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। পরবর্তী ২৪ আয়াতেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এবং এর আগেও কুরআন মজীদের কতিপয় স্থানে আলোচিত হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রা'দ, টীকা ৩৪–৬০; সূরা ইবরাহীম, টীকা ২৬–৩৪; সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১০০; সূরা আম্বিয়া ১৫, ১৮–৪৪, ৪৬)

১৫. অর্থাৎ যিনি মতবিরোধসমূহের ফায়সালাকারী আসল শাসক।

১৬. এ দু'টি ক্রিয়াপদ। এর একটি অতীতকাল সূচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং অপরটি বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল সূচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যার মধ্যে চলমানতা বা নিরবচ্ছিন্নতার অর্থ বিদ্যমান। অতীতকাল সূচক শব্দে বলা হয়েছে ঃ আমি তাঁর ওপরেই ভরসা করেছি। "অর্থাৎ একবার আমি চিরদিনের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে তাঁরই সাহায্য, তাঁরই দিক নির্দেশনা, তাঁরই আশ্রয় ও সংরক্ষণ এবং তাঁরই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হবে। অতপর বর্তমান ও ভবিষ্যত সূচক ক্রিয়াপদটিতে বলা হয়েছে ঃ আমি তাঁর কাছেই ফিরে যাই।" অর্থাৎ আমার জীবনে যা–ই ঘটে সে ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছেই ফিরে যাই। কোন বিপদাপদ, দুঃখ–কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হলে আর কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। কোন বিপদ আপতিত হলে তাঁর আশ্রয় তালাশ করি এবং তাঁর নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করি। কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁর কাছে দিক নির্দেশনা চাই এবং তাঁরই শিক্ষা ও নির্দেশনামায় সে সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান করি। আর কোন বিবাদের মুখোমুখি হলে তাঁরই দিকে চেয়ে থাকি। কেননা, তিনিই তার চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ বিষয়ে তিনি যে ফায়সালা করবেন সেটিই হবে সঠিক ও ন্যায়সংগত।

১৭. মূল আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "কোন জিনিসই তাঁর মত জিনিসের অনুরূপও নয়।" তাফসীরকার ও ভাষাবিদদের কেউ কেউ বলেন ঃ এ বাক্যাংশে مثل শব্দটির কাফ বর্নটি (সামঞ্জস্যের অর্থ প্রকাশক হরফ) সংযোজন বাকধারা হিসেবে করা হয়েছে। বক্তব্যকে জোরালো করাই এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং আরবে এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গি প্রচলিত। যেমন ঃ কবি বলেন ঃ وقتلى كمثل جذوع النخل অন্য আরেকজন কবি বলেছেন ঃ ما ان كمثلهم فى الناس من احد অপর কিছু সংখ্যক লোকের মত হলো ঃ "তাঁর মত কেউ নেই" বলার চেয়ে তাঁর মত জিনিসের অনুরূপও কেউ নেই বলার মধ্যে অতিশয়তার অর্থ আছে। অর্থাৎ আল্লাহর মত তো দূরের কথা

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ؀

তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই সব নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মাদ) যা এখন আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম (আ) মূসা (আ) ও ঈসাকে (আ)। তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে যে, এ দীনকে কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ভিন্ন হয়ো না।[২০] (হে মুহাম্মাদ) এই কথাটিই এসব মুশরিকের কাছে অত্যন্ত অপসন্দনীয় যার দিকে তুমি তাদের আহবান জানাচ্ছো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং তিনি তাদেরকেই নিজের কাছে আসার পথ দেখান যারা তাঁর প্রতি রুজু করে।[২১]

অসম্ভব হলেও যদি আল্লাহর সদৃশ কোন বস্তু আছে বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলে সেই সদৃশের অনুরূপ কোন জিনিসও থাকতো না।

১৮. অর্থাৎ একই সাথে গোটা বিশ্ব জাহানের সবারই কথা শুনছেন এবং সব কিছুই দেখছেন।

১৯. শুধু একমাত্র আল্লাহই কেন প্রকৃত অভিভাবক, তাঁর ওপর নির্ভর করাই যুক্তিযুক্ত ও সঠিক কেন এবং কেন শুধু তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে, এগুলোই তার যুক্তি। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল, টীকা ৭৩-৮৩; সূরা আর রূম টীকা ২৫-৩১)

২০. প্রথম আয়াতে যে কথাটি বলা হয়েছিলো এখানে সেই কথাটিই আরো বেশী পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন। নবী-রসূলদের মধ্যে কেউই কোন নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। প্রথম থেকেই সমস্ত নবী-রসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে একই দীন পেশ করে আসছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই একই দীন পেশ করছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম হযরত নূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপ্লাবনের পর তিনিই ছিলেন বর্তমান মানব গোষ্ঠীর সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি শেষ নবী। তারপর হযরত ইবরাহীমের (আ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে, আরবের লোকেরা যাঁকে তাদের নেতা

বলে মানতো। সর্বশেষে হযরত মূসা এবং ঈসার কথা বলা হয়েছে যাঁদের সাথে ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের ধর্মকে সম্পর্কিত করে থাকে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, শুধু এই পাঁচজন নবীকেই উক্ত দীনের হিদায়াত দান করা হয়েছিলো। বরং একথা বলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য যে, পৃথিবীতে যত নবী-রসূলই আগমন করেছেন তাঁরা সবাই একই দীন নিয়ে এসেছেন। নমুনা হিসেবে এমন পাঁচজন মহান নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাঁদের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ সুবিখ্যাত আসমানী শরীয়তসমূহ লাভ করেছে।

যেহেতু এ আয়াতটি দীন ও দীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেছে। তাই সে বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে বুঝে নেয়া আবশ্যক ঃ

বলা হয়েছে شَرَعَ لَكُمْ "তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন।" شَرَعَ শব্দের আভিধানিক অর্থ রাস্তা তৈরী করা এবং এর পারিভাষিক অর্থ পদ্ধতি, বিধি ও নিয়ম-কানুন রচনা করা। এই পারিভাষিক অর্থ অনুসারে আরবী ভাষায় تشريع শব্দটি আইন প্রণয়ন(Legislation) شرع এবং شريعت শব্দটি আইন (Law) এবং شارع শব্দটি আইন প্রণেতার (Lawgiver) সমার্থক বলে মনে করা হয়। আল্লাহই বিশ্ব জাহানের সব কিছুর মালিক, তিনিই মানুষের প্রকৃত অভিভাবক এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়েই মতভেদ হোক না কেন তার ফায়সালা করা তাঁরই কাজ। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের যেসব মৌলিক সত্য বর্ণিত হয়েছে তারই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে আল্লাহর এই আইন রচনা। এখন মৌলিকভাবে যেহেতু আল্লাহই মালিক, অভিভাবক ও শাসক, তাই মানুষের জন্য আইন ও বিধি রচনার এবং মানুষকে এই আইন ও বিধি দেয়ার অনিবার্য অধিকার তাঁরই। আর এভাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

পরে বলা হয়েছে مِنَ الدِّيْنِ 'দীন' থেকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এর অনুবাদ করেছেন আইন থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন আইনের পর্যায়ভুক্ত। আমরা ইতিপূর্বে সূরা যুমারে ৩নং টীকায় دِيْن শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছি তা যদি সামনে থাকে তাহলে একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, দীন অর্থই কারো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা। এ শব্দটি যখন পন্থা বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় এমন পদ্ধতি যাকে ব্যক্তি অবশ্য অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং তার যার নির্ধারণকারীকে অবশ্য অনুসরণযোগ্য বলে মেনে চলে। এ কারণে আল্লাহর নির্ধারিত এই পদ্ধতিকে দীনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আইন বলার পরিষ্কার অর্থ হলো এটা শুধু সুপারিশ (Recomendation) ও ওয়াজ-নসীহতের মর্যাদা সম্পন্ন নয়। বরং তা বান্দার জন্য তার মালিকের অবশ্য অনুসরণীয় আইন, যার অনুসরণ না করার অর্থ বিদ্রোহ করা। যে ব্যক্তি তা অনুসরণ করে না সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব এবং দাসত্ব অস্বীকার করে।

এর পরে বলা হয়েছে, দীনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এ আইনই সেই আইন যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো নূহ, ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিমুস সালামকে এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে নির্দেশই দান করা হয়েছে। এ বাণী থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়। এক—আল্লাহ এ বিধানকে সরাসরি সব মানুষের কাছে পাঠাননি, বরং মাঝে মধ্যে যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন এক ব্যক্তিকে তাঁর রসূল মনোনীত করে

এ বিধান তার কাছে সোপর্দ করেছেন। দুই—প্রথম থেকেই এ বিধান এক ও অভিন্ন। এমন নয় যে, কোন জাতির জন্য কোন একটি দীন নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং অন্য সময় অপর এক জাতির জন্য তা থেকে ভিন্ন ও বিপরীত কোন দীন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে একাধিক দীন আসেনি। বরং যখনই এসেছে এই একটি মাত্র দীনই এসেছে। তিন—আল্লাহর আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব মানার সাথে সাথে যাদের মাধ্যমে এ বিধান পাঠানো হয়েছে তাদের রিসালাত মানা এবং যে অহীর দ্বারা এ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা মেনে নেয়া এ দীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবীও তাই। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বাসযোগ্য (Authentic) হওয়া সম্পর্কে ব্যক্তি নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ সে এই আনুগত্য করতেই পারে না।

অতপর বলা হয়েছে, এসব নবী-রসূলদেরকে দীনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এই বিধান দেয়ার সাথে তাগিদসহ এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিলো যে, أَقِيمُوا الدِّينَ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেন "দীনকে কায়েম করো" আর শাহ রফিউদ্দিন ও শাহ আবদুল কাদের অনুবাদ করেছেন, "দীনকে কায়েম রাখো" এই দু'টি অনুবাদই সঠিক। اقامت শব্দের অর্থ কায়েম করা ও কায়েম রাখা উভয়ই। নবী-রসূলগণ আলাইহিমুস সালাম এ দু'টি কাজ করতেই আদিষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, যেখানে এই দীন কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করা। আর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে তা কায়েম হবে কিংবা পূর্ব থেকেই কায়েম আছে সেখানে তা কায়েম রাখা। একথা সুস্পষ্ট যে কোন জিনিসকে কায়েম রাখার প্রশ্ন তখনই আসে যখন তা কায়েম থাকে। অন্যথায় প্রথমে তা কায়েম করতে হবে, তারপর তা যাতে কায়েম থাকে সে জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই পর্যায়ে আমাদের সামনে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। একটি হলো, দীন কায়েম করার অর্থ কি? অপরটি হলো, দীন অর্থই বা কি যা কায়েম করার এবং কায়েম রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে? এ দু'টি বিষয়ও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

কায়েম করা কথাটি যখন কোন বস্তুগত বা দেহধারী জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় উপবিষ্টকে উঠানো। যেমন কোন মানুষ বা জন্তুকে উঠানো। কিংবা পড়ে থাকা জিনিসকে উঠিয়ে দাঁড় করানো। যেমন বাঁশ বা কোন থাম তুলে দাঁড় করানো অথবা কোন জিনিসের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্র করে সমুন্নত করা। যেমন ঃ কোন খালি জায়গায় বিল্ডিং নির্মাণ করা। কিন্তু যা বস্তুগত জিনিস নয়, অবস্তুগত জিনিস তার জন্য যখন কায়েম করা শব্দটা ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ শুধু সেই জিনিসের প্রচার করাই নয়, বরং তা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করা, তার প্রচলন ঘটানো এবং কার্যত চালু করা। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি তার রাজত্ব কায়েম করেছে তখন তার অর্থ এ হয় না যে, সে তার রাজত্বের দিকে আহবান জানিয়েছে। বরং তার অর্থ হয়, সে দেশের লোকদেরকে নিজের অনুগত করে নিয়েছে এবং সরকারের সকল বিভাগে এমন সংগঠন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছে যে, দেশের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তার নির্দেশ অনুসারে চলতে শুরু করেছে। অনুরূপ যখন আমরা বলি, দেশে আদালত কায়েম আছে তখন তার অর্থ হয় ইনসাফ করার জন্য বিচারক নিয়োজিত আছেন। তিনি মোকদ্দমা সমূহের শুনানি করছেন এবং ফায়সালা দিচ্ছেন। একথার এ অর্থ কখনো হয় না যে, ন্যায়

বিচার ও ইনসাফের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা খুব ভালভাবে করা হচ্ছে এবং মানুষ তা সমর্থন করছে। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদে যখন নির্দেশ দেয়া হয়, নামায কায়েম করো তখন তার অর্থ কুরআন মজীদের দাওয়াত ও তাবলীগ নয়, বরং তার অর্থ হয় নামাযের সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে শুধু নিজে আদায় করা না বরং এমন ব্যবস্থা করা যেন ঈমানদারদের মধ্যে তা নিয়মিত প্রচলিত হয়। মসজিদের ব্যবস্থা থাকে, গুরুত্বের সাথে জুমআ ও জামা'য়াত ব্যবস্থা হয়, সময়মত আযান দেয়া হয়, ইমাম ও খতিব নির্দিষ্ট থাকে এবং মানুষের মধ্যে সময়মত মসজিদে আসা ও নামায আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। এই ব্যাখ্যার পরে একথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামদের যখন এই দীন কায়েম করার ও রাখার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তার অর্থ শুধু এতটুকুই ছিল না যে, তাঁরা নিজেরাই কেবল এ দীনের বিধান মেনে চলবেন এবং অন্যদের কাছে তার তাবলীগ বা প্রচার করবেন, যাতে মানুষ তার সত্যতা মেনে নেয়। বরং তার অর্থ এটাও যে মানুষ যখন তা মেনে নেবে তখন আরো অগ্রসর হয়ে তাদের মাঝে পুরো দীনের প্রচলন ঘটাবেন, যাতে সে অনুসারে কাজ আরম্ভ হতে এবং চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে দাওয়াত ও তাবলীগ এ কাজের অতি আবশ্যিক প্রাথমিক স্তর। এই স্তর ছাড়া দ্বিতীয় স্তর আসতেই পারে না। কিন্তু প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন এই নির্দেশের মধ্যে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো হয়নি, দীনকে কায়েম করা ও কায়েম রাখাকেই উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগ অবশ্যই এ উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। নবী-রসূলদের মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দাওয়াত ও তাবলীগ করো একথা বলা একেবারেই অবান্তর।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেখুন। কেউ কেউ দেখলেন, যে দীন কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সমানভাবে সমস্ত নবী-রসূলের দীন। কিন্তু তাদের সবার শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا "আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য স্বতন্ত্র শরীয়ত এবং একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি।" তাই তারা ধরে নিয়েছে যে, এ দীন অর্থ নিশ্চয়ই শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান নয়, এর অর্থ শুধু তাওহীদ, আখেরাত, কিতাব ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদাত করা। কিংবা বড় জোর তার মধ্যে শরীয়তের সেই সব বড় বড় নৈতিক নীতিমালাও অন্তর্ভুক্ত যা সমস্ত দীনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু এটি একটি অপরিপক্ক মত। শুধু বাহ্যিকভাবে দীনের ঐক্য ও শরীয়তসমূহের বিভিন্নতা দেখে এ মত পোষণ করা হয়েছে। এটি এমন একটি বিপজ্জনক মত যে যদি তা সংশোধন করা না হয় তাহলে তা অগ্রসর হয়ে দীন ও শরীয়তের মধ্যে এমন একটি পার্থক্যের সূচনা করবে যার মধ্যে জড়িয়ে সেন্ট পল শরীয়ত বিহীন দীনের মতবাদ পেশ করেছিলেন এবং সাইয়েদেনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতকে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করেছিলেন। কারণ, শরীয়ত যখন দীন থেকে স্বতন্ত্র একটি জিনিস আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু দীন কায়েমের জন্য, শরীয়ত কায়েমের জন্য নয় তখন মুসলমানরাও খৃষ্টানদের মত অবশ্যই শরীয়তকে গুরুত্বহীন ও তার প্রতিষ্ঠাকে সরাসরি উদ্দেশ্য মনে না করে উপেক্ষা করবে এবং দীনের শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়গুলো ও বড় বড় নৈতিক

নীতিসমূহ নিয়েই বসে থাকবে। এভাবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে دين এর অর্থ নিরূপণ করার পরিবর্তে কেনই বা আমরা আল্লাহর কিতাব থেকেই একথা জেনে নিচ্ছি না যে, যে দীন কায়েম করার নির্দেশ এখানে দান করা হয়েছে তার অর্থ কি শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং কতিপয় বড় বড় নৈতিক মূলনীতি না শরীয়তের অন্যান্য আদেশ নিষেধও? কুরআন মজীদ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি কুরআন মজীদে যেসব জিনিসকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোও আছে ঃ

এক ঃ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ – البينة : ٥

"তাদেরকে এ ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠ চিত্তে দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে এটাই সঠিক দীন।"

এ আয়াত থেকে জানা যায়, নামায এবং রোযা এই দীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ নামায ও রোযার আহকাম বিভিন্ন শরীয়তে বিভিন্ন রকম ছিল। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বর্তমানের মত নামাযের এই একই নিয়ম-কানুন, একই খুঁটি-নাটি বিষয়, একই সমান রাকআত, একই কিবলা, একই সময় এবং এই একই বিধি-বিধান ছিল একথা কেউ বলতে পারে না। অনুরূপ যাকাত সম্পর্কেও কেউ এ দাবী করতে পারে না যে, সমস্ত শরীয়তে বর্তমানের ন্যায় যাকাতের এই একই নিসাব, একই হার এবং আদায় ও বন্টনের এই একই বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু শরীয়তের ভিন্নতা সত্ত্বেও আল্লাহ এ দুটি জিনিসকে দীনের মধ্যে গণ্য করেছেন।

দুই ঃ.... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ .... ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ – المائده : ٣

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত জন্তু, দমবন্ধ হয়ে, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, ওপর থেকে পড়ে কিংবা ধাক্কা খেয়ে মরা জন্তু অথবা যে জন্তুকে কোন হিংস্র প্রাণী ক্ষতবিক্ষত করেছে কিন্তু তাকে তোমরা জীবিত পেয়ে যবেহ করেছো অথবা যে জন্তুকে কোন আস্তানায় যবেহ করা হয়েছে। তাছাড়া লটারীর মাধ্যমে নিজের ভাগ্য সম্পর্কে অবহিত হতে চাওয়াকেও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এসবই গুনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দীন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তাই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম।"

এ থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের এসব হুকুম আহকামও দীনের মধ্যে শামিল।

তিন ঃ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ – (التوبة : ٢٩)

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দীনকে নিজের দীন হিসেবে গ্রহণ করে না।"

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব আদেশ–নিষেধ দিয়েছেন তা মানা ও তার আনুগত্য করাও দীন।

চার : اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ – النور : ٢

"ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কে একশটি করে বেত্রাঘাত করো। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করো তাহলে দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি মায়া–মমতা ও আবেগ যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।"

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ – يوسف : ٧٦

"বাদশার দীন অনুসারে ইউসুফ তার ভাইকে পাকড়াও করতে পারতো না।"

এ থেকে জানা গেলো, ফৌজদারী আইনসমূহও দীনের মধ্যে শামিল। ব্যক্তি যদি আল্লাহর দেয়া ফৌজদারী আইন অনুসারে চলে তাহলে সে আল্লাহর দীনের অনুসারী আর যদি বাদশার দীন অনুসারে চলে তাহলে বাদশাহর দীনের অনুসারী।

এ চারটি উদাহরণই এমন যেখানে শরীয়তের আদেশ–নিষেধ ও বিধি–বিধানকে সুস্পষ্ট ভাষায় দীন বলা হয়েছে। কিন্তু গভীর মনোযোগ সহকারে দেখলে বুঝা যায়, আরো যেসব গোনাহর কারণে আল্লাহ জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন (যেমন ব্যভিচার, সুদখোরী, মু'মিন বান্দাকে হত্যা, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ, অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ নেয়া ইত্যাদি) যেসব অপরাধকে আল্লাহর শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন : লূতের কওমের মত পাপাচার এবং পারস্পরিক লেনদেনে শু'আইব আলাইহিস সালামের কওমের মত আচরণ) তার পথ রুদ্ধ করার কাজও অবশ্যই দীন হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। কারণ, দীন যদি জাহান্নাম ও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য না এসে থাকে তাহলে আর কিসের জন্য এসেছে। অনুরূপ শরীয়তের যেসব আদেশ–নিষেধ লংঘনকে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসের কারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই সব আদেশ–নিষেধ ও দীনের অংশ হওয়া উচিত। যেমন উত্তরাধিকারের বিধি–বিধান বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে :

وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ – النساء : ١٤

"যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং আল্লাহর সীমাসমূহ লংঘন করবে আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।"

অনুরূপ আল্লাহ যেসব জিনিসের হারাম হওয়ার কথা কঠোর ভাষায় অকাট্যভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন : মা, বোন ও মেয়ের সাথে বিয়ে, মদ্যপান, চুরি, জুয়া এবং মিথ্যা

সাক্ষ্যদান। এসব জিনিসের হারাম হওয়ার নির্দেশকে যদি "ইকামাতে দীন" বা দীন প্রতিষ্ঠার মধ্যে গণ্য করা না হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ কিছু অপ্রয়োজনীয় আদেশ–নিষেধও দিয়েছেন যার বাস্তবায়ন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপ আল্লাহ যেসব কাজ ফরয করেছেন, যেমন ঃ রোযা ও হজ্জ—তাও দীন প্রতিষ্ঠার পর্যায় থেকে এই অজুহাতে বাদ দেয়া যায় না যে, রমযানের ৩০ রোযা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে ছিল না এবং কা'বায় হজ্জ করা কেবল সেই শরীয়তেই ছিল যা ইবরাহীমের (আ) বংশধারার ইসমাঈলী শাখাকে দেয়া হয়েছিলো।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির কারণ হলো, ভিন্ন উদ্দেশ্যে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরীয়ত ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি) আয়াতের এ অর্থ করা যে, যেহেতু প্রত্যেক উম্মতের জন্য শরীয়ত ছিল ভিন্ন কিন্তু কায়েম করতে বলা হয়েছে দীনকে যা সমানভাবে সব নবী–রসূলের দীন ছিল, তাই দীন কায়েমের নির্দেশের মধ্যে শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ এ আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সূরা মায়েদার যে স্থানে এ আয়াতটি আছে তার পূর্বাপর অর্থাৎ ৪১ আয়াত থেকে ৫০ আয়াত পর্যন্ত যদি কেউ মনযোগ সহকারে পাঠ করে তাহলে সে জানতে পারবে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ যে নবীর উম্মতকে যে শরীয়ত দিয়েছিলেন সেটিই ছিল তাদের জন্য দীন এবং সেই নবীর নবুওয়াত কালে সেটিই কায়েম করা কাম্য ও উদ্দেশ্য ছিল। এখন যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের যুগ, তাই উম্মতে মুহাম্মাদীকে যে শরীয়ত দান করা হয়েছে এ যুগের জন্য সেটিই দীন এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করাই দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। এরপর থাকে ঐ সব শরীয়তের পরস্পর ভিন্নতা। এ ভিন্নতার তাৎপর্য এ নয় যে, আল্লাহর প্রেরিত শরীয়তসমূহ পরস্পর বিরোধী ছিল। বরং এর সঠিক তাৎপর্য হলো, অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ঐ সব শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য ছিল। উদাহরণ স্বরূপ নামায ও রোযার কথাই ধরুন। সকল শরীয়তেই নামায কায়েম ফরয ছিল কিন্তু সব শরীয়তের কিবলা এক ছিল না। তাছাড়া নামাযের সময়, রাকআতের সংখ্যা এবং বিভিন্ন অংশে কিছুটা পার্থক্য ছিল। অনুরূপ রোযা সব শরীয়তেই ফরয ছিল। কিন্তু রমযানের ৩০ রোযা অন্যান্য শরীয়তে ছিল না। এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক নয় যে, নামায ও রোযা 'ইকামাতে দীন' বা দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামায পড়া এবং নির্দিষ্ট কোন সময়ে রোযা রাখা ইকামতে দীনের নির্দেশ বহির্ভূত। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য তৎকালীন শরীয়তে নামায ও রোযা আদায়ের জন্য যে নিয়ম–পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিলো সেই সময়ে সেই পদ্ধতি অনুসারে নামায পড়া ও রোযা রাখাই ছিল দীন কায়েম করা। বর্তমানেও এসব ইবাদতের জন্য শরীয়তে মুহাম্মাদীতে যে নিয়ম–পদ্ধতি দেয়া হয়েছে সে মোতাবেক এসব ইবাদত বন্দেগী করা 'ইকামাতে দীন'। এ দু'টি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে শরীয়তের অন্যসব আদেশ–নিষেধও বিচার করুন।

যে ব্যক্তি চোখ খুলে কুরআন মজীদ পড়বে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, এ গ্রন্থ তার অনুসারীদেরকে কুফরী ও কাফেরদের আজ্ঞাধীন ধরে নিয়ে বিজিতের অবস্থানে থেকে ধর্মীয় জীবন যাপন করার কর্মসূচী দিচ্ছে না, বরং প্রকাশ্যে নিজের শাসন ও কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, চিন্তাগত, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত ও রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জীবনপাত করার জন্য অনুসারীদের কাছে দাবী করছে এবং তাদেরকে মানব জীবনের সংস্কার ও সংশোধনের এমন একটি কর্মসূচী দিচ্ছে যার একটা বৃহদাংশ কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যদি সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ঈমানদারদের হাতে থাকে। এ কিতাব তার নাযিল করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ

–النساء : ١٠٥

"হে নবী, আমি ন্যায় ও সত্যসহ তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ তোমাকে যে আলো দেখিয়েছেন তার সাহায্যে তুমি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করো।"

এই কিতাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের যে নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে সে জন্য তা সুস্পষ্টভাবে এমন একটি সরকারের ধারণা পেশ করেছে যে, একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে যাকাত আদায় করে হকদারদের কাছে পৌছানোর দায়িত্ব নেবে (আত তাওবা ৬০ ও ১০৩ আয়াত)। এই কিতাবে সুদ বন্ধ করার যে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সুদখোরী চালু রাখার কাজে তৎপর লোকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। (আল বাকারা ২৭৫–২৭৯ আয়াত) তা কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যখন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ঈমানদারদের হাতে থাকবে। এই কিতাবে হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণের নির্দেশ (আল বাকারা ১৭৮ আয়াত), চুরির জন্য হাত কাটার নির্দেশ (আল মায়েদা ৩৮ আয়াত) এবং ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের জন্য হদ জারী করার নির্দেশ একথা ধরে নিয়ে দেয়া হয়নি যে, এসব আদেশ মান্যকারীদেরকে কাফেরদের পুলিশ ও বিচারালয়ের অধীন থাকতে হবে। এই কিতাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ (আল বাকারা–১৯০–২১৬ আয়াত) একথা মনে করে দেয়া হয়নি যে, এ দীনের অনুসারীরা কাফের সরকারের বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করে এ নির্দেশ পালন করবে। এ কিতাবে আহলে কিতাবদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ (আত তাওবা ২৯ আয়াত) একথা ধরে নিয়ে দেয়া হয়নি যে, মুসলমানরা কাফেরদের অধীন থেকে তাদের থেকে জিযিয়া আদায় করে এবং তাদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে। এ ব্যাপারটি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে স্পষ্টতই দেখতে পারেন, প্রথম থেকেই যে পরিকল্পনা ছিল তা ছিলো দীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব স্থাপন, কুফরী সরকারের অধীনে দীন ও দীনের অনুসারীদের জিম্মি হয়ে থাকা নয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বানী–ইসরাঈল, আয়াত ৭৬ ও ৮০; সূরা কাসাস, আয়াত ৮৫–৮৬; সূরা রূম, আয়াত ১ থেকে ৬; সূরা আস সাফফাত, আয়াত ১৭১ থেকে ১৭৯, (টীকা ৯৩–৯৪) এবং সূরা সোয়াদ, ভূমিকা ও ১১ আয়াত ১২ টীকা সহ।

ব্যাখ্যার এই ভ্রান্তি যে জিনিসটির সাথে সবচেয়ে বেশী সাংঘর্ষিক তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বিরাট কাজ। যা তিনি ২৩ বছরের রিসালাত যুগে সমাধা করেছেন। তিনি তাবলীগ ও তলোয়ার উভয়টির সাহায্যেই যে গোটা আরবকে

বশীভূত করেছিলেন এবং বিস্তারিত শরীয়ত বা বিধি-বিধানসহ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আদর্শ কায়েম করেছিলেন যা আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড, সামাজিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, রাজনীতি ও ন্যায় বিচার এবং যুদ্ধ ও সন্ধিসহ জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত ছিল তা কেনা জানে? এ আয়াত অনুসারে নবী (সা)সহ সমস্ত নবী-রসূলকে ইকামাতে দীনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো নবীর (সা) এসব কাজকে যদি তার ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা না হয় তাহলে তার কেবল দু'টি অর্থই হতে পারে। হয় নবীর (সা) বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে (মা'আযাল্লাহ) যে, তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন শুধু ঈমান ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত বড় বড় মূলনীতিসমূহের তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য কিন্তু তা লংঘন করে তিনি নিজের পক্ষ থেকেই একটি সরকার কায়েম করেছিলেন, যা অন্যসব নবী-রসূলদের শরীয়ত-সমূহের সাধারণ নীতিমালা থেকে ভিন্নও ছিল অতিরিক্তও ছিল। নয়তো আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে যে, তিনি সূরা শূরায় উপরোক্ত ঘোষণা দেয়ার পর নিজেই তাঁর কথা থেকে সরে পড়েছেন এবং নিজের নবীর নিকট থেকে ঐ সূরায় ঘোষিত "ইকামাতে দীনের" চেয়ে কিছুটা বেশী এবং ভিন্ন ধরনের কাজই শুধু নেননি, বরং উক্ত কাজকে পূর্ণতা লাভের পর, নিজের প্রথম ঘোষণার পরিপন্থী দ্বিতীয় এই ঘোষণাটিও দিয়েছেন যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম) নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। এ দুটি অবস্থা ছাড়া তৃতীয় এমন কোন অবস্থা যদি থাকে যে ক্ষেত্রে ইকামাতে দীনের এই ব্যাখ্যাও বহাল থাকে এবং আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও না আসে তাহলে আমরা অবশ্যই তা জানতে চাইবো।

দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ এ আয়াতে সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ "দীনে বিভেদ সৃষ্টি করো না" কিংবা "তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না।" দীনে বিভেদের অর্থ ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন অভিনব বিষয় সৃষ্টি করা এবং তা মানা বা না মানার ওপর কুফর ও ঈমান নির্ভর করে বলে পীড়াপীড়ি করা এবং মান্যকারীদের নিয়ে অমান্যকারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, অথচ দীনের মধ্যে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই অভিনব বিষয়টি কয়েক ধরনের হতে পারে। দীনের মধ্যে যে জিনিস নেই তা এনে শামিল করা হতে পারে। দীনের অকাট্য উক্তিসমূহের বিকৃত প্রায় ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে অদ্ভুত আকীদা-বিশ্বাস এবং অভিনব আচার-অনুষ্ঠান আবিষ্কার করা হতে পারে। আবার দীনের উক্তি ও বক্তব্যসমূহ রদবদল করে তা বিকৃত করা, যেমন যা গুরুত্বপূর্ণ তাকে গুরুত্বহীন বানিয়ে দেয়া এবং যা একেবারেই মোবাহ পর্যায়ভুক্ত তাকে ফরয ও ওয়াজিব এমনকি আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বানিয়ে দেয়া। এ ধরনের আচরণের কারণেই নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামদের উম্মতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অতপর এসব ছোট ছোট দলের অনুসৃত পথই ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে যার অনুসারীদের মধ্যে বর্তমানে এই ধারণাটুকু পর্যন্তও বর্তমান নেই যে, এক সময় তাদের মূল ছিল একই। দীনের আদেশ-নিষেধ বুঝার এবং অকাট্য উক্তিসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে মাসয়ালা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর কিতাবের ভাষার মধ্যে আভিধানিক, বাগধারা ও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যার অবকাশ আছে সেই বৈধ ও যুক্তিসংগত মতভেদের সাথে এই বিভেদের কোন সম্পর্ক নেই

وَمَا تَفَرَّقُوٓا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

মানুষের কাছে যখন জ্ঞান এসে গিয়েছিল তারপরই তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে।[২২] আর তা হওয়ার কারণ তারা একে অপরের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিলো।[২৩] একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখা হবে একথা যদি তোমার রব পূর্বেই ঘোষণা না করতেন তাহলে তাদের বিবাদের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হতো।[২৪] প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, পূর্ববর্তীদের পরে যাদের কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তারা সে ব্যাপারে বড় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে।[২৫]

যেহেতু এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই হে মুহাম্মাদ এখন তুমি সেই দীনের দিকেই আহবান জানাও এবং যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো সেভাবে দৃঢ়তার সাথে তা আঁকড়ে ধরো এবং এসব লোকের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না।[২৬] এদের বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার ওপর ঈমান এনেছি।[২৭] আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি।[২৮] আল্লাহই আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব তিনিই। আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য।[২৯] আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই।[৩০] একদিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁর কাছেই সবাইকে যেতে হবে।"

এই বিষয় সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৩, টীকা ২৩০; সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯, টীকা ১৬ ও ১৭, আয়াত ৫১, টীকা ৪৮; সূরা আন নিসা, আয়াত ১৭১, টীকা ২১১ থেকে ২১৬; আল মায়েদা, আয়াত ৭৭, টীকা ১০১, আল আনআম, আয়াত ১৫৯, টীকা ১৪১; সূরা আন নাহল, আয়াত ১১৮ থেকে ১২৪, টীকা ১১৭ থেকে ১২১; সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৯২–৯৩, টীকা ৯১, আল হাজ্জ, আয়াত ৬৭–৬৯, টীকা ১১৬, ১১৭; আল মু'মিনুন, আয়াত ৫১ থেকে ৫৬, টীকা ৪৫ থেকে ৪৯; সূরা আল কাসাস, আয়াত ৫৩ ও ৫৪, টীকা ৭৩; সূরা আর রূম, আয়াত ৩২ থেকে ৩৫, টীকা ৫১ থেকে ৫৪)।

২১. ইতিপূর্বে ৮ ও ৯ আয়াতে যা বলা হয়েছে এবং ১১ টীকায় আমরা তার যে ব্যাখ্যা করেছি এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এখানে একথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা এসব লোকদেরকে দীনের সুস্পষ্ট রাজপথ দেখিয়ে দিচ্ছো আর এ নির্বোধরা এই নিয়ামতকে মূল্য দেয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে। কিন্তু এদেরই মধ্যে এদেরই কওমের এমন সব লোক আছে যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসছে এবং আল্লাহও বেছে বেছে তাদেরকে নিজের দিকে নিয়ে আসছেন। কারা এ নিয়ামত লাভ করে এবং কারা এর প্রতি খাপ্পা হয় তা নিজ নিজ ভাগ্যের ব্যাপার। তবে আল্লাহ অন্ধভাবে কোন কিছু বন্টন করেন না। যে তাঁর দিকে অগ্রসর হয় তিনি কেবল তাকেই নিজের দিকে টানেন। দূরে পলায়নপর লোকদের পেছনে দৌড়ানো আল্লাহর কাজ নয়।

২২. অর্থাৎ বিভেদের কারণ এ ছিল না যে, আল্লাহ নবী–রসূল পাঠাননি এবং কিতাবও নাযিল করেননি, তাই সঠিক পথ না জানার কারণে মানুষ নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম, চিন্তা গোষ্ঠী ও জীবন আদর্শ আবিষ্কার করে নিয়েছে। বরং তাদের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান আসার পর। তাই সে জন্য আল্লাহ দায়ী নন, বরং সেই সব লোক নিজেরাই দায়ী যারা দীনের সুস্পষ্ট নীতিমালা এবং শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধি–নিষেধ থেকে দূরে সরে গিয়ে নতুন নতুন ধর্ম ও পথ বানিয়ে নিয়েছে।

২৩. অর্থাৎ কোন প্রকার সদিচ্ছা এই মতভেদ সৃষ্টির চালিকা শক্তি ছিল না। এটা ছিল তোমাদের অভিনব ধারণা প্রকাশের আকাংখা। নিজের নাম ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা, পারস্পরিক জিদ ও একগুঁয়েমি, একে অপরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা এবং সম্পদ ও মর্যাদা অর্জন প্রচেষ্টার ফল। ধূর্ত ও উচ্চাভিলাসী লোকগুলো দেখলো, আল্লাহর বান্দারা যদি সোজাসুজি আল্লাহর দীন অনুসরণ করতে থাকে তাহলে একজনই মাত্র খোদা হবেন মানুষ যার সামনে মাথা নত করবে, একজন রসূল হবেন মানুষ নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে যাকে মেনে চলবে, একখানা কিতাব থাকবে যেখান থেকে মানুষ পথনির্দেশনা লাভ করবে এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট আকীদা–বিশ্বাস ও নির্ভেজাল বিধান থাকবে মানুষ যা অনুসরণ করতে থাকবে। এই ব্যবস্থায় তাদের নিজেদের জন্য কোন বিশেষ মর্যাদা থাকতে পারে না যে কারণে তাদের পৌরহিত্য চলবে, লোকজন তাদের পাশে ভিড় জমাবে তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং পকেট ও শূন্য করবে। এটাই সেই মূল কারণ যা নতুন নতুন আকীদা ও দর্শন, নতুন নতুন ইবাদত–পদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং নতুন নতুন জীবনাদর্শ উদ্ভাবনের উৎসাহ যুগিয়েছে এবং আল্লাহর বান্দাদের একটি বড় অংশকে দীনের সুস্পষ্ট রাজপথ থেকে সরিয়ে বিভিন্ন পথে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।

তারপর এ বিক্ষিপ্ততা এসব দল-উপদলের পারস্পরিক বিতর্ক ও বিবাদ এবং ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কলহের কারণে চরম তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। এমনকি এ থেকে এমন রক্তপাতও ঘটেছে যে জন্য মানবেতিহাস রক্ত রঞ্জিত হয়ে চলেছে।

২৪. অর্থাৎ যারা গোমরাহী উদ্ভাবন করার এবং জেনে বুঝে তা অনুসরণ করার অপরাধে অপরাধী ছিল তাদেরকে দুনিয়াতেই আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হতো এবং শুধু সঠিক পথ অনুসরণকারীদের বাঁচিয়ে রাখা হতো যার মাধ্যমে কে ন্যায় ও সত্যের অনুসারী আর কে বাতিলের অনুসারী তা সুস্পষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ এই চূড়ান্ত ফায়সালা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য মুলতবী করে রেখেছেন। কারণ, পৃথিবীতে এ ফায়সালা করে দেয়ার পর মানব জাতির পরীক্ষা অর্থহীন হয়ে যেতো।

২৫. অর্থাৎ প্রত্যেক নবী এবং তাঁর নিকট অনুসারীদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর কিতাব পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌছলে তারা দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থার সাথে তা গ্রহণ করেনি, বরং তারা সে সম্পর্কে বড় সন্দেহ সংশয় এবং মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে। তাদের এ পরিস্থিতির শিকার হওয়ার অনেকগুলো কারণ ছিল। তাওরাত ও ইনজীলে ঐ সব পরিস্থিতি সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা অতি সহজেই সেই সব কারণ অনুধাবন করতে পারি। পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকেরা এ দুটি গ্রন্থকে তার মূল অবস্থায় মূল রচনাশৈলী ও ভাষায় সংরক্ষিত করে পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের কাছে পৌছায়নি। তার মধ্যে আল্লাহর বাণীর সাথে ব্যাখ্যা, ইতিহাস এবং জনশ্রুতিমূলক ঐতিহ্য ও ফিকাহবিদদের উদ্ভাবিত খুঁটিনাটি বিষয়সমূহের আকারে মানুষের কথাও মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছে। এ দুটি গ্রন্থের অনুবাদের এত অধিক মাত্রায় প্রচলন করেছে যে, মূল গ্রন্থ হারিয়ে গিয়েছে এবং কেবল তার অনুবাদই টিকে আছে। এর ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহকেও এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে যে, এখন আর কেউই পুরো নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারে না তার কাছে যে কিতাব আছে পৃথিবীবাসী সেটিই হযরত মূসা বা হযরত ঈসার মাধ্যমে লাভ করেছিলো। তাছাড়া মাঝে মধ্যে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতরা ধর্ম, অধিবিদ্যা, দর্শন, আইন, পদার্থবিদ্যা, মনস্তত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের এমন সব আলোচনা করেছেন এবং চিন্তাদর্শ গড়ে তুলেছেন যার গোলকধাঁধায় পড়ে মানুষের জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়েছে যে, আঁকাবাঁকা এসব পথের মধ্যে ন্যায় ও সত্যের রাজপথ কোনটি। আল্লাহর কিতাব যেহেতু মূল ও নির্ভরযোগ্য অবস্থায় বর্তমান ছিল না তাই মানুষ নির্ভরযোগ্য এমন কোন প্রমাণের স্মরণাপন্ন হতেও পারতো না যা বাতিল থেকে হককে আলাদা করার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে পারতো।

২৬. অর্থাৎ তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই দীনের মধ্যে কোন রদবদল ও হ্রাস-বৃদ্ধি করবে না। "কিছু নাও এবং কিছু দাও" এই নীতির ভিত্তিতে এই পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে কোন আপোষ করো না। শুধু কোন না কোন ভাবে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে এসে যাক, এ লোভের বশবর্তী হয়ে এদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি এবং জাহেলী আচার-আচরণের জন্য দীনের মধ্যে কোন অবকাশ সৃষ্টি করো না। আল্লাহ তাঁর দীনকে যেভাবে নাযিল করেছেন কেউ মানতে চাইলে সেই খাঁটি ও মূল দীনকে যেন সরাসরি মেনে নেয়। অন্যথায় যে জাহান্নামে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় পড়ুক। মানুষের ইচ্ছানুসারে আল্লাহর দীনের

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ
عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ
بَعِيدٍ ﴿١٨﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

আল্লাহর আহবানে সাড়া দান করার পরে যারা (সাড়া দানকারীদের সাথে) আল্লাহর দীনের ব্যাপারে বিবাদ করে[৩১] আল্লাহর কাছে তাদের যুক্তি ও আপত্তি বাতিল। তাদের ওপর আল্লাহর গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। এই কিতাব ও মিযান যথাযথভাবে আল্লাহই নাযিল করেছেন।[৩২] তুমি তো জান না, চূড়ান্ত ফায়সালার সময় হয়তো অতি নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।[৩৩] যারা তা আসবে বলে বিশ্বাস করে না তারাই তার জন্য তাড়াহুড়া করে। কিন্তু যারা তা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে। তারা জানে, অবশ্যই তা আসবে। ভাল করে শুনে নাও, যারা সেই সময়ের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য বিতর্ক করে তারা গোমরাহীর মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।[৩৪] যাকে যা ইচ্ছা তাই দান করেন।[৩৫] তিনি মহা শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।[৩৬]

পরিবর্তন সাধন করা যায় না। মানুষ যদি নিজের কল্যাণ চায় তাহলে যেন নিজেকেই পরিবর্তন করে দীন অনুসারে গড়ে নেয়।

২৭. অন্য কথায় আমি সেই বিভেদ সৃষ্টিকারী লোকদের মত নই যারা আল্লাহর প্রেরিত কোন কোন কিতাব মানে আবার কোন কোনটি মানে না। আমি আল্লাহর প্রেরিত প্রতিটি কিতাবই মানি।

২৮. এই ব্যাপকার্থক আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হয় ঃ একটি অর্থ হচ্ছে, আমি এসব দলাদলি থেকে দূরে থেকে নিরপেক্ষ ন্যায় নিষ্ঠা অবলম্বনের জন্য আদিষ্ট। কোন দলের স্বার্থে এবং কোন দলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা আমার কাজ নয়। সব মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক। আর সে সম্পর্ক হচ্ছে ন্যায় বিচার ও ইনসাফের সম্পর্ক। যার যে

বিষয়টি ন্যায় ও সত্য সে যত দূরেরই হোক না কেন আমি তার সহযোগী। আর যার যে বিষয়টি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী সে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও আমি তার বিরোধী।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের সামনে যে সত্য পেশ করার জন্য আদিষ্ট তাতে কারো জন্য কোন বৈষম্য নেই, বরং তা সবার জন্য সমান। তাতে নিজের ও পরের, বড়র ও ছোটর, গরীবের ও ধনীর, উচ্চের ও নীচের ভিন্ন ভিন্ন সত্য নেই। যা সত্য তা সবার জন্য সত্য। যা গোনাহ তা সবার জন্য গোনাহ। যা হারাম তা সবার জন্য হারাম এবং যা অপরাধ তা সবার জন্য অপরাধ। এই নির্ভেজাল বিধানে আমার নিজের জন্যও কোন ব্যতিক্রম নেই।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট। মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা এবং তোমাদের জীবনে ও তোমাদের সমাজে যে ভারসাম্যহীনতা ও বে-ইনসাফী রয়েছে তার ধ্বংস সাধনের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে।

এ তিনটি অর্থ ছাড়া এ বাক্যাংশের আরো একটি অর্থ আছে যা পবিত্র মক্কায় প্রকাশ পায়নি কিন্তু হিজরতের পরে তা প্রকাশ পায়। সেটি হচ্ছে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত বিচারক। তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করা আমার দায়িত্ব।

২৯. আমাদের প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী এবং জবাবদিহিকারী। তোমরা নেক কাজ করলে তার সুফল আমি ভোগ করবো না, তোমরাই তা ভোগ করবে। অনুরূপ আমি খারাপ কাজ করলে সে জন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, আমাকেই তার পরিণাম ভোগ করতে হবে। একথাটিই ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ১৩৯ আয়াত, সূরা ইউনুসের ৪১ আয়াত, সূরা হূদের ৩৫ আয়াত এবং সূরা কাসাসের ৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, টীকা ১৩৯, সূরা ইউনুস টীকা ৪৯; সূরা হূদ, টীকা-৩৯; সূরা আল কাসাস, আয়াত ৫৫, টীকা ৭৯।

৩০. অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত দলীল-প্রমাণ দিয়ে কথা বুঝানোর যে দায়িত্ব আমার ছিল তা আমি পালন করেছি। এখন অযথা ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কি? তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করলেও আমি তা করতে প্রস্তুত নই।

৩১. সেই সময় প্রতিদিনই মক্কায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিলো এখানে সেই পরিস্থিতির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। লোকেরা কারো সম্পর্কে যখনই জানতে পারতো যে সে মুসলমান হয়েছে তখনই মরিয়া হয়ে তার পেছনে লেগে যেতো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাকে কোনঠাসা করে রাখতো। না বাড়ীতে তাকে আরামে থাকতে দেয়া হতো, না মহল্লায় না জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে। সে যেখানেই যেতো সেখানেই অশেষ ও বিরামহীন এক বিতর্ক শুরু হতো। এর উদ্দেশ্য হতো, জাহেলিয়াত বর্জন করে যে ব্যক্তি তার গণ্ডীর বাইরে বের হয়ে গেছে সে যে কোনভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ছেড়ে আবার সেদিকে ফিরে আসুক।

৩২. এখানে মীযান অর্থ আল্লাহর শরীয়ত, যা দাঁড়িপাল্লার মত ওজন করে ভুল ও শুদ্ধ, হক ও বাতিল, জুলুম ও ন্যায়বিচার এবং সত্য ও অসত্যের পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। ওপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

যে আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র চায় আমি তার কৃষিক্ষেত্র বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার কৃষিক্ষেত্র চায় তাকে দুনিয়ার অংশ থেকেই দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।[৩৭]

এসব লোক কি আল্লাহর এমন কোন শরীকে বিশ্বাস করে যে এদের জন্য দীনের মত এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি?[৩৮] *যদি ফায়সালার বিষয়টি পূর্বেই মীমাংসিত হয়ে না থাকতো তাহলে তাদের বিবাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া হতো।*[৩৯] *এ জালেমদের জন্য নিশ্চিত কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। তোমরা দেখতে পাবে, সে সময় এসব জালেম তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণামের আশংকা করতে থাকবে। আর সে পরিণাম তাদের জন্য আসবেই। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতের বাগ–বাগিচার মধ্যে অবস্থান করবে। তারা যা–ই চাইবে তা–ই তাদের রবের কাছে পাবে। এটাই বড় মেহেরবানী।*

اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ (তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র কিতাব সহকারে সেই 'মিযান' এসে গেছে যার সাহায্যে এই ইনসাফ কায়েম করা যাবে।

৩৩. অর্থাৎ যার সংশোধন হওয়ার সে যেন অবিলম্বে সংশোধিত হয়ে যায়। চূড়ান্ত ফায়সালার সময় দূরে মনে করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত নয়। একটি নিশ্বাস সম্পর্কেও

কেউ নিশ্চয়তার সাথে একথা বলতে পারে না যে, তার পরে শ্বাস গ্রহণের সুযোগ তার অবশ্যই হবে। প্রতিবার শ্বাস গ্রহণই শেষবারের মত শ্বাস গ্রহণ হতে পারে।

৩৪. মূল আয়াতে لَطِيْفٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার সঠিক ও পূরা অর্থ "দয়ালু" শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায় না। এ শব্দটির মধ্যে দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ, মায়া ও বদান্যতা প্রবণ। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শিতার সাথে তার এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন যেখানে কারো দৃষ্টি যায় না। সে প্রয়োজনগুলো তিনি এমনভাবে পূরণ করেন যে বান্দা নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না কে কখন তার কোন্ প্রয়োজন পূরণ করেছে। তাছাড়া এখানে বান্দা অর্থ শুধু ঈমানদারেরাই নয়, বরং সমস্ত বান্দা। আল্লাহর এই দয়া ও মেহেরবানী তাঁর সব বান্দার জন্য সমান।

৩৫. অর্থাৎ তাঁর এই নির্বিশেষ মেহেরবানীর দাবি এ নয় যে, সব বান্দাকেই সব কিছু সমানভাবে দেয়া হবে। যদিও সবাইকে তিনি তাঁর নিজের ভাণ্ডার থেকেই দিচ্ছেন। কিন্তু সেই দান একই প্রকৃতির নয়। একজনকে দিয়েছেন একটি জিনিস আরেকজনকে অন্য একটি জিনিস। একজনকে একটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকেন অপর একজনকে অন্য কোন জিনিস অঢেল দান করেছেন।

৩৬. অর্থাৎ তাঁর দান ও পুরস্কারের এই ব্যবস্থা নিজের শক্তিতেই চলছে। কারো ক্ষমতা নেই তা পরিবর্তন করতে পারে বা জোরপূর্বক তাঁর নিকট থেকে কিছু নিতে পারে কিংবা কাউকে দান করার ব্যাপারে তাকে বিরত রাখতে পারে।

৩৭. পূর্ববর্তী আয়াতে দু'টি সত্য তুলে ধরা হয়েছে, যা আমরা সবসময় সর্বত্র দেখতে পাই। একটি হচ্ছে, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী তাঁর সব বান্দার জন্য সমান। অপরটি হচ্ছে, তাঁর দান ও রিযিক পৌছানোর বন্দোবস্ত সবার জন্য সমান নয়, বরং তার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে এ আয়াতে বলা হচ্ছে, তাঁর দয়া ও মেহেরবানী এবং রিযিক পৌছানোর ব্যবস্থায় ছোটখাট পার্থক্য অসংখ্য। কিন্তু একটি অনেক বড় মৌলিক পার্থক্যও আছে। সেটি হচ্ছে, আখেরাতের আকাংখী ব্যক্তির জন্য এক ধরনের রিযিক এবং দুনিয়ার আকাংখী ব্যক্তির জন্য অন্য ধরনের রিযিক।

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য যা এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বলা হয়েছে। এটিকে বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ তা প্রত্যেক মানুষকে তার ভূমিকা নির্ধারণে সাহায্য করে। যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্য চেষ্টা–সাধনা ও কাজ করে এ আয়াতে তাদেরকে এমন কৃষকের সাথে তুলনা করা হয়েছে যারা ভূমি প্রস্তুত করা থেকে ফসল প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত উপর্যুপরি ঘাম ঝরায় এবং প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায়। সে মাঠে যে বীজ বপন করছে তার ফসল আহরণ করে যেন উপকৃত হতে পারে সে জন্য সে এত সব পরিশ্রম করে কিন্তু নিয়ত ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য এবং বেশীর ভাগই কর্মপদ্ধতির পার্থক্য ও আখেরাতের ফসল বপনকারী কৃষক এবং পার্থিব ফসল বপনকারী কৃষকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে তাই আল্লাহ উভয় পরিশ্রমের ফলাফলও ভিন্ন রেখেছেন। অথচ এই পৃথিবীই উভয়ের কর্মক্ষেত্র।

আখেরাতের ফসল বপনকারী দুনিয়া লাভ করবে না আল্লাহ তা বলেননি। কম বা বেশী যাই হোক না কেন দুনিয়া তো সে পাবেই। কারণ এখানে আল্লাহর মেহেরবানী সবার জন্য সমান এবং তার মধ্যে তারও অংশ আছে। তাই ভালমন্দ সবাই এখানে রিযিক পাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তাকে দুনিয়া লাভের সুসংবাদ দান করেননি, বরং তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন এই বলে যে তার আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হবে। কেননা সে সেটিই চায় এবং সেখানকার পরিণামের চিন্তায় সে বিভোর। এই কৃষিক্ষেত্র বর্ধিত করার অনেকগুলো উপায় ও পন্থা হতে পারে। যেমন ঃ সে যতটা সদুদ্দেশ্য নিয়ে আখেরাতের জন্য নেক আমল করতে থাকবে তাকে তত বেশী নেক আমল করার সুযোগ দেয়া হবে এবং তার হৃদয়–মন নেক কাজের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। যখন সে পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য পবিত্র উপায় অবলম্বন করার সংকল্প করবে তখন তার জন্য পবিত্র উপায়–উপকরণের মধ্যে বরকত দান করা হবে। তার জন্য কল্যাণের সব দরজা বন্ধ হয়ে কেবল অকল্যাণের দরজাসমূহই খোলা থাকবে, আল্লাহ এ অবস্থা কখনো আসতে দেবেন না। তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা হলো তার এই পৃথিবীর সামান্য নেকীও আখেরাতে কমপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর বেশীর তো কোন সীমাই থাকবে না। আল্লাহ যার জন্য চাইবেন হাজার বা লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন।

এখন থাকে দুনিয়ার কৃষি বপনকারীর কথা। অর্থাৎ যে আখেরাত চায় না এবং দুনিয়ার জন্যই সব কিছু করে। আল্লাহ তাকে তার এই চেষ্টা–সাধনার দুটি ফলের কথা সুস্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিয়েছেন। এক, সে যত চেষ্টাই করুক না কেন দুনিয়া যতটা অর্জন করতে চায় তা সে পুরাপুরি পাবে না, বরং তার একটা অংশ মাত্র অর্থাৎ আল্লাহ তার জন্য যতটা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ততটাই পাবে। দুই, সে যা কিছু পাবে এই দুনিয়াতেই পাবে। আখেরাতের কল্যাণে তার কোন অংশ থাকবে না।

৩৮. একথা সুস্পষ্ট যে এ আয়াতে شُرَكَاءُ অর্থে সেই সব শরীক বুঝানো হয়নি মানুষ যাদের কাছে প্রার্থনা করে বা যাদেরকে নযর–নিয়াজ দেয় কিংবা যাদের সামনে পূজা অর্চনার অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা হয়। বরং নিশ্চিতভাবে সেই সব মানুষকে বুঝানো হয়েছে মানুষ যাদেরকে আদেশ দানের ক্ষেত্রে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে, যাদের শেখানো ধ্যান–ধারণা, আকীদা–বিশ্বাস, মতবাদ এবং দর্শনের প্রতি মানুষ বিশ্বাস পোষণ করে, যাদের দেয়া মূল্যবোধ মেনে চলে, যাদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডসমূহ গ্রহণ করে, যাদের রচিত আইন–কানুন। পন্থা ও বিধি–বিধানকে নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ইবাদতসমূহে, ব্যক্তি জীবনে, সমাজে, সভ্যতায়, কায়কারবার ও লেনদেনে, বিচারালয়সমূহে এবং নিজেদের রাজনীতি ও সরকার ব্যবস্থায় এমনভাবে গ্রহণ করে যেন এটাই সেই শরীয়ত যার অনুসরণ তাদের করা উচিত। এটা যেন বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর রচিত আইনের পরিপন্থী একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং তাঁর অনুমোদন (Sanction) ছাড়াই উদ্ভাবকরা উদ্ভাবন করেছে এবং মান্যকারীরা মেনে নিয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা এবং অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা যেমন শিরক এটাও ঠিক তেমনি শিরক। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ১–৭২, টীকা ১৭০, আয়াত ২৫৬, টীকা ২৮৬; আল ইমরান, আয়াত ৬৪ ও ৬৫, টীকা ৫৭ ও ৫৮, আয়াত ৭৫ থেকে ৭৭, টীকা ৬৪, ৬৫;

ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۲۳﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۴﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

এটাই সেই জিনিস যার সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই সব বান্দাদের দেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে। হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।[৪০] তবে আত্মীয়তার ভালবাসা অবশ্যই চাই।[৪১] যে কল্যাণ উপার্জন করবে আমি তার জন্য তার সেই কল্যাণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেব। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও নেক কাজের মর্যাদাদাতা।[৪২]

এ লোকেরা কি বলে, এই ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে অপবাদ তৈরী করেছে?[৪৩] আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার দিলের ওপর মোহর মেরে দিতেন।[৪৪] তিনি বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং নিজের আদেশে সত্যকে সত্য প্রমাণ করে দেখান।[৪৫] তিনি মনের গোপন বিষয়ও জানেন।[৪৬] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা আছে।[৪৭]

আন নিসা, আয়াত ৬০, টীকা ৯০; আল মায়েদা, আয়াত ১ ও ২ টীকাসহ, আয়াত ৮৭ ও ৮৮ টীকাসহ, আন'আম, আয়াত ১১৯ থেকে ১২১; টীকাসহ, আয়াত ১৩৬, ১৩৭ টীকাসহ; আত তাওবা, আয়াত ৩১ টীকাসহ; ইউনুস, আয়াত ৫৯, ৬০ টীকাসহ; ইবরাহীম, আয়াত ২২ টীকাসহ; সূরা আন নাহল, আয়াত ১১৩ থেকে ১১৫ টীকাসহ; আল কাহাফ, আয়াত ৫২ টীকাসহ; মারয়াম, আয়াত ৪২ টীকাসহ; আল–কাসাস, আয়াত ৬২, ৬৩ টীকাসহ; সাবা আয়াত ৪১ টীকা ৬৩, ইয়াসীন, আয়াত ৬০, টীকা ৫৩)।

৩৯. অর্থাৎ এটা আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন এক ধৃষ্টতা যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি যদি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য মুলতবী করা না হতো তাহলে আল্লাহর বান্দা হয়ে যারা আল্লাহর পৃথিবীতে নিজেদের রচিত 'দীন' চালু করেছে তাদের প্রত্যেকের ওপর আযাব

নাযিল করা হতো এবং তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হতো যারা আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করে অন্যদের রচিত দীন গ্রহণ করেছে।

৪০. 'এ কাজ' অর্থ যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানো এবং জান্নাতের সুসংবাদের উপযুক্ত বানানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

৪১. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হলো إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে قُرْبَىٰ র ভালবাসা অবশ্যই প্রত্যাশা করি। এই قُرْبَىٰ শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মধ্যে বেশ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

এক দল এ শব্দটিকে আত্মীয়তা (আত্মীয়তার বন্ধন) অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, "আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় চাই না। তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে বন্ধন আছে তোমরা (কুরাইশরা) অন্তত সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এতটুকু আমি অবশ্যই চাই। তোমাদের উচিত ছিল আমার কথা মেনে নেয়া। কিন্তু যদি তোমরা তা না মানো তাহলে গোটা আরবের মধ্যে সবার আগে তোমরাই আমার সাথে দুশমনী করতে বদ্ধপরিকর হবে তা অন্তত করো না।" এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা। ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জারীর, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে সা'দ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ বহু সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এ ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী, আবু মালেক, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম, দাহহাক, আতা ইবনে দীনার এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাসসির এ ব্যাখ্যাটাই বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় দলটি قُرْبَىٰ শব্দটিকে নৈকট্য বা নৈকট্য অর্জন অর্থে গ্রহণ করেন এবং আয়াতটির অর্থ করেছেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আমি তোমাদের কাছে এ কাজের জন্য আর কোন বিনিময় চাই না। অর্থাৎ তোমরা সংশোধিত হয়ে যাও। শুধু এটাই আমার পুরস্কার। এ ব্যাখ্যা হাসান বাসারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে এবং কাতাদা থেকেও এর সমর্থনে একটি মত বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তাবারানীর একটি বর্ণনায় ইবনে আব্বাসের সাথেও এ মতকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কুরআন মজীদেরও আরেক স্থানে বিষয়টি এ ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

(الفرقان : ٥٨)–

"এদের বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অনুসরণ করুক, আমার পারিশ্রমিক শুধু এটাই।"

তৃতীয় দলটি قُرْبَىٰ শব্দটিকে নিকট আত্মীয় (আত্মীয় স্বজন) অর্থে গ্রহণ করেন। তারা আয়াতের অর্থ করেন ঃ "তোমরা আমার আত্মীয় ও আপনজনদের ভালবাসবে এছাড়া আমার এ কাজের আর কোন পারিশ্রমিক আমি চাই না।" এই দলের কেউ আত্মীয়দের মধ্যে গোটা বনী আবদুল মুত্তালিবকে অন্তর্ভূক্ত করেন আবার কেউ কেউ একে শুধু হযরত

আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান–সন্ততি পর্যন্ত সীমিত রাখেন। এ ব্যাখ্যাটি সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের এবং 'আমর ইবনে শু'আইব থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আবার কোন কোন বর্ণনাতে একে ইবনে আব্বাস ও হযরত আলী ইবনে হুসাইনের (যয়নুল আবেদীন) সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু কারণে এ ব্যাখ্যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রথমত সন্তানের প্রশ্ন তো দূরের কথা মক্কায় যে সময় এ সূরা শূরা নাযিল হয় সে সময় হযরত আলী ও ফাতিমার বিয়ে পর্যন্ত হয়নি। বনী আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীরও সবাই আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহযোগিতা করছিলো না। বরং তাদের কেউ কেউ তাঁর প্রকাশ্য দুশমনদের সহযোগী ছিল। এ ক্ষেত্রে আবু লাহাবের শত্রুতার বিষয় তো সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয়ত, শুধু বনী আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় ছিল না। নবীর (সা) মহিয়ষী মা, তাঁর মহান বাপ এবং হযরত খাদীজার (রা) মাধ্যমে কুরাইশদের সকল পরিবারের সাথেই তাঁর আত্মীয়তা ছিল। সেই সব পরিবারে নবীর (সা) গুণী সাহাবা যেমন ছিলেন তেমনি ঘোরতর শত্রুও ছিল। তাই ঐ সব আত্মীয়দের মধ্যে থেকে তিনি কেবল বনী আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীকে নিজের ঘনিষ্ঠজন আখ্যায়িত করে এই ভালবাসার দাবীকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট রাখবেন তা নবীর (সা) জন্য কি করে সম্ভব ছিল? তৃতীয়ত যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, একজন নবী যে উচ্চাসনে দাঁড়িয়ে সুউচ্চ কন্ঠে আল্লাহর দিকে আহবান জানান সেই উচ্চাসন থেকে এ মহান কাজের জন্য তিনি এত নীচ পর্যায়ের পুরস্কার চাইবেন যে, তোমরা আমার আত্মীয়–স্বজনকে ভালবাসো, তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এটা এমনই নীচ পর্যায়ের ব্যাপার যে কোন সুস্থ–স্বাভাবিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁর নবীকে একথা শিখিয়ে থাকবেন আর নবী কুরাইশদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা বলে থাকবেন। কুরআন মজীদে নবী–রসূলদের যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাতে আমরা দেখি একের পর এক নবী এসে তাঁদের কওমকে বলছেন ঃ আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় প্রত্যাশা করি না। আমার পারিশ্রমিক বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর কাছে প্রাপ্য (ইউনুস ৭২, হূদ ২৯ ও ৫১, আশ–শুআরা ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪ ও ১৮০ আয়াত)। সূরা ইয়াসীনে নবীর সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ড বলা হয়েছে এই যে, তিনি দাওয়াতের ব্যাপারে নিস্বার্থ হন (আয়াত ২১)। কুরআন মজীদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বার বার একথা বলানো হয়েছে যে, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না (আল আনয়াম ৯০, ইউসুফ ১০৪, আল মু মিনুন ৭২, আল ফুরকান ৫৭, সাবা ৪৭, সোয়াদ ৮৬, আত তূর ৪০, আল কলম ৪৬ আয়াত)। এর পরে একথা বলার কি কোন সুযোগ থাকে যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান জানানোর যে কাজ করছি তার বিনিময়ে তোমরা আত্মীয় স্বজনকে ভালভাসো। তাছাড়া যখন আমরা দেখি, এ ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়নি বরং এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কাফেরদেরকে তখন তা আরো খাপছাড়া বলে মনে হয়। আগে থেকেই কাফেরদেরকে লক্ষ্য করেই গোটা বক্তব্য চলে আসছে এবং পরবর্তী বক্তব্যও তাদের লক্ষ্য করেই পেশ করা হয়েছে। বক্তব্যের এই ধারাবাহিকতার মধ্যে বিরোধীদের কাছে কোন রকম বিনিময় চাওয়ার প্রশ্ন কি করে আসতে পারে? বিনিময় চাওয়া যায় তাদের কাছে যাদের কাছে কোন ব্যক্তির তাদের জন্য সম্পাদিত কাজের কোন মূল্য থাকে। কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজের কি মূল্য দিচ্ছিলো যে, তিনি তাদের কাছে বলতেন,

আমি তোমাদের জন্য যে কাজ করেছি তার বিনিময়ে তোমরা আমার আত্মীয়–স্বজনদের ভালবাসবে? তারা তো উল্টা সেটাকে অপরাধ মনে করছিলো এবং সে জন্য তাঁকে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ ছিলো।

৪২. অর্থাৎ যারা জেনে বুঝে নাফরমানী করে সেই সব অপরাধীদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা হয় নেক কাজে সচেষ্ট বান্দাদের সাথে আল্লাহর আচরণ তেমন নয়। তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ হচ্ছে (১) তারা নিজের পক্ষ থেকে যতটা সৎ কর্মশীল হওয়ার চেষ্টা করে আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়েও বেশী সৎ কর্মশীল বানিয়ে দেন (২) তাদের কাজকর্মে যে ত্রুটি–বিচ্যুতি থেকে যায় অথবা সৎকর্মশীল হওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে গোনাহ সংঘটিত হয় আল্লাহ তা উপেক্ষা করেন এবং (৩) যে সামান্য পরিমাণ নেক কাজের পুঁজি তারা নিয়ে আসে সে জন্য আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদা দেন এবং অধিক পুরস্কার দান করেন।

৪৩. এই প্রশ্নবোধক বাক্যাংশে তীব্র তিরস্কার প্রচ্ছন্ন আছে, যার সারকথা হলো, হে নবী, এসব লোক কি এতই দুঃসাহসী ও নির্ভিক যে তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার মত ঘৃণিত অপবাদ আরোপ করতে আদৌ লজ্জা অনুভব করলো না? এরা তোমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে যে তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করছো?

৪৪. অর্থাৎ এত বড় মিথ্যা কেবল তারাই বলে যাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাকেও তাদের মধ্যে শামিল করে দেবেন। কিন্তু এটা তাঁর মেহেরবানী যে তিনি তোমাকে এই দল থেকে আলাদা করে রেখেছেন। এই জবাবের মাধ্যমে সেই সব লোকদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ অপবাদ আরোপ করছিলো। এর তাৎপর্য হচ্ছে : হে নবী, এরা তোমাকেও তাদের মত স্বভাবের মানুষ মনে করে নিয়েছে। এরা যেমন নিজ স্বার্থের জন্য বড় বড় মিথ্যা বলতে কুণ্ঠিত হয় না। তেমনি মনে করে নিয়েছে তুমিও অনুরূপ আপন স্বার্থ হাসিলের জন্য একটি মিথ্যা সাজিয়ে এনেছো। কিন্তু এটা আল্লাহরই মহেরবানী যে তিনি তাদের মত তোমার হৃদয়ে কোন মোহর লাগাননি।

৪৫. অর্থাৎ এটা আল্লাহর নিয়ম যে তিনি বাতিলকে কখনো স্থায়িত্ব দান করেন না এবং পরিশেষে ন্যায় ও সত্যকে ন্যায় ও সত্য হিসেবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। অতএব, হে নবী (সা), তুমি এসব মিথ্যা অপবাদের আদৌ পরোয়া করো না এবং নিজের কাজ করতে থাকো। এমন এক সময় আসবে যখন এসব মিথ্যা ধূলিকণার মত উড়ে যাবে। কিন্তু তুমি যা পেশ করছো তার ন্যায় ও সত্য হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৪৬. অর্থাৎ তিনি জানেন, তোমার বিরুদ্ধে এসব অপবাদ কেন আরোপ করা হচ্ছে এবং তোমাকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে চেষ্টা–সাধনা করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার পেছনে কি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাজ করছে।

৪৭. পূর্ববর্তী আয়াতের পর পরই তাওবার প্রতি উৎসাহ দান থেকে স্বতই এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, হে জালেমেরা সত্য নবীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে নিজেরাই নিজেদেরকে কেন আরো বেশী আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানিয়ে নিচ্ছো? এখনো যদি

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ
وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (২৬) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا
فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (২৭) وَهُوَ
الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ
الْحَمِيدُ (২৮) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن
دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (২৯)

তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের দোয়া কবুল করেন এবং নিজের দয়ায় তাদের আরো অধিক দেন। কাফেরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাদেরকে অঢেল রিযিক দান করতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহের তুফান সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি একটি হিসাব অনুসারে যতটা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।[৪৮] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি মানুষদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং রহমত বিস্তার করে দেন। তিনি প্রশংসার যোগ্য অভিভাবক।[৪৯] এই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু' জায়গায় তিনি যেসব প্রাণীকুল ছড়িয়ে রেখেছেন এসব তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।[৫০] যখন ইচ্ছা তিনি এদেরকে একত্র করতে পারেন।[৫১]

নিজেদের এই আচরণ থেকে বিরত থাকো এবং তাওবা করো তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাওবার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে, যে অপরাধ করেছে বা করে এসেছে তা থেকে বিরত হবে এবং ভবিষ্যতে আর তা করবে না। তাছাড়া সত্যিকার তাওবার অনিবার্য দাবী হচ্ছে কোন ব্যক্তি পূর্বে যে অন্যায় করেছে নিজের সাধ্যমত তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কোন উপায় বের করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং নিজের ওপর যে কলংক লেপন করেছে তা পরিষ্কার করতে থাকবে। তবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকলে কোন তাওবাই সত্যিকার তাওবা নয়। অন্য কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে কোন খারাপ কাজ পরিত্যাগ করা আদৌ তাওবার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

৪৮. যে প্রসংগে একথা বলা হয়েছে তা সামনে রাখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, মক্কার কাফেরদের বিদ্রোহের পেছনে যে কার্যকারণ কাজ করছিলো আল্লাহ এখানে মূলত

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۝٣٠ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝٣١ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ ۝٣٢ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝٣٣ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا۟ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۝٣٤ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ۝٣٥

৪ রুকূ'

তোমাদের ওপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।[৫২] *তোমরা তোমাদের আল্লাহকে পৃথিবীতে অচল ও অক্ষম করে দিতে সক্ষম নও এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন সহযোগী ও সাহায্যকারী নেই। সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত দৃশ্যমান এসব জাহাজ তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ চাইলে বাতাসকে থামিয়ে দেবেন আর তখন সেগুলো সমুদ্রের বুকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে যাবে।—এর মধ্যে সেই সব লোকদের প্রত্যেকের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে যারা পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ।*[৫৩] *অথবা তার আরোহীদের বহু সংখ্যক গোনাহ ক্ষমা করেও তাদেরকে কতিপয় কৃতকর্মের অপরাধে ডুবিয়ে দেবেন। আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যারা বিতর্ক করে সেই সময় তারা জানতে পারবে, তাদের আশ্রয় লাভের কোন জায়গা নেই।*[৫৪]

সেদিকেই ইংগিত করছেন। যদিও রোম ও ইরানের তুলনায় তাদের কোন মর্যাদাশীল অস্তিত্বই ছিল না এবং আশেপাশের জাতিসমূহের মধ্যে তারা একটি পশ্চাদপদ জাতির একটি ব্যবসায়জীবী গোষ্ঠী বা অন্য কথায় ফেরিওয়ালার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিল না। কিন্তু নিজেদের এই ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে অন্য আরবদের তুলনায় তারা যে সচ্ছলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলো তা তাদেরকে এতটাই অহংকারী করে তুলেছিলো যে, তারা আল্লাহর নবীর কথা শুনতেও কোনভাবে প্রস্তুত ছিল না এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নেতা হবে আর তারা তাঁকে অনুসরণ করবে তাদের গোত্রাধিপতিগণ একে তাদের মার্যাদার পরিপন্থী মনে করতো। এ কারণে বলা হচ্ছে, আমি যদি এসব সংকীর্ণমনা লোকদের জন্য সত্যিই রিযিকের দরজা খুলে দিতাম

তাহলে তারা পুরোপুরি গর্বে ফেটে পড়তো। কিন্তু আমি তাদেরকে আমার পর্যবেক্ষণে রেখেছি এবং বুঝে শুনে ঠিক ততটাই দিচ্ছি যতটা তাদেরকে গর্বে স্ফীত হতে দেবে না। এ অর্থ অনুসারে এ আয়াত ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করছে যা সূরা তাওবার ৬৮ ও ৭০ আয়াত, আল কাহাফের ৩২ ও ৪২ আয়াত, আল কাসাসের ৭৫ ও ৮২ আয়াত, আর রূম ৯ আয়াত, সাবা ৩৪ ও ৩৬ আয়াত এবং আল মু'মিনের ৮২ ও ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৪৯. এখানে অলী অর্থ এমন সত্তা যিনি তাঁর নিজের তৈরী সমস্ত সৃষ্টির সব ব্যাপারের তত্বাবধায়ক, যিনি বান্দাদের সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন পূরণের সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৫০. অর্থাৎ যমীন ও আসমান উভয় স্থানেই। জীবনের অস্তিত্ব যে শুধু পৃথিবীতেই নয়, অন্য সব গ্রহেও প্রাণী ও প্রাণধারী সত্তা আছে এটা তার সুস্পষ্ট ইংগিত।

৫১. অর্থাৎ তিনি যেমন তাদের ছড়িয়ে দিতে সক্ষম তেমনি একত্র করতেও সক্ষম। তাই কিয়ামত আসতে পারে না এবং আগের ও পরের সবাইকে একই সময়ে উঠিয়ে একত্রিত করা যেতে পারে না এ ধারণা মিথ্যা।

৫২. প্রকাশ থাকে যে, এখানে মানুষের সব রকম বিপদাপদের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে না এখানে বক্তব্যের লক্ষ্য সেই সব লোক যারা সেই সময় পবিত্র মক্কায় কুফর ও নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছিলো। তাদের বলা হচ্ছে, আল্লাহ যদি তোমাদের সমস্ত দোষ–ত্রুটির জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে তোমাদেরকে জীবিতই রাখতেন না। তবে যে বিপদাপদ তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে (সম্ভবত মক্কার দুর্ভিক্ষের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে) তা কেবল সতর্কীকরণ হিসেবে দেয়া হয়েছে যাতে তোমাদের সম্বিত ফিরে আসে এবং নিজেদের কাজকর্মের পর্যালোচনা করে দেখো যে, তোমরা আপন রবের বিরুদ্ধে কি ধরনের আচরণ করেছো। একথাও বুঝার চেষ্টা করো, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ করছো তাঁর কাছে তোমরা কত অসহায়। তাছাড়া জেনে রাখো, তোমরা যাদেরকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী বানিয়ে বসে আছো কিংবা তোমরা যেসব শক্তির ওপর ভরসা করে আছো আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন কাজে আসবে না।

আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এ বিষয়টিও বর্ণনা করা প্রয়োজন যে এ ব্যাপারে খাঁটি মু'মিনের জন্য আল্লাহর বিধান ভিন্ন। মু'মিনের ওপর যে দুঃখ–কষ্ট ও বিপদাপদ আসে তার গোনাহ, ত্রুটি–বিচ্যুতি ও দুর্বলতার কাফফারা হতে থাকে। সহীহ হাদীসে আছে ঃ

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَهَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ اَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ – (بخارى ، ومسلم)

"মুসলমান যে দুঃখ–কষ্ট, চিন্তা ও দুর্ভাবনা এবং কষ্ট ও অশান্তির সম্মুখীনই হোক না কেন এমন কি একটি কাঁটা বিদ্ধ হলেও আল্লাহ তাকে তার কোন না কোন গোনাহর কাফফারা বানিয়ে দেন।"

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ الْإِثْمِ
وَالْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾
وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র।[৫৫] আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী।[৫৬] তা সেই সব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর নির্ভর করে,[৫৭] যারা বড় বড় গোনাহ এবং লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকে[৫৮] এবং ক্রোধ উৎপত্তি হলে ক্ষমা করে,[৫৯] যারা তাদের রবের নির্দেশ মেনে চলে,[৬০] নামায কায়েম করে এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়,[৬১] আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে[৬২] এবং তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা হলে তার মোকাবিলা করে।[৬৩]

এরপর থাকে এমন সব বিপদাপদের প্রশ্ন যা আল্লাহর পথে তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য কোন ঈমানদারকে বরদাশত করতে হয়, তা কেবল ত্রুটি–বিচ্যুতির কাফফারাই হয় না, আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধিরও কারণ হয়। এসব বিপদাপদ গোনাহর শাস্তি হিসেবে নাযিল হয়ে থাকে এমন ধারণা পোষণ করার আদৌ কোন অবকাশ নেই।

৫৩. ধৈর্যশীল অর্থ এমন ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং ভাল মন্দ সব রকম পরিস্থিতিতে বন্দেগীর আচরণের ওপর দৃঢ়পদ থাকে। তাদের অবস্থা এমন নয় যে, সুদিন আসলে নিজের সত্তাকে ভুলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং বান্দাদের জন্য অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং দুর্দিন আসলে মর্যাদাবোধ খুইয়ে বসে এবং যে কোন জঘন্য থেকে জঘন্যতর আচরণ করতে থাকে। কৃতজ্ঞ বলতে বুঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যাকে তাকদীরে ইলাহী যত উচ্চাসনেই অধিষ্ঠিত করুক না কেন সে তাকে নিজের কৃতিত্ব নয়, বরং আল্লাহর ইহসান মনে করে এবং যত নিচেই তাকে নিক্ষেপ করা হোক না কেন তার দৃষ্টি নিজের বঞ্চনার পরিবর্তে সেই সব নিয়ামতের ওপর নিবদ্ধ থাকে যা অতি করুণ পরিস্থিতির মধ্যেও ব্যক্তি লাভ করে এবং সুখ ও দুঃখ উভয় পরিস্থিতিতে তার মুখ ও অন্তর থেকে তার রবের প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পেতে থাকে।

৫৪. কুরাইশদেরকে তাদের বাণিজ্যিক কায়কারবারের উদ্দেশ্যে হাবশা এবং আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে যেতে হতো। এসব সফরে তারা পালের জাহাজ ও নৌকায় লোহিত সাগর পাড়ি দিত যা একটি ভয়ানক সাগর। প্রায়ই তা ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ থাকে এবং তার পানির নীচে বিপুল সংখ্যক পাহাড় বিদ্যমান। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে এসব পাহাড়ের সাথে জাহাজের ধাক্কা খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে আল্লাহ এখানে যে অবস্থা চিত্রিত করেছেন নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কুরাইশরা তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারতো।

৫৫. অর্থাৎ এটা এমন কোন জিনিস নয় যার জন্য মানুষ গর্বিত হতে পারে। কোন মানুষ পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্পদ লাভ করলেও স্বল্পতম সময়ের জন্যই লাভ করেছে। সে কয়েক বছর মাত্র তা ভোগ করে তারপর সব কিছু ছেড়ে খালি হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যায়। তাছাড়া সে সম্পদ যত অঢেলই হোক না কেন বাস্তবে তার একটা ক্ষুদ্রতম অংশই ব্যক্তির ব্যবহারে আসে। এ ধরনের সম্পদের কারণে গর্বিত হওয়া এমন কোন মানুষের কাজ নয় যে, নিজের এই অর্থ–সম্পদের এবং এই পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে।

৫৬. অর্থাৎ সেই সম্পদ গুণগত ও অবস্থাগত দিক দিয়েও উন্নতমানের। তাছাড়া তা সাময়িক বা অস্থায়ীও নয়, বরং চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

৫৭. এখানে আল্লাহর প্রতি ভরসাকে ঈমানের অনিবার্য দাবী এবং আখেরাতের সফলতার জন্য একটি জরুরী বৈশিষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাওয়াক্কুল অর্থ হচ্ছে, প্রথমত, আল্লাহর পথনির্দেশনার ওপর ব্যক্তির পূর্ণ আস্থা থাকবে এবং সে মনে করবে, আল্লাহ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে যে জ্ঞান, নৈতিক চরিত্রের যে নীতিমালা, হালাল ও হারামের যে সীমারেখা এবং পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য যেসব নিয়ম–কানুন ও বিধি–বিধান দিয়েছেন তাই সত্য ও সঠিক এবং সেসব মেনে চলার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। দ্বিতীয়ত, মানুষের নির্ভরতা তার নিজের শক্তি, যোগ্যতা, মাধ্যম ও উপায়–উপকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাহায্য–সহযোগিতার ওপর হবে না। তাকে একথা পুরোপুরি মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি ব্যাপারে তার সাফল্য প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যের ওপর। আর সে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যের উপযুক্ত কেবল তখনই হতে পারে যখন সে তাঁর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ মেনে কাজ করবে। তৃতীয়ত, ঈমান ও নেক কাজের পথ অবলম্বনকারী এবং বাতিলের পরিবর্তে ন্যায় ও সত্যের জন্য কর্মতৎপর বান্দাদেরকে আল্লাহ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্যক্তিকে তার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। ঐ সব প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাশীল হয়ে সে সেই সব লাভ, উপকার ও আনন্দকে পদাঘাত করবে যা বাতিলের পথ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে লাভ করা যাবে বলে মনে হয় এবং ন্যায় ও সত্যের ওপর দৃঢ়পদ থাকার কারণে যেসব ক্ষতি, দুঃখ কষ্ট এবং বঞ্চনা তার ভাগ্যে আসে তা সহ্য করবে। ঈমানের সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক কত গভীর তা তাওয়াক্কুল শব্দের অর্থের এই বিশ্লেষণের পর সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তাওয়াক্কুল ছাড়া যে ঈমান সাদামাটা স্বীকৃতি ও ঘোষণা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ তা থেকে সেই গৌরবময় ফলাফল কি করে অর্জিত হতে পারে ঈমান গ্রহণ করে তাওয়াক্কুলকারীদের যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে!

৫৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, টীকা ৫৩, ৫৪; আল আনয়াম, টীকা ১৩০–৩১; আন নাহল, টীকা ৮৯; তাছাড়া সূরা নাজমের ৩২ আয়াত।

৫৯. অর্থাৎ তারা রুক্ষ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয় না, বরং নম্র স্বভাব ও ধীর মেজাজের মানুষ হয়। তাদের স্বভাব প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। তারা আল্লাহর বান্দাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করে এবং কোন কারণে ক্রোধান্বিত হলেও তা হজম করে। এটি মানুষের সর্বোত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদ একে অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে (আল ইমরান, আয়াত ১৩৪) এবং একে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্যের বড় বড় কারণসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে (আল ইমরান, ১৫৯ আয়াত)। হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فى شىء قط الا ان تنتهك حرمة الله - (بخارى ، مسلم)

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কারণে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর কোন হুরমত বা মর্যাদার অবমাননা করা হলে তিনি শাস্তি বিধান করতেন।"

৬০. শাব্দিক অনুবাদ হবে "রবের আহবানে সাড়া দেয়।" অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজের জন্যই ডাকেন সে কাজের জন্যই ছুটে যায় এবং যে জিনিসের জন্যই আহবান জানান তা গ্রহণ করে।

৬১. এ বিষয়টিকে এখানে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে এবং সূরা আল ইমরানে (আয়াত ১৫৯) এ জন্য আদেশ করা হয়েছে। এ কারণে পরামর্শ ইসলামী জীবন প্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পরামর্শ ছাড়া সামষ্টিক কাজ পরিচালনা করা শুধু জাহেলী পন্থাই নয়, আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। ইসলামে পরামর্শকে এই গুরুত্ব কেন দেয়া হয়েছে? এর কারণসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে আমাদের সামনে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়।

এক ঃ যে বিষয়টি দুই বা আরো বেশী লোকের স্বার্থের সাথে জড়িত সে ক্ষেত্রে কোন এক ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের উপেক্ষা করা জুলুম। যৌথ ব্যাপারে কারো যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার নেই। ইনসাফের দাবী হচ্ছে, কোন বিষয়ে যত লোকের স্বার্থ জড়িত সে ব্যাপারে তাদের সবার মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে যদি বিপুল সংখ্যক লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তাদের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শের মধ্যে শামিল করতে হবে।

দুই ঃ যৌথ ব্যাপারে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা করার চেষ্টা করে অন্যদের অধিকার নস্যাত করে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ লাভ করার জন্য, অথবা এর কারণ হয় সে নিজেকে বড় একটা কিছু এবং অন্যদের নগণ্য মনে করে। নৈতিক বিচারে এই দুটি জিনিসই সমপর্যায়ের হীন। মু'মিনের মধ্যে এ দুটির কোনটিই পাওয়া যেতে পারে না। মু'মিন কখনো স্বার্থপর হয় না। তাই সে অন্যদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে নিজে অন্যায় ফায়দা চাইতে পারে না

এবং অহংকারী বা আত্মপ্রশংসিতও হতে পারে না যে নিজেকেই শুধু মহাজ্ঞানী ও সবজান্তা মনে করবে।

তিন ঃ যেসব বিষয় অন্যদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে জড়িত সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটা বড় দায়িত্ব। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং একথা জানে যে এর জন্য তাকে তার রবের কাছে কত কঠিন জবাবদিহি করতে হবে সে কখনো একা এই গুরুভার নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেয়ার দুঃসাহস করতে পারে না। এ ধরনের দুঃসাহস কেবল তারাই করে যারা আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভিক এবং আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাহীন। খোদাভীরু ও আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতি সম্পন্ন লোক কোন যৌথ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কিংবা তাদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীক করার চেষ্টা করবে যাতে সর্বাধিক মাত্রায় সঠিক, নিরপেক্ষ এবং ইনসাফ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে যদি অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি হয়েও যায় তাহলে কোন এক ব্যক্তির ঘাড়ে তার দায়দায়িত্ব এসে পড়বে না।

এ তিনটি কারণ এমন যদি তা নিয়ে মানুষ গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে অতি সহজেই সে একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ইসলাম যে নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয় পরামর্শ তার অনিবার্য দাবী এবং তা এড়িয়ে চলা একটি অতি বড় চরিত্রহীনতার কাজ। ইসলাম কখনো এ ধরনের কাজের অনুমতি দিতে পারে না। ইসলামী জীবন পদ্ধতি সমাজের ছোট বড় প্রতিটি ব্যাপারেই পরামর্শের নীতি কার্যকরী হোক তা চায়। পারিবারিক ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে স্বামী–স্ত্রী পরামর্শ করে কাজ করবে এবং ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদেরকেও পরামর্শে শরীক করতে হবে। খান্দান বা গোষ্ঠীর ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সমস্ত বুদ্ধিমান ও বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করতে হবে যদি একটি গোত্র বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী কিংবা জনপদের বিষয়াদি হয় এবং তাতে সব মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এমন পঞ্চায়েত বা সভা পালন করবে যেখানে কোন সর্বসম্মত পন্থা অনুসারে সংশ্লিষ্ট সবার আস্থাভাজন প্রতিনিধিরা শরীক হবে। গোটা জাতির ব্যাপার হলে তা পরিচালনার জন্য সবার ইচ্ছানুসারে তাদের নেতা নিযুক্ত হবে জাতীয় বিষয়গুলোকে সে এমন সব ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করবে জাতি যাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত নেতা থাকবে যতক্ষণ জাতি তাকে নেতা বানিয়ে রাখতে চাইবে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি জোরপূর্বক জাতির নেতা হওয়ার বা হয়ে থাকার আকাংখা কিংবা চেষ্টা করতে পারে না। প্রথমে জোরপূর্বক জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এবং পরে জবরদস্তি করে মানুষের সম্মতি আদায় করা, এমন প্রতারণাও সে করতে পারে না। তাকে পরামর্শ দানের জন্য মানুষ স্বাধীন ইচ্ছানুসারে নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধি নয়, বরং এমন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবে যে তার মর্জি মোতাবেক মতামত প্রকাশ করবে, এমন চক্রান্তও সে করতে পারে না এমন আকাংখা কেবল সেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে যার মন অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা কলুষিত। এই আকাংখার সাথে أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ এর বাহ্যিক কাঠামো নির্মাণ এবং তার বাস্তব প্রাণসত্তাকে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচেষ্টা শুধু সেই ব্যক্তিই চালাতে পারে যে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিকে ধোঁকা দিতে ভয় করে না। অথচ না আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব না আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ এমন অন্ধ হতে পারে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে কেউ ডাকাতি করছে আর মানুষ তা দেখে সরল মনে ভাবতে থাকবে যে, সে ডাকাত নয়, মানুষের সেবা করছে।

أَمْرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ এর নিয়মটি প্রকৃতি ও বৈশিষ্টের দিক দিয়ে পাঁচটি জিনিস দাবী করে ঃ

এক ঃ যৌথ বিষয়সমূহ যাদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত তাদের মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের অবহিত রাখতে হবে। তারা যদি তাদের ব্যাপারগুলোর নেতৃত্বে কোন ত্রুটি, অপরিপক্কতা বা দুর্বলতা দেখায় তাহলে তা তুলে ধরার ও তার প্রতিবাদ করার এবং সংশোধিত হতে না দেখলে পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের পরিবর্তন করার অধিকার থাকতে হবে। মানুষের মুখ বন্ধ করে, হাত পা বেঁধে এবং তাদেরকে অনবহিত রেখে তাদের সামষ্টিক ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করা সুস্পষ্ট প্রবঞ্চনা। কেউ–ই এ কাজকে أَمْرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ নীতির অনুসরণ বলে মানতে পারে না।

দুই ঃ যৌথ বিষয়সমূহ পরিচালনার দায়িত্ব যাকেই দেয়া হবে তাকে যেন এ দায়িত্ব সবার স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে দান করা হয়। জবরদস্তি ও ভয়ভীতি দ্বারা অর্জিত কিংবা লোভ–লালসা দিয়ে খরিদকৃত অথবা ধোঁকা–প্রতারণা ও চক্রান্তের মাধ্যমে লুণ্ঠিত সম্মতি প্রকৃতপক্ষে কোন সম্মতি নয়। যে সম্ভাব্য সব রকম পন্থা কাজে লাগিয়ে কোন জাতির নেতা হয় সে সত্যিকার নেতা নয়। সত্যিকার নেতা সেই যাকে মানুষ নিজের পসন্দানুসারে সানন্দ চিত্তে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে।

তিন ঃ নেতাকে পরামর্শ দানের জন্যও এমন সব লোক নিয়োগ করতে হবে যাদের প্রতি জাতির আস্থা আছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, যারা চাপ সৃষ্টি করে কিংবা অর্থ দ্বারা খরিদ করে অথবা মিথ্যা ও চক্রান্তের সাহায্যে বা মানুষকে বিভ্রান্ত করে প্রতিনিধিত্বের স্থানটি দখল করে তাদেরকে সঠিক অর্থে আস্থাভাজন বলা যায় না।

চার ঃ পরামর্শদাতাগণ নিজেদের জ্ঞান, ঈমান ও বিবেক অনুসারে পরামর্শ দান করবে এবং এভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। এ দিকগুলো যেখানে থাকবে না, যেখানে পরামর্শদাতা কোন প্রকার লোভ–লালসা বা ভীতির কারণে অথবা কোন দলাদলির মারপ্যাঁচের কারণে নিজের জ্ঞান ও বিবেকের বিরুদ্ধে মতামত পেশ করে সেখানে প্রকৃতপক্ষে হবে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা أَمْرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ এর অনুসরণ নয়।

পাঁচ ঃ পরামর্শদাতাদের 'ইজমা'র (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) ভিত্তিতে যে পরামর্শ দেয়া হবে, অথবা যে সিদ্ধান্ত তাদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করবে তা মেনে নিতে হবে। কেননা সবার মতামত জানার পরও যদি এক ব্যক্তি অথবা একটি ছোট্ট গ্রুপকে স্বেচ্ছাচার চালানোর সুযোগ দেয়া হয় তাহলে পরামর্শ অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ একথা বলছেন না যে, "তাদের ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়" বরং বলছেন, 'তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলে।" শুধু পরামর্শ করাতেই এ নির্দেশ পালন করা হয় না। তাই পরামর্শের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজকর্ম পরিচালনা প্রয়োজন।

ইসলামের পরামর্শ ভিত্তিক কাজ পরিচালনা নীতির এই ব্যাখ্যার সাথে এই মৌলিক কথাটার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুসলমানদের পারস্পরিক বিষয়সমূহ পরিচালনায়

এই শূরা স্বেচ্ছাচারী এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, বরং অবশ্যই সেই দীনের বিধি–বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ আল্লাহ নিজেই যার জন্য বিধান রচনা করেছেন। সাথে সাথে তা সেই মূল নীতিরও আনুগত্য করতে বাধ্য যাতে বলা হয়েছে "যে ব্যাপারেই তোমাদের মধ্যে মতভেদ হবে তার ফায়সালা করবেন আল্লাহ।" এবং "তোমাদের মধ্যে যে বিরোধই বাধুক না কেন সে জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে ফিরে যাও।" এই সাধারণ সূত্র অনুসারে মুসলমানরা শারয়ী বিষয়ে মূল ধর্মগ্রন্থের কোন অংশের কি অর্থ এবং কিভাবে তা কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে যাতে তার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়। কিন্তু যে ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে ব্যাপারে তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এ উদ্দেশ্যে কোন পরামর্শ করতে পারে না।

৬২. এর তিনটি অর্থ ঃ

এক ঃ আমি তাদেরকে যে হালাল রিযিক দান করেছি তা থেকে খরচ করে, নিজের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য হারাম অর্থ–সম্পদের দিকে হাত বাড়ায় না।

দুই ঃ আমার দেয়া রিযিককে যক্ষের ধনের মত জমা করে রাখে না, বরং খরচ করে।

তিন ঃ তাদের যে রিযিক দেয়া হয়েছে তা থেকে আল্লাহর পথেও ব্যয় করে, সবটাই নিজের জন্য আঁকড়ে ধরে রাখে না।

প্রথম অর্থের ভিত্তি হলো, আল্লাহ শুধু হালাল ও পবিত্র রিযিককেই তাঁর দেয়া রিযিক বলে বর্ণনা করেন। অপবিত্র ও হারাম পন্থায় উপার্জিত রিযিককে তিনি তাঁর নিজের দেয়া রিযিক বলেন না। দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তি হলো, আল্লাহ মানুষকে যে রিযিক দান করেন তা খরচ করার জন্য দান করেন, জমিয়ে জমিয়ে সাপের মত পাহারা দিয়ে রাখার জন্য দেন না। এবং তৃতীয় অর্থের ভিত্তি হলো, কুরআন মজীদে ব্যয় করা বলতে শুধু নিজের সত্তা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় করা বুঝানো হয়নি। এ অর্থের মধ্যে আল্লাহর পথে ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত। এ তিনটি কারণে আল্লাহ এখানে খরচ করাকে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করছেন এবং এ জন্য আখেরাতের কল্যাণসমূহ তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬৩. এটাও ঈমানদারদের একটা সর্বোৎকৃষ্ট গুণ। তারা জালেম ও নিষ্ঠুরদের জন্য সহজ শিকার নয়। তাদের কোমল স্বভাব এবং ক্ষমাশীলতা দুর্বলতার কারণে নয়। তাদের ভিক্ষু ও পাদরীদের মত মিসকীন হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়া হয়নি। তাদের ভদ্রতার দাবী হচ্ছে বিজয়ী হলে বিজিতের দোষ–ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়। সক্ষম হলে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে মাফ করে এবং অধীনস্ত ও দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা কোন ভুল–ত্রুটি সংঘটিত হলে তা উপেক্ষা করে যায়। কিন্তু কোন শক্তিশালী ব্যক্তি যদি তার শক্তির অহংকারে তার প্রতি বাড়াবাড়ি করে তাহলে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাকে উচিত শিক্ষা দান করে। মু'মিন কখনো জালেমের কাছে হার মানে না এবং অহংকারীর সামনে মাথা নত করে না। এ ধরনের লোকদের জন্য তারা বড় কঠিন খাদ্য যা চিবানোর প্রচেষ্টাকারীর মাড়িই ভেঙে দেয়।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

খারাপের[৬৪] প্রতিদান সমপর্যায়ের খারাপ।[৬৫] অতপর যে মাফ করে দেয় এবং সংশোধন করে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব।[৬৬] আল্লাহ জালেমদের পসন্দ করেন না।[৬৭] যারা জুলুম হওয়ার পরে প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের তিরস্কার করা যায় না। তিরস্কারের উপযুক্ত তো তারা যারা অন্যদের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বাড়াবাড়ি করে। এসব লোকের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তবে যে ধৈর্যের সাথে কাজ করে এবং ক্ষমা প্রদর্শন করে তার সে কাজ মহত্তর সংকল্পদীপ্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত।[৬৮]

৬৪. এখান থেকে শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত গোটা বক্তব্য পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

৬৫. এটা প্রথম নিয়মতান্ত্রিক বিধান, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে যা মনে রাখা দরকার। প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধ সীমা হচ্ছে কারো প্রতি যতটুকুন অন্যায় করা হয়েছে সে তার প্রতি ঠিক ততটুকুন অন্যায় করবে। তার চেয়ে বেশী অন্যায় করার অধিকার তার নেই।

৬৬. এটা প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বিতীয় বিধান। এর অর্থ অন্যায়কারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ যদিও বৈধ, তবে যেখানে ক্ষমা করে দিলে তা সংশোধনের কারণ হতে পারে সেখানে সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে মাফ করে দেয়া অধিক উত্তম। যেহেতু মানুষ নিজেকে কষ্ট দিয়ে এই ক্ষমা প্রদর্শন করে তাই আল্লাহ বলেন, এর প্রতিদান দেয়া আমার দায়িত্ব। কারণ, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত মানুষকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তুমি এই তিক্ততা হজম করেছো।

৬৭. এই সতর্ক বাণীর মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পর্কে তৃতীয় আরেকটি বিধানের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, অন্যের কৃত জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে করতে কোন ব্যক্তির নিজেরই জালেম না হয়ে যাওয়া উচিত। একটি অন্যায়ের পরিবর্তে তার চেয়ে বড় অন্যায় করে ফেলা বৈধ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ অপর কাউকে একটি চপেটাঘাত করে তাহলে সে তাকে একটি চপেটাঘাতই করতে পারে, অসংখ্য লাথি ও ঘুঁষি মারতে পারে না। অনুরূপ গোনাহর, প্রতিশোধ গোনাহর কাজের মাধ্যমে নেয়া ঠিক

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾

৫ রুকূ'

আল্লাহ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন আল্লাহ ছাড়া তাকে সামলানোর আর কেউ নেই।[৬৯] তোমরা দেখতে পাবে এসব জালেমরা যখন আযাব দেখবে তখন বলবে এখন কি ফিরে যাবারও কোন পথ আছে?[৭০] তুমি দেখতে পাবে এদের জাহান্নামের সামনে আনা হলে অপমানে আনত হতে থাকবে এবং দৃষ্টির আড়ালে বাঁকা চোখে তাকে দেখতে থাকবে।[৭১] যারা ঈমান এনেছিলো সেই সময় তারা বলবে ঃ প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সাবধান! জালেমরা চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং তাদের কোন সহযোগী ও অভিভাবক থাকবে না, যারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের সাহায্য করবে। আল্লাহ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন তার বাঁচার কোন পথ নেই।

নয়। যেমন কোন জালেম যদি কারোর পুত্রকে হত্যা করে তাহলে তার পুত্রকে হত্যা করা জায়েয নয়। কিংবা কোন দুরাচার যদি কারো বোন বা কন্যার সাথে ব্যভিচার করে তাহলে সেই ব্যক্তির তার বোন বা কন্যার সাথে ব্যভিচার করা হালাল হবে না।

৬৮. উল্লেখ্য, এ আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের যেসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তা সেই সময় বাস্তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের জীবনে বিদ্যমান ছিল এবং মক্কার কাফেররা নিজ চোখে তা দেখছিলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এভাবে কাফেরদের বুঝিয়েছেন যে, পৃথিবীর স্বল্প দিনের জীবন যাপনের যে উপায়–উপকরণ লাভ করে তোমরা আত্মহারা হয়ে পড়ছো প্রকৃত সম্পদ ঐ সব

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ
مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ۝٤٧ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا
رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ
الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۝٤٨ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ
يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝٤٩ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝٥٠

তোমরা তোমাদের রবের কথায় সাড়া দাও—সেই দিনটি আসার আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে ফিরিয়ে দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।[৭২] সেই দিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাকারীও কেউ থাকবে না।[৭৩] এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী, আমি তো আপনাকে তাদের জন্য রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি।[৭৪] কথা পৌঁছিয়ে দেয়াই কেবল তোমার দায়িত্ব। মানুষের অবস্থা এই যে, যখন আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে তার জন্য গর্বিত হয়ে ওঠে। আর যখন তার নিজ হাতে কৃত কোন কিছু মুসিবত আকারে তার ওপর আপতিত হয় তখন সে চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।[৭৫]

যমীন ও আসমানের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ[৭৬] তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম।[৭৭]

উপায়–উপকরণ নয়। বরং কুরআনের পথনির্দেশনা গ্রহণ করে তোমাদের সমাজের এসব ঈমানদার তাদের মধ্যে যে নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি করেছে। সেগুলোই প্রকৃত সম্পদ।

৬৯. অর্থাৎ আল্লাহ এসব লোকের হিদায়াতের জন্য কুরআনের মত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব পাঠিয়েছেন, যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত এবং অত্যন্ত কার্যকর ও চিত্তাকর্ষক উপায়ে প্রকৃত

সত্যের জ্ঞান দান করছে এবং জীবনের সঠিক পথ বলে দিচ্ছে। তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত নবী পাঠিয়েছেন যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন ও চরিত্রের অধিকারী মানুষ তাদের দৃষ্টি কখনো দেখেনি। আল্লাহ এই কিতাব ও এই রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফলসমূহও ঈমান গ্রহণকারীদেরকে তাদের নিজ চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন। এসব দেখার পর যদি কোন ব্যক্তি হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ পুনরায় তাকে সেই গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করবেন যেখান থেকে সে বেরিয়ে আসতে আগ্রহী নয়। আর আল্লাহই যখন তাকে তাঁর দরজা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেন তখন তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব কে নিতে পারে?

৭০. অর্থাৎ আজ যখন ফিরে আসার সুযোগ আছে তখন এরা ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। কিন্তু কাল যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে এবং শাস্তির নির্দেশ কার্যকর হবে তখন নিজেদের দুর্ভাগ্য দেখে এরা ফিরে আসার সুযোগ পেতে চাইবে।

৭১. মানুষের স্বভাব হচ্ছে, কোন ভয়ানক দৃশ্য যখন তার সামনে থাকে এবং সে বুঝতে পারে, চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই সে তার কবলে পড়তে যাচ্ছে তখন প্রথমেই ভয়ের চোটে চোখ বন্ধ করে নেয়। এরপরও যদি তার হাত থেকে রেহাই না পায় তখন দেখার চেষ্টা করে বিপদটা কেমন এবং এখনো তার থেকে কত দূরে আছে। কিন্তু মাথা উঁচু করে ভালভাবে দেখার হিম্মত তার থাকে না। তাই সে বার বার একটু একটু করে চোখ খুলে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে এবং ভয়ের চোটে আবার চোখ বন্ধ করে নেয়। এ আয়াতে জাহান্নামের দিকে অগ্রসরমান লোকদের এই অবস্থাই এখানে চিত্রিত করা হয়েছে।

৭২. অর্থাৎ না আল্লাহ নিজে তা ফিরাবেন আর না অন্য কারো তা ফিরানোর ক্ষমতা আছে।

৭৩. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে مَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ এই আয়াতাংশের আরো কয়েকটি অর্থ আছে। এক—তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের কোনটিকেই অস্বীকার করতে পারবে না। দুই—তোমরা পোশাক বদল করে কোথাও লুকাতে পারবে না। তিন—তোমাদের সাথে যে আচরণই করা হোক না কেন তোমরা তার কোন প্রতিবাদ এবং তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারবে না। চার—তোমাদেরকে যে পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে তোমরা তা পাল্টিয়ে ফেলতে পারবে না।

৭৪. অর্থাৎ তোমাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, তোমরা অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে আনবে অন্যথায় তারা সঠিক পথে আসেনি কেন সে জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

৭৫. মানুষ বলতে এখানে সেই নীচমনা ও অদূরদর্শী মানুষদের বুঝানো হয়েছে পূর্ব থেকেই যাদের আলোচনা চলে আসছে। পার্থিব কিছু সম্পদ লাভ করার কারণে যারা গর্বিত হয়ে উঠেছে এবং বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা হলে সেদিকে কানই দেয় না কিন্তু নিজেদের কৃতকর্মের কারণেই যদি কোন সময় তাদের দুর্ভাগ্য এসে যায় তাহলে ভাগ্যকে দোষারোপ করতে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তা সবই ভুলে যায় এবং যে অবস্থার মধ্যে সে পতিত হয়েছে তাতে তার নিজের দোষ-ত্রুটি কতটুকু তা

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

কোন[৭৮] মানুষই এ মর্যাদার অধিকারী নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় অহীর (ইংগিত) মাধ্যমে,[৭৯] অথবা পর্দার আড়াল থেকে,[৮০] কিংবা তিনি কোন বার্তাবাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর হুকুমে তিনি যা চান অহী হিসেবে দেয়।[৮১] তিনি সুমহান ও সুবিজ্ঞ।[৮২] এভাবেই (হে মুহাম্মদ), আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে এক রূহকে অহী করেছি।[৮৩] তুমি আদৌ জানতে না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি।[৮৪] কিন্তু সেই রূহকে আমি একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখিয়ে থাকি। নিশ্চিতভাবেই আমি তোমাকে সোজা পথের দিক নির্দেশনা দান করছি। সেই আল্লাহর পথের দিকে যিনি যমীন ও আসমানের সব জিনিসের মালিক। সাবধান, সব কিছু আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।[৮৫]

বুঝার চেষ্টা করে না। এভাবে না স্বাচ্ছন্দ্য তাদের সংশোধনে কাজে আসে না দুরবস্থা তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল পূর্বোক্ত বক্তব্যের শ্রোতাদের প্রতি একটি বিদ্রূপ। তবে তাদের সম্বোধন করে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের অবস্থা তো এই। বরং বলা হয়েছে, সাধারণত মানুষের মধ্যে এই দুর্বলতা দেখা যায় এবং এটাই তার নষ্টের মূল কারণ। এ থেকে ইসলামের প্রচার কৌশলের একটি দিক এই জানা যায় যে, শ্রোতার দুর্বলতার ওপর সরাসরি আঘাত না করা উচিত। সাধারণভাবে এসব দুর্বলতার উল্লেখ করা উচিত যাতে সে ক্ষিপ্ত না হয় এবং তার বিবেকবোধ যদি কিঞ্চিতও জীবিত থাকে তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের ত্রুটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

৭৬. অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকের নির্বুদ্ধিতায় ডুবে আছে তারা যদি বুঝানোর পরও না মানতে চায় না মানুক, সত্য যথা স্থানে সত্যই। যমীন ও আসমানের বাদশাহী দুনিয়ার

তথাকথিত বাদশাহ, স্বৈরাচারী ও নেতাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কোন নবী, অলী, দেবী বা দেবতার তাতে কোন অংশ নেই, আল্লাহ একাই তার মালিক। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী না নিজের শক্তিতে বিজয়ী হতে পারে, না সেই সব সত্তার কেউ এসে তাকে রক্ষা করতে পারে যাদেরকে মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে খোদায়ী ক্ষমতা ও এখতিয়ারসমূহের মালিক মনে করে বসে আছে।

৭৭. এটা আল্লাহর বাদশাহীর নিরংকুশ (Absolute) হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোন মানুষ, সে পার্থিব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় অধিকর্তাই সাজুক না কেন, কিংবা তাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় মালিকই মনে করা হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দেওয়ানো তো দূরের কথা নিজের জন্য নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্ম দানেও সে কখনো সক্ষম হয়নি। আল্লাহ যাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছেন সে কোন ওষুধ, কোন চিকিৎসা এবং কোন তাবীজ কবজ দ্বারা সন্তান ওয়ালা হতে পারেনি। আল্লাহ যাকে শুধু কন্যা সন্তান দান করেছেন সে কোনভাবেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেনি এবং আল্লাহ যাকে শুধু পুত্র সন্তানই দিয়েছেন সে কোনভাবেই একটি কন্যা সন্তান লাভ করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে সবাই নিদারুণ অসহায় এমনকি সন্তান জন্মের পূর্বে কেউ এতটুকু পর্যন্ত জানতে পারেনি যে মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান বেড়ে উঠছে না কন্যা সন্তান। এসব দেখে শুনেও যদি কেউ খোদার খোদায়ীতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সেজে বসে, কিংবা অন্য কাউকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে তাহলে সেটা তার নিজের অদূরদর্শিতা যার পরিণাম সে নিজেই ভোগ করবে। কেউ নিজে নিজেই কোন কিছু বিশ্বাস করে বসলে তাতে প্রকৃত সত্যে সামান্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

৭৮. বক্তব্যের সূচনা পর্বে যা বলা হয়েছিলো সমাপ্তি পর্যায়েও সেই বিষয়টিই বলা হচ্ছে। কথাটা পুরোপুরি বুঝতে হলে এই সূরার প্রথম আয়াত এবং তার টীকা পুনরায় দেখে নিন।

৭৯. এখানে অহী অর্থ 'ইলকা', ইলহাম, মনের মধ্যে কোন কথা সৃষ্টি করে দেয়া কিংবা স্বপ্নে কিছু দেখিয়ে দেয়া, যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইউসুফকে দেখানো হয়েছিলো (ইউসুফ, আয়াত ৪ ও ১০০ এবং আস সাফফাত, ১০২)।

৮০. এর সারমর্ম হচ্ছে, বান্দা শব্দ শুনতে পায় কিন্তু শব্দদাতাকে দেখতে পায় না, যেমন হযরত মূসার ক্ষেত্রে ঘটেছিলো। তূর পাহাড়ের পাদদেশে একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ আওয়াজ আসতে শুরু হলো। কিন্তু যিনি কথা বললেন তিনি তার দৃষ্টির আড়ালেই থাকলেন (ত্বাহা, আয়াত ১১ থেকে ৪৮; আন নামল, আয়াত ৮ থেকে ১২; আল কাসাস, আয়াত ৩০ থেকে ৩৫)।

৮১. যে পদ্ধতিতে নবী–রসূলদের কাছে সমস্ত আসমানী কিতাব এসেছে এটা অহী আসার সেই পদ্ধতি। কেউ কেউ এ আয়াতাংশের ভুল ব্যাখ্যা করে এর অর্থ করেছেন : আল্লাহ রসূল প্রেরণ করেন যিনি তাঁর নির্দেশে সাধারণ লোকদের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে দেন।" কিন্তু কুরআনের ভাষা فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ (তারপর সে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান তাই অহী হিসেবে দেয়) তাদের এই ব্যাখ্যার ভ্রান্তি সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দেয়। সাধারণ মানুষের সামনে নবীদের তাবলীগী কাজকর্মকে "অহী প্রদান" অর্থে না কুরআনের

কোথাও আখ্যায়িত করা হয়েছে, না আরবী ভাষায় মানুষের সাথে মানুষের কথাবার্তাকে 'অহী' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ আছে। অহীর আভিধানিক অর্থই হচ্ছে গোপন এবং ত্বরিত ইংগিত। নবী-রসূলদের তাবলীগি কাজকর্ম বুঝাতে এই শব্দটির ব্যবহার শুধু এমন ব্যক্তিই করতে পারে যে আরবী ভাষায় একেবারেই অজ্ঞ।

৮২. অর্থাৎ তিনি কোন মানুষের সাথে সামনা-সামনি কথাবার্তা বলার বহু উর্ধে। নিজের কোন বান্দার কাছে নির্দেশনা পৌছিয়ে দেয়ার জন্য সামনা সামনি বাক্যালাপ করা ছাড়া আর কোন কৌশল উদ্ভাবন করতে তাঁর জ্ঞান অক্ষম নয়।

৮৩. "এভাবেই" অর্থ শুধু শেষ পদ্ধতি নয়, বরং ওপরের আয়াতে যে তিনটি পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে তার সব কটি। আর 'রূহ' অর্থ অহী অথবা অহীর মাধ্যমে নবীকে (সা) যে শিক্ষা দান করা হয়েছে সেই শিক্ষা। কুরআন ও হাদীস থেকেই একথা প্রমাণিত যে, এই তিনটি পদ্ধতিতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত দান করা হয়েছে ঃ

এক ঃ হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী আসার সূচনা হয়েছিলো সত্য স্বপ্নের আকারে (বুখারী ও মুসলিম)। এই ধারা পরবর্তী সময় পর্যন্ত জারি ছিল। তাই হাদীসে তাঁর বহু সংখ্যক স্বপ্নের উল্লেখ দেখা যায়। যার মাধ্যমে হয় তাঁকে কোন শিক্ষা দেয়া হয়েছে কিংবা কোন বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মজীদে নবীর (সা) একটি স্বপ্নের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে (আল ফাতহ, আয়াত ২৭)। তাছাড়া কতিপয় হাদীসে একথারও উল্লেখ আছে যে, নবী (সা) বলেছেন, আমার মনে অমুক বিষয়টি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, কিংবা আমাকে একথাটি বলা হয়েছে বা আমাকে এই নির্দেশ দান করা হয়েছে অথবা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ধরনের সব কিছু অহীর প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত। বেশীর ভাগ হাদীসে কুদসী এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

দুই ঃ মে'রাজে নবীকে (সা) দ্বিতীয় প্রকার অহী দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। কতিপয় হাদীসে নবীকে (সা) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া এবং তা নিয়ে তাঁর বার বার দরখাস্ত পেশ করার কথা যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সে সময় আল্লাহ এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ঠিক তেমনি কথাবার্তা হয়েছিলো যেমনটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে মূসা (আ) ও আল্লাহর মধ্যে হয়েছিলো।

তিন ঃ এরপর থাকে অহীর তৃতীয় শ্রেণী। এ ব্যাপারে কুরআন নিজেই সাক্ষ্য দান করে যে, কুরআনকে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছানো হয়েছে (আল বাকারা ৯৭, আশ শু'আরা ১৯২ থেকে ১৯৫ আয়াত)।

৮৪. অর্থাৎ নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার আগে নবীর (সা) মগজে এ ধারণা পর্যন্তও কোন দিন আসেনি যে, তিনি কোন কিতাব লাভ করতে যাচ্ছেন বা তাঁর লাভ করা উচিত। বরং তিনি আসমানী কিতাব এবং তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আদৌ কিছু জানতেন না। অনুরূপ আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান অবশ্যই ছিল। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে কি কি বিষয় মানতে হবে সচেতনভাবে তিনি তার বিস্তারিত কিছুই জানতেন না। একথাও তাঁর

জানা ছিল না যে, এর সাথে ফেরেশতা, নবুওয়াত, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং আখেরাত সম্পর্কে অনেক কিছুই মানা আবশ্যক। এ দুটি ছিল এমনই বিষয় যা মক্কার কাফেরদের কাছেও গোপন ছিল না। মক্কার কোন মানুষই এ প্রমাণ দিতে সক্ষম ছিল না যে, হঠাৎ নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে সে কখনো নবীর (সা) মুখে আল্লাহর কিতাবের কথা শুনেছে কিংবা মানুষদের অমুক অমুক বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে এমন কোন কথা শুনেছে। একথা সুস্পষ্ট যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব থেকেই নবী হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে তাহলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাত দিন তার সাথে উঠাবসা করেও কেউ তার মুখ থেকে কিতাব ও ঈমান শব্দ পর্যন্ত শুনবে না। অথচ চল্লিশ বছর পর সে ঐ সব বিষয়েই হঠাৎ জোরালো বক্তব্য পেশ করতে শুরু করবে তা কখনো হতে পারে না।

৮৫. এটা কাফেরদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত শেষ সতর্কবাণী। এর তাৎপর্য হলো, নবী (সা) বললেন আর তোমরা তা শুনে প্রত্যাখ্যান করলে কথা এখানেই শেষ হয়ে যাবে না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তার সবই আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে এবং সবশেষে কার কি পরিণাম হবে সে চূড়ান্ত ফায়সালা তার দরবার থেকেই হবে।

আয্ যুখরুফ

৪৩

নামকরণ

সূরার ৮৫ আয়াতের وَزُخْرُفًا শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে زُخْرُف 'যুখরুফ' শব্দ আছে এটা সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে নাযিল হওয়ার সময়–কাল সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, যে যুগে সূরা আল–মু'মিন, হা–মীম আস সাজদা ও আশ্ শূরা নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও সেই যুগেই নাযিল হয়। মক্কার কাফেররা যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ সংহার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো সেই সময় যে সূরাগুলো নাযিল হয়েছিলো এ সূরাটিও তারই একটি বলে মনে হয়। সেই সময় মক্কার কাফেররা সভায় বসে বসে নবীকে (সা) কিভাবে হত্যা করা যায় তা নিয়ে পরামর্শ করতো। তাঁকে হত্যা করার জন্য একটি আক্রমণ সংঘটিতও হয়েছিলো। ৭৯ ও ৮০ আয়াতে এ পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত রয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মুল বক্তব্য

কুরাইশ ও আরববাসীরা যেসব জাহেলী আকীদা–বিশ্বাস ও কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে চলছিলো এ সূরায় প্রবলভাবে তার সমালোচনা করা হয়েছে এবং অত্যন্ত মজবুত ও হৃদয়গ্রাহী পন্থায় ঐগুলোর অযৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে যাতে সমাজের যেসব ব্যক্তির মধ্যে কিঞ্চিত যুক্তিবাদিতাও আছে তারা সবাই একথা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, এসব কেমন ধরনের অজ্ঞতা যা আমাদের জাতি চরমভাবে আঁকড়ে ধরে বসে আছে আর যে ব্যক্তি এই আবর্ত থেকে আমাদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন আদাপানি খেয়ে তার বিরুদ্ধে লেগেছে।

বক্তব্যের সূচনা করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা চাচ্ছো তোমাদের দুষ্কর্মের ফলে এই কিতাব নাযিল হওয়া বন্ধ করে দেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ দুষ্কৃতিকারীদের কারণে কখনো নবী–রসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল বন্ধ করেননি। বরং যে জালেমরা তাঁর হিদায়াতের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলো তাদেরকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখনো তিনি তাই করবেন। পরে আরো একটু অগ্রসর হয়ে আয়াত ৪১, ৪৩ ও ৭৯, ৮০তে এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ সংহার করতে বদ্ধপরিকর ছিল তাদের শুনিয়ে নবীকে (সা) বলা হয়েছে, 'তুমি জীবিত থাক বা না

থাক এ জালেমদের আমি শাস্তি দেবই। তাছাড়া দুষ্কৃতিকারীদেরকেও পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি আমার নবীর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাক তাহলে আমিও সে ক্ষেত্রে একটি চরম পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

এরপর যে ধর্মকে তারা বুকে আঁকড়ে ধরে আছে তা–কি সে সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং যেসব যুক্তি–প্রমাণ দেখিয়ে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

এরা নিজেরাও স্বীকার করে যে, আল্লাহই যমীন, আসমান এবং এদের নিজেদের ও এদের উপাস্যদের সৃষ্টিকর্তা। এরা একথাও জানে এবং বিশ্বাস করে যে, যে নিয়ামত রাজি থেকে তারা উপকৃত হচ্ছে তা সবই আল্লাহর দেয়া। তারপরও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করার ব্যাপারে গোঁ ধরে থাকে।

বান্দাদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে ঘোষণা করে তাও আবার মেয়ে সন্তান হিসেবে। অথচ নিজেদের জন্য মেয়ে সন্তানকে লজ্জা ও অপমান বলে মনে করে।

তারা ফেরেশতাদেরকে দেবী মনে করে নিয়েছে। নারীর আকৃতি দিয়ে তাদের মূর্তি নির্মাণ করে রেখেছে। তাদেরকে মেয়েদের কাপড় ও অলংকার পরিধান করায় এবং বলে, এরা সব আল্লাহর কন্যা সন্তান। তাদের ইবাদত করা হয়, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা হয় এবং তাদের কাছেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়। তারা একথা কি করে জানলো যে ফেরেশতারা নারী?

এসব অজ্ঞতার কারণে সমালোচনা করা হলে তাকদীরের বাহানা পেশ করে এবং বলে, আল্লাহ আমাদের এসব কাজ পসন্দ না করলে আমরা কি করে এসব মূর্তির পূজা করছি। অথচ আল্লাহর পসন্দ–অপসন্দ জানার মাধ্যম তাঁর কিতাব। পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছাধীনে যেসব কাজ হচ্ছে তা তাঁর পসন্দ অপসন্দ অবহিত হওয়ার মাধ্যম নয়। তাঁর ইচ্ছা বা অনুমোদনে শুধু এক মূর্তি পূজাই নয়, চুরি, ব্যভিচার, ডাকাতি, খুন সব কিছুই হচ্ছে। পৃথিবীতে যত অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে তার সবগুলোকেই কি এই যুক্তিতে বৈধ ও ন্যায় বলে আখ্যায়িত করা হবে?

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই শিরকের সপক্ষে তোমাদের কাছে এই ভ্রান্ত যুক্তি–প্রমাণ ছাড়া কি আর কোন প্রমাণ আছে তখন জবাব দেয়, বাপ–দাদার সময় থেকে তো এ কাজ এভাবেই হয়ে আসছে। এদের কাছে যেন কোন ধর্মের ন্যায় ও সত্য হওয়ার জন্য এই যুক্তি–প্রমাণই যথেষ্ট। অথচ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম—যার অধস্তন পুরুষ হওয়ার ওপরেই তাদের গর্ব ও মর্যাদার ভিত্তি—তাঁর বাপ–দাদার ধর্মকে পদাঘাত করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং পূর্ব পুরুষদের এমন অন্ধ অনুসরণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যার সপক্ষে কোন যুক্তিসংগত দলিল–প্রমাণ ছিল না। এসব সত্ত্বেও যদি তাদেরকে পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণই করতে হয় তাহলেও তো সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালামকে ছেড়ে এরা নিজেদের চরম জাহেল পূর্ব পুরুষদের বাছাই করলো কেন?

এদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহর সাথে অন্যরাও উপাসনা লাভের যোগ্য, কোন নবী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন একটি কিতাবও কি কখনো এ শিক্ষা দিয়েছে? এর জবাবে তারা খৃষ্টানদের হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামকে আল্লাহর বেটা হিসেবে মানার ও উপাসনা করাকে এ কাজের দলীল হিসেবে পেশ করে। অথচ কোন নবীর উম্মত শিরক করেছে বা করেনি প্রশ্ন সেটা ছিল না। প্রশ্ন ছিল কোন নবী শিরকের শিক্ষা দিয়েছেন কিনা? কবে ঈসা ইবনে মারয়াম বলেছিলেন, আমি আল্লাহর পুত্র, তোমরা আমার উপাসনা করো। দুনিয়ার প্রত্যেক নবী যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাও তাই ছিল। প্রত্যেক নবীর শিক্ষা ছিল আমাদের ও তোমাদের প্রত্যেকের রব আল্লাহ। তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে তাদের মনে দ্বিধা শুধু এ কারণে যে, তাঁর কাছে ধন–সম্পদ এবং ক্ষমতা ও জাঁকজমক তো মোটেই নেই। তারা বলে, আল্লাহ যদি আমাদের এখানে কাউকে নবী মনোনীত করতে চাইতেন তাহলে আমাদের দুটি বড় শহরের (মক্কা ও তায়েফ) গণ্য মান্য ব্যক্তিদের কাউকে মনোনীত করতেন। এই যুক্তিতে ফিরাউনও হযরত মূসাকে নগণ্য মনে করে বলেছিলো, আসমানের বাদশা যদি যমীনের বাদশার কাছে (আমার কাছে) কোন দূত পাঠাতেন তাহলে তাকে স্বর্ণের বালা পরিয়ে এবং তার আর্দালী হিসেবে একদল ফেরেশতাসহ পাঠাতেন। এ মিসকীন কোত্থেকে আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। আমিই মর্যাদার অধিকারী। কারণ, মিসরের বাদশাহী আমার এবং এই নীল নদ আমার আজ্ঞাধীনেই প্রবাহিত হচ্ছে। আমার তুলনায় এ ব্যক্তির এমন কি মর্যাদা আছে! এর না আছে ধন–সম্পদ না আছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।

এভাবে কাফেরদের এক একটি অজ্ঞতাপ্রসূত কথার সমালোচনা করা এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও সপ্রমাণ জবাব দেয়ার পর পরিষ্কার বলা হয়েছে, না আল্লাহর কোন সন্তানাদি আছে, না আসমান ও যমীনের আল্লাহ আলাদা, না এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে জেনে বুঝে গোমরাহীর পথ অনুসরণকারীদের আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহর সন্তানাদি থাকবে এমন অবস্থা থেকে তাঁর সত্তা পবিত্র। তিনি একাই গোটা বিশ্ব জাহানের খোদা। আর কেউ তাঁর খোদায়ীর গুণাবলী এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে শরীক নয়, বরং সবাই তাঁর বান্দা। তাঁর দরবারে শাফায়াত কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে নিজে ন্যায় ও সত্যপন্থী এবং তাদের জন্য করতে পারে যারা পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করেছিলো।

حٰمٓ ۝١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٣ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٤ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝٥ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ۝٦ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٧ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨

হা–মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। আমি একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো।[১] প্রকৃতপক্ষে এটা মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে[২] যা আমার কাছে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞানে ভরা কিতাব।[৩]

তোমরা সীমালংঘনকারী, শুধু এ কারণে কি আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উপদেশমূলক শিক্ষা পাঠানো পরিত্যাগ করবো?[৪] পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যেও আমি বার বার নবী পাঠিয়েছি। এমন কখনো ঘটেনি যে তাদের কাছে কোন নবী এসেছে। কিন্তু তাকে বিদ্রূপ করা হয়নি।[৫] যারা এদের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উদাহরণ অতীত হয়ে গিয়েছে।[৬]

১. যে বিষয়টির জন্য কুরআন মজীদের শপথ করা হয়েছে তা হচ্ছে এ গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন, 'আমি'। আর শপথ করার জন্য কুরআনের যে বৈশিষ্টটি বেছে নেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, 'কিতাবুম মুবীন'। কুরআন যে আল্লাহর বাণী এ বৈশিষ্টের জন্য কুরআনেরই শপথ করা স্বতই এ অর্থ প্রকাশ করে যে, হে লোকজন, এই সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের সামনে বিদ্যমান। চোখ মেলে তা দেখো; এর সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন

বিষয়বস্তু, এর ভাষা, এর সাহিত্য, এর সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী শিক্ষা, সব কিছুই এ সত্যের সাক্ষ্য পেশ করছে যে, আল্লাহ ছাড়া এর রচয়িতা আর কেউ হতে পারে না।

অতপর বলা হয়েছে, 'আমি একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা তা উপলব্ধি করো। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক—এ কুরআন অন্য কোন ভাষায় নয়, বরং তোমাদের নিজেদের ভাষায় রচিত হয়েছে। তাই এর যাচাই বাছাই এবং মর্যাদা ও মূল্য নির্ণয় করতে তোমাদের কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এটা যদি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় হতো তাহলে এই বলে তোমরা ওজর পেশ করতে পারতে যে, এটা আল্লাহর বাণী কিনা তা আমরা কিভাবে পরখ করবো। কারণ, এ বাণী বুঝতেই আমরা অক্ষম। কিন্তু আরবী ভাষার এই কুরআন সম্পর্কে তোমরা এ যুক্তি কি করে পেশ করবে? এর প্রতিটি শব্দ তোমাদের কাছে পরিষ্কার। ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয়দিক থেকে এর প্রতিটি বাক্য তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট। এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্য কোন আরবী ভাষাভাষীর বাণী হতে পারে কিনা তা নিজেরা বিচার করে দেখো। এই বাণীর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আমি এই কিতাবের ভাষা আরবী রেখেছি এই জন্য যে, আমি আরব জাতিকে সম্বোধন করে কথা বলছি। আর তারা কেবল আরবী ভাষার কুরআনই বুঝতে সক্ষম। আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করার এই সুস্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ উপেক্ষা করে শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতৃভাষা আরবী হওয়ার কারণে একে আল্লাহর বাণী না বলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বলে যারা আখ্যায়িত করে তারা বড়ই জুলুম করে। (এই দ্বিতীয় অর্থটি বুঝার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদার ৪৪ আয়াত ৫৪ নং টীকাসহ)।

২. ام للكتاب অর্থ اصل الكتاب অর্থাৎ সেই কিতাব যেখান থেকে সমস্ত নবী-রসূলদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহও গৃহীত হয়েছে। সূরা ওয়াকিয়ায় এ কিতাবকেই كِتَابٌ مَّكْنُوْنٌ (গোপন ও সুরক্ষিত কিতাব) বলা হয়েছে এবং সূরা বুরুজে এ জন্য 'লওহে মাহফুজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন ফলক যার লেখা মুছে যেতে পারে না এবং যা সবরকম প্রক্ষেপণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। কুরআন সম্পর্কে ام الكتاب এ লিপিবদ্ধ আছে একথা বলে একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে হিদায়াতের জন্য নবী-রসূলদের কাছে বিভিন্ন ভাষায় কিতাব নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু সব কিতাবে একই আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেয়া হয়েছে, একই সত্যকে ন্যায় ও সত্য বলা হয়েছে, ভাল ও মন্দের একই মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে, নৈতিকতা ও সভ্যতার একই নীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এসব কিতাব যে দীন পেশ করেছে তা সবদিক দিয়ে একই দীন। কারণ, এ দীনের মূল ও উৎস এক, শুধু ভাষা ও বর্ণনা ভংগি ভিন্ন। একই অর্থ যা আল্লাহর কাছে একটি মূল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তিনি কোন নবী পাঠিয়েছেন এবং পরিবেশ ও অবস্থা অনুসারে সেই অর্থ একটি বিশেষ বাক্যে ও বিশেষ ভাষায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ধরা যাক, আল্লাহ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরব ছাড়া অন্য কোন জাতির মধ্যে পয়দা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাহলে তিনি এই কুরআনকে সেই জাতির ভাষায় মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করতেন। সেই জাতি এবং দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারেই তাতে বক্তব্য পেশ করা হতো। বাক্যসমূহ ভিন্ন ধাঁচের হতো ভাষাও ভিন্ন হতো, কিন্তু শিক্ষা ও নির্দেশনা মৌলিকভাবে এটাই থাকতো। সেটাও এই কুরআনের মতই কুরআন হতো, যদিও আরবী কুরআন হতো না। সূরা শুআরাতে এই এ বিষয়টিই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ الْعٰلَمِيْنَ .... بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ (١٩٢-١٩٦)

"এটা রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত কিতাব.....পরিষ্কার আরবী ভাষায়। আর এটি পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবসমূহেও বিদ্যমান।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শু'আরা, টীকা ১১৯–১২১)

৩. এ আয়াতাংশের সম্পর্ক كتاب مبين ও ام الكتاب উভয়ের সাথে। অর্থাৎ এটি এক দিকে কুরআনের পরিচয় এবং অন্যদিকে উম্মুল কিতাবেরও পরিচয় যেখান থেকে কুরআন গৃহীত বা উদ্ধৃত হয়েছে। কুরআনের এই পরিচিতি দানের মাধ্যমে মন–মগজে একথাই বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য যে, কেউ যদি তার অজ্ঞতার কারণে এ কিতাবের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি না করে এবং এর জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত না হয় তাহলে সেটা তার নিজের দুর্ভাগ্য। কেউ যদি এর মর্যাদা খাটো করার প্রয়াস পায় এবং এর বক্তব্যের মধ্যে ত্রুটি অন্বেষণ করে তাহলে সেটা তার নিজের হীনমন্যতা। কেউ একে মর্যাদা না দিলেই এটা মূল্যহীন হতে পারে না এবং কেউ গোপন করতে চাইলেই এর জ্ঞান ও যুক্তি গোপন হতে পারে না। এটা স্বস্থানে একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব যাকে এর অতুলনীয় শিক্ষা, মু'জিযাপূর্ণ বাগ্মিতা, নিষ্কলুষ জ্ঞান এবং এর রচয়িতার আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব উচ্চে তুলে ধরেছে। তাই কেউ–এর অবমূল্যায়ণ করলে তা কি করে মূল্যহীন হতে পারে। পরে ৪৪ আয়াতে কুরাইশদের বিশেষভাবে এবং আরববাসীদের সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, এভাবে তোমরা যে কিতাবের বিরোধিতা করছো তার নাযিল হওয়াটা তোমাদের মর্যাদা লাভের একটি বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। তোমরা যদি এই সুযোগ হাতছাড়া করো তাহলে তোমাদের আল্লাহর কাছে কঠোর জবাবদিহি করতে হবে। (দেখুন, টীকা ৩৯)

৪. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ঘোষণার সময় থেকে এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়া পর্যন্ত বিগত কয়েক বছরে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার পুরো কাহিনী এই আয়াতাংশে একত্রে বিবৃত করা হয়েছে। আয়াতাংশটি আমাদের সামনে এই চিত্রই ফুটিয়ে তোলে যে, একটি জাতি শত শত বছর ধরে চরম অজ্ঞতা, অধপতন ও দুরবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে হঠাৎ তার ওপর করুণার দৃষ্টি পড়ছে। তিনি তাদের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ট নেতার জন্ম দিচ্ছেন এবং তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর নিজের বাণী পাঠাচ্ছেন। যাতে তারা অলসতা ঝেড়ে জেগে ওঠে, জাহেলী কুসংস্কারের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসে এবং পরম সত্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে জীবনে চলার সঠিক পথ অবলম্বন করে। কিন্তু সেই জাতির নির্বোধ লোকেরা এবং

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ
بَلْدَةً مَيْتًا كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا
نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ
عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

তোমরা যদি এসব লোকদের জিজ্ঞেস করো, যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, ঐগুলো সেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তা সৃষ্টি করেছেন।[৭] তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা বানিয়েছেন এবং সেখানে তোমাদের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন।[৮] যাতে তোমাদের গন্তব্যস্থলের পথ খুঁজে পাও।[৯] যিনি আসমান থেকে একটি বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন[১০] এবং তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করে তুলেছেন। তোমাদের এভাবেই একদিন মাটির ভেতর থেকে বের করে আনা হবে।[১১] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন।[১২] যিনি তোমাদের জন্য নৌকা–জাহাজ এবং জীব–জন্তুকে সওয়ারী বানিয়েছেন যাতে তোমরা তার পিঠে আরোহণ করো এবং পিঠের ওপর বসার সময় তোমাদের রবের ইহসান স্মরণ করে বলো ঃ পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য এসব জিনিসকে অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে এদের আয়ত্বে আনার শক্তি আমাদের ছিল না।[১৩] এক দিন আমাদের রবের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।[১৪]

(এসব কিছু জানা এবং মানার পরেও) এসব লোক তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকেই কোন কোন বান্দাকে তাঁর অংশ বানিয়ে দিয়েছে।[১৫] প্রকৃত সত্য এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

তার স্বার্থপর গোত্রপতিরা সেই নেতার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগছে এবং তাঁকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। যতই বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে তাদের দুষ্কর্ম ততই বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে, তোমাদের এই অযোগ্যতার কারণে কি আমি তোমাদের সংস্কার ও সংশোধনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করবো? উপদেশ দানের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করবো? এবং শত শত বছর ধরে তোমরা যে অধপতনের মধ্যে পড়ে আছ সেই অধপতনের মধ্যেই পড়ে থাকতে দেব? তোমাদের কাছে আমার রহমতের দাবি কি এটাই হওয়া উচিত? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা এবং ন্যায় ও সত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বাতিলকে আঁকড়ে থাকা তোমাদের কেমন পরিণতির সম্মুখীন করবে?

৫. অর্থাৎ এই নিরর্থক ও অযৌক্তিক কাজকর্ম যদি নবী এবং কিতাব প্রেরণের পথে প্রতিবন্ধক হতো তাহলে কোন জাতির কাছে কোন নবী আসতো না এবং কোন কিতাবও পাঠানো হতো না।

৬. অর্থাৎ বিশিষ্ট লোকদের অযৌক্তিক আচরণের ফলে গোটা মানব জাতিকে নবুওয়াত ও কিতাবের পথ নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করা হবে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। বরং সর্বদাই এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যারাই বাতিল পরস্তির নেশায় এবং নিজেদের শক্তির গর্বে উন্মত্ত হয়ে নবী–রসূলদের বিদ্রূপ ও হেয়প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত হয়নি, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তখন যে শক্তির বলে এই কুরাইশদের ছোট ছোট এসব নেতা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে। তাদের চেয়ে হাজার গুণ অধিক শক্তির অধিকারীদেরকে মশামাছির ন্যায় পিষে ফেলা হয়েছে।

৭. অন্যান্য স্থানে তো পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তার পরিবর্তে দোলনা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি শিশু যেভাবে তার দোলনার মধ্যে আরামে শুয়ে থাকে মহাশূন্যে ভাসমান এই বিশাল গ্রহকে তোমাদের জন্য তেমনি আরামের জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন। এটি তার অক্ষের ওপর প্রতি ঘন্টায় এক হাজার মাইল গতিতে ঘুরছে এবং প্রতি ঘন্টায় ৬৬,৬০০ মাইল গতিতে ছুটে চলছে। এর অভ্যন্তরে রয়েছে এমন আগুন যা পাথরকেও গলিয়ে দেয় এবং আগ্নেয় গিরির আকারে লাভা উদগীরণ করে কখনো কখনো তোমাদেরও তার ভয়াবহতা টের পাইয়ে দেয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তোমাদের স্রষ্টা তাকে এতটা সুশান্ত বানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আরামে তার ওপর ঘুমাও অথচ ঝাঁকুনি পর্যন্ত অনুভব করো না। তোমরা তার ওপরে বসবাস করো কিন্তু অনুভব পর্যন্ত করতে পার না এটি মহাশূণ্যে ঝুলন্ত গ্রহ আর তোমরা তাতে পা ওপরে ও মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলছো। তোমরা এর পিঠের ওপরে আরামে ও নিরাপদে চলাফেরা করছো অথচ এ ধারণা পর্যন্ত তোমাদের নেই যে, তোমরা বন্দুকের গুলীর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়ীতে সওয়ার হয়ে আছো। বিনা দ্বিধায় তাকে খনন করছো, তার বুক চিরছো এবং নানাভাবে তার পেট থেকে রিযিক হাসিল করছো অথচ কখনো কখনো ভূমিকম্পের আকারে তার অতি সাধারণ কম্পনও তোমাদের জানিয়ে দেয় এটা কত ভয়ংকর দৈত্য যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুগত করে রেখেছেন (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৪–৭৫)।

৮. ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়ের মাঝে গিরিপথ এবং পাহাড়ী ও সমতল ভূমি অঞ্চলে নদী হচ্ছে সেই সব প্রাকৃতিক পথ যা আল্লাহ তৈরী করেছেন। এসব পথ ধরেই মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পর্বত শ্রেণীকে যদি কোন ফাঁক ছাড়া একেবারে নিশ্ছিদ্র প্রাচীরের মত করে দাঁড় করানো হতো এবং ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও কোন সমুদ্র, নদী-নালা না থাকতো তাহলে মানুষ যেখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলো সেখানেই আবদ্ধ হয়ে পড়তো। আল্লাহ আরো অনুগ্রহ করেছেন এই যে, তিনি গোটা ভূ-ভাগকে একই রকম করে সৃষ্টি করেননি, বরং তাতে নানা রকমের এমন সব পার্থক্য সূচক চিহ্ন (Land marks) রেখে দিয়েছেন যার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন এলাকা চিনতে পারে এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। এটা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় যার সাহায্যে পৃথিবীতে মানুষের চলাচল সহজ সাধ্য হয়েছে। মানুষের যখন বিশাল কোন মরুভূমিতে যাওয়ার সুযোগ হয়, যেখানে মাইলের পর মাইল এলাকায় কোন পার্থক্যসূচক চিহ্ন থাকে না। এবং মানুষ বুঝতে পারে না সে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌছেছে এবং সামনে কোন দিকে যেতে হবে তখন সে এই নিয়ামতের মর্যাদা বুঝতে পারে।

৯. এ আয়াতাংশ একই সাথে দুটি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি হচ্ছে, এসব প্রাকৃতিক রাস্তা ও রাস্তার চিহ্নসমূহের সাহায্যে তোমরা তোমাদের পথ চিনে নিতে পার এবং যেখানে যেতে চাও সেখানে পৌছতে পার। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, মহিমান্বিত আল্লাহর এসব কারিগরি দেখে হিদায়াত লাভ করতে পার। প্রকৃত সত্য লাভ করতে পার এবং বুঝতে পার যে, পৃথিবীতে আপনা থেকেই এ ব্যবস্থা হয়ে যায়নি, বহু সংখ্যক খোদা মিলেও এ ব্যবস্থা করেনি, বরং মহাজ্ঞানী এক পালনকর্তা আছেন যিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাহাড় ও সমতল ভূমিতে এসব রাস্তা বানিয়েছেন এবং পৃথিবীর একেকটি অঞ্চলকে অসংখ্য পন্থায় ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দান করেছেন যার সাহায্যে মানুষ এক অঞ্চলকে আরেক অঞ্চল থেকে আলাদা করে চিনতে পারে।

১০. অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য বৃষ্টির একটা গড় পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন যা দীর্ঘকাল প্রতি বছর একইভাবে চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে এমন কোন অনিয়ম নেই যে কখনো বছরে দুই ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হবে আবার কখনো দুইশ' ইঞ্চি হবে। তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন মওসুমের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে এমনভাবে বর্ষণ করেন সাধারণত তা ব্যাপক মাত্রায় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার জন্য উপকারী হয়। এটাও তাঁর জ্ঞান ও কৌশলেরই অংশ যে, তিনি ভূ-পৃষ্ঠের কিছু অংশকে প্রায় পুরোপুরিই বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে পানি ও লতাগুল্ম শূন্য মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছেন এবং অপর কিছু অঞ্চলে কখনো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেন আবার কখনো ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যাতে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন বসতি এলাকার জন্য বৃষ্টিপাত ও তা নিয়মিত হওয়া কত বড় নিয়ামত। তাছাড়া একথাও যেন তার স্মরণ থাকে যে, এই ব্যবস্থা অন্য কোন শক্তির নির্দেশনা মোতাবেক চলছে যার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কিছুই কার্যকরী হয় না। একটি দেশে বৃষ্টিপাতের যে সাধারণ গড় তা পরিবর্তন কিংবা পৃথিবীর ব্যাপক এলাকায় তার বন্টন হারে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা, অথবা কোন আগমনোদ্যত তুফানকে রোধ করতে পারা বা কোন বিমুখ বৃষ্টিকে খাতির তোয়াজ করে নিজ দেশের দিকে টেনে আনা এবং বর্ষণে বাধ্য করার সাধ্য কারোর নেই। আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর, আয়াত ১৯ থেকে ২২ টীকাসহ, আল মু'মিনূন, টীকা ১৭, ১৮)।

১১. এখানে পানির সাহায্যে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টিকে এক সাথে দুটি জিনিসের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এক—এ কাজটি যিনি এক মাত্র আল্লাহ তাঁর জ্ঞান ও কুদরত দ্বারা হচ্ছে। আল্লাহর এই সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্য কেহ তাঁর শরীক নয়। দুই—মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন হতে পারে এবং হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ৫৩(কে); আল হাজ্জ, টীকা ৭৯; আন নামল টীকা ৭৩; আর রূম; টীকা ২৫, ৩৪ ও ৩৫; সূরা ফাতের, টীকা ১৯, সূরা ইয়াসীন, টীকা ২৯)।

১২. জোড়া অর্থ শুধু মানব জাতির নারী ও পুরুষ এবং জীব-জন্তু ও উদ্ভিদরাজীর নারী-পুরুষে জোড়াই বুঝানো হয়নি, বরং আল্লাহর সৃষ্ট আরো অসংখ্য জিনিসের জোড়া সৃষ্টির বিষয়ও বুঝানো হয়েছে যাদের পারস্পরিক সংমিশ্রণে পৃথিবীতে নতুন নতুন জিনিসের উৎপত্তি হয়। যেমন ঃ উপাদানসমূহের মধ্যে কোনটি কোনটির সাথে খাপ খায় এবং কোনটি কোনটির সাথে খাপ খায় না। যেগুলো পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণ ঘটে সেগুলোর মিশ্রণে নানা রকম বস্তুর উদ্ভব ঘটছে। যেমন বিদ্যুত শক্তির মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিদ্যুৎ একটি আরেকটির জোড়া। এ দুটির পারস্পরিক আকর্ষণ পৃথিবীতে বিস্ময়কর ও অদ্ভুত সব ক্রিয়াকাণ্ডের কারণ হচ্ছে। এটি এবং এ ধরনের আরো অগণিত জোড়া যা আল্লাহ নানা ধরনের সৃষ্টির মধ্যে পয়দা করেছেন, এদের আকৃতি কাঠামো, এদের পারস্পরিক যোগ্যতা, এদের পারস্পরিক আচরণের বিচিত্র রূপ এবং এদের পারস্পরিক সংযুক্তি থেকে সৃষ্ট ফলাফল নিয়ে যদি মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তার মন এ সাক্ষ্য না দিয়ে পারবে না যে, এই গোটা বিশ্ব কারখানা কোন একজন মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানবান কারিগরের তৈরী এবং তাঁরই ব্যবস্থাপনায় এটি চলছে। এর মধ্যে একাধিক খোদার অধিকার থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই।

১৩. অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ শুধু মানুষকে নৌকা ও জাহাজ চালনা এবং সওয়ারীর জন্য সওয়ারী জন্তু ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু সে ক্ষমতা তিনি এ জন্য দেননি যে, মানুষ খাদ্যের বস্তার মত এগুলোর পিঠে চেপে বসবে এবং যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন তিনি কে তা চিন্তা করবে না। অনুরূপ তিনি আমাদের জন্য বিশাল সমুদ্রে জাহাজ চালনা সম্ভব করেছেন এবং অসংখ্য রকমের জীব-জন্তুর মধ্যে এমন কিছু জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন যেগুলো আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অধীন হয়ে থাকে। আমরা তাদের পিঠে আরোহণ করে যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যাই। যিনি আমাদের এ ক্ষমতা দান করেছেন তিনি কে তা একবারও ভেবে দেখবো না সে জন্য তিনি এসব দেননি। এসব নিয়ামত থেকে উপকৃত হওয়া কিন্তু নিয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়া মৃত হৃদয়-মন ও অনুভূতিহীন বিবেক-বুদ্ধির আলামত। একটি জীবন্ত ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রবণ মন ও বিবেক সম্পন্ন মানুষ যখনই এসব সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করবে তখনই তার হৃদয়-মন নিয়ামতের উপলব্ধি ও কৃতজ্ঞতার আবেগে ভরে উঠবে। সে বলে উঠবে, পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমার জন্য এসব জিনিস অনুগত করে দিয়েছেন। পবিত্র এই অর্থে যে, তাঁর সত্তার গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে অন্য কেউ শরীক নয়। নিজের খোদায়ীর ক্রিয়াকাণ্ড চালাতে তিনি অক্ষম তাই অন্যান্য সাহায্যকারী খোদার প্রয়োজন পড়ে—এই দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবো, এ অবস্থা থেকেও তিনি পবিত্র।

সওয়ারী পিঠে বসার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যেসব কথা উচ্চারিত হতো সেগুলোই এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের সর্বোত্তম বাস্তব ব্যাখ্যা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় নবী (সা) যখন সওয়ারীতে বসতেন তখন তিনবার আল্লাহু আকবর বলতেন। তারপর এই আয়াতটি পড়ার পর এই বলে দোয়া করতেন ঃ

اللهم انى اسئالك فى سفرى هذا البر والتقوى ، ومن العمل ماترضى ، اللهم هون لنا السفر ، واطولنا البعيد ، اللهم انت الصاحب فى السفر ، والخليفة فى الاهل – اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى اهلنا (مسند احمد ، مسلم ، ابو داود ، نسائى ، دارمى ترمذى)

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার এই সফরে আমাকে নেকী, তাকওয়া এবং এমন কাজ করার তাওফীক দান করো যা তোমার পসন্দ। হে আল্লাহ, আমার জন্য সফরকে সহজ এবং দীর্ঘ পথকে সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ তুমিই আমার সফরের সাথী ও আমার অবর্তমানে আমার পরিবার পরিজনের রক্ষক। হে আল্লাহ, সফরে আমাদের সংগী হও এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে পরিবার পরিজনের তত্বাবধান করো।"

হযরত আলী বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে রিকাবে পা রাখলেন এবং সওয়ার হওয়ার পর বললেন ঃ الحمد لله ، سبحان الذى سخرلنا هذا .... তারপর তিনবার الحمد لله ও তিনবার الله اكبر বললেন এবং তারপর বললেন ঃ

سبحانك ، لا اله الا انت ، قد ظلمت نفسى فاغفرلى

"তুমি অতি পবিত্র। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

এরপর তিনি হেসে ফেললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি কারণে হাসলেন। তিনি বললেন, বান্দা رَبِّ اغْفِرْلِىْ (হে রব, আমাকে ক্ষমা করে দাও) বললে আল্লাহর কাছে তা বড়ই পসন্দনীয় হয়। তিনি বলেনঃ আমার এই বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া রক্ষাকারী আর কেউ নেই। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি।)

আবু মিজলায নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, 'একবার আমি সওয়ারী জন্তুর পিঠে উঠে سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا আয়াতটি পড়লাম। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ তোমাদের কি এরূপ করতে বলা হয়েছে! আমি বললাম ঃ তা হলে আমরা কি বলবো? তিনি বললেন ঃ এভাবে বলো ঃ সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন। তার শোকর যে, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর শোকর যে, তিনি তাঁর

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَٰئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। অথচ অবস্থা এই যে, এসব লোক সেই দয়াময় আল্লাহর সাথে যে ধরনের সন্তানকে সম্পর্কিত করে এদের নিজেদের কাউকে যদি সেই সন্তানের জন্মলাভের সুসংবাদ দেয়া হয় তাহলে তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায় এবং মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।[১৬] আল্লাহর ভাগে কি সেই সব সন্তান যারা অলঙ্কারাদির মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং বিতর্ক ও যুক্তি পেশের ক্ষেত্রে নিজের লক্ষ্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট করতেও পারে না?[১৭]

এরা ফেরেশতাদেরকে—যারা দয়াময় আল্লাহর খাস বান্দা[১৮] স্ত্রীলোক গণ্য করেছে। এরা কি তাদের দৈহিক গঠন দেখেছে?[১৯] এদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে নেয়া হবে এবং সে জন্য এদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

মাখলুকের জন্য সৃষ্ট সর্বোত্তম উম্মতের মধ্যে শামিল করেছেন। তারপর এ আয়াত পাঠ করো (ইবনে জারীর, আহকামুল কুরআন–জাসসাস)।

১৪. অর্থাৎ প্রতিটি সফরে যাওয়ার সময় স্মরণ করো যে, সামনে আরো একটি বড় সফর আছে এবং সেটিই শেষ সফর। তাছাড়া প্রত্যেকটি সওয়ারী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাও যেহেতু থাকে যে, হয়তো বা কোন দুর্ঘটনা এ সফরকেই তার শেষ সফর বানিয়ে দেবে। তাই উত্তম হচ্ছে, প্রত্যেকবারই সে তার রবের কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে স্মরণ করে যাত্রা করবে। যাতে মরতে হলেও একেবারে অবচেতনার মৃত্যু যেন না হয়।

এখানে কিছুক্ষণ থেমে এই শিক্ষার নৈতিক ফলাফল ও কিছুটা অনুমান করুন। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, ব্যক্তি কোন সওয়ারীতে আরোহণের সময় জেনে বুঝে পূর্ণ অনুভূতির সাথে এভাবে আল্লাহকে এবং তাঁর কাছে নিজের ফিরে যাওয়া ও জবাবদিহি করার কথা স্মরণ করে যাত্রা করে সে কি অগ্রসর হয়ে কোন পাপাচার অথবা জুলুম নির্যাতনে জড়িত হবে? কোন চরিত্রহীনার সাথে সাক্ষাতের জন্য, কিংবা কোন ক্লাবে মদ্য পান বা জুয়াখেলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ও কি কোন মানুষের মুখ থেকে একথা

উচ্চারিত হতে পারে অথবা সে তা ভাবতে পারে? কোন শাসক কিংবা কোন সরকারী কর্মচারী অথবা ব্যবসায়ী যে মনে মনে এসব কথা ভেবে এবং মুখে উচ্চারণ করে বাড়ী থেকে বের হলো সেকি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে মানুষের হক নষ্ট করতে পারে? কোন সৈনিক নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত ঘটানো এবং দুর্বলদের স্বাধীনতা নস্যাত করার উদ্দেশ্যে যাত্রার সময়ও কি তার বিমানে আরোহণ কিংবা ট্যাংককে পা রাখতে গিয়ে মুখে একথা উচ্চারণ করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে এই একটি মাত্র জিনিস গোনাহর কাজের প্রতিটি তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট।

১৫. অংশ বানিয়ে দেয়ার অর্থ আল্লাহর কোন বান্দাকে তাঁর সন্তান ঘোষণা করা। কেননা সন্তান অনিবার্যরূপেই পিতার স্বগোত্রীয় এবং তার অস্তিত্বের একটি অংশ। তাই কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর কন্যা বা পুত্র বলার অর্থ এই যে, তাকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তায় শরীক করা হচ্ছে। এছাড়াও কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর অংশ বানানোর আরেকটি রূপ হচ্ছে, যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ার শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট সেই সব গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারে তাকেও শরীক করা এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তার কাছে প্রার্থনা করা, কিংবা তার সামনে ইবাদত–বন্দেগীর অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা, অথবা তার ঘোষিত হালাল ও হারামকে অবশ্য পালনীয় শরীয়ত মনে করে নেয়া। কারণ, ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে 'উলূহিয়াত' ও 'রবুবিয়াত'কে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে ভাগ করে দেয় এবং তার একটা অংশ বান্দার হাতে তুলে দেয়।

১৬. এখানে আরবের মুশরিকদের বক্তব্যের অযৌক্তিকতাকে একেবারে উলংগ করে দেয়া হয়েছে। তারা বলতো : ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। তারা মেয়েদের আকৃতি দিয়ে ফেরেশতাদের মূর্তি বানিয়ে রেখেছিলো। এগুলোই ছিলো তাদের দেবী। তাদের পূজা করা হতো। এ কারণে আল্লাহ বলছেন : প্রথমত, যমীন ও আসমানের স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই তোমাদের জন্য এ যমীনকে দোলনা বানিয়েছেন। তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তোমাদের উপকারার্থে তিনিই এসব জীব–জন্তু সৃষ্টি করেছেন, একথা জানা এবং মানা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো। অথচ তোমরা যাদের উপাস্য বানাচ্ছো তারা আল্লাহ নয়, বান্দা। এ ছাড়াও আরো সর্বনাশ করেছে এভাবে যে, কোন কোন বান্দাকে শুধু গুণাবলীতে নয়, আল্লাহর আপন সত্তায়ও শরীক করে ফেলেছে এবং এই আকীদা তৈরী করে নিয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তান। তোমরা এ পর্যন্ত এসেই থেমে থাকোনি, বরং আল্লাহর জন্য এমন সন্তান স্থির করেছো যাকে তোমরা নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা মনে করো। কন্যা সন্তান জন্মলাভ করলে তোমাদের মুখ কালো হয়ে যায়। বড় দুঃখভারাক্রান্ত মনে তা মেনে নাও। এমন কি কোন কোন সময় জীবিত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলো। এ ধরনের সন্তান রেখেছো আল্লাহর ভাগে। আর তোমাদের কাছে যে পুত্র সন্তান অহংকারের বস্তু তা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে? এরপরও তোমরা দাবী করো, 'আমরা আল্লাহকে মেনে চলি।'

১৭. অন্য কথায় যারা কোমল, নাজুক ও দুর্বল সন্তান তাদের রেখেছো আল্লাহর অংশে। আর যারা বুক টান করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত সন্তান তাদের রেখেছো নিজের অংশে।

এ আয়াত থেকে নারীদের গহনা ও অলংকারাদি ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কারণ আল্লাহ তাদের জন্য গহনা ও অলংকারকে একটি প্রকৃতিগত জিনিস বলে

আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসসমূহ থেকেও একথাটিই প্রমাণিত হয়। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতে রেশম ও অপর হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন ঃ এ দুটি জিনিসকে পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত আবু মূসা আশআরীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ রেশম ও স্বর্ণের ব্যবহার আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষেদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আল্লামা আবু বকর জাসসাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নীচের বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত আয়েশা বলেন, একবার যায়েদ ইবনে হারেসার ছেলে উসামা ইবনে যায়েদ আঘাত প্রাপ্ত হন এবং রক্ত ঝরতে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের সন্তানের মত ভালোবাসতেন। তিনি তার রক্ত চুষে থুথু করে ফেলছিলেন এবং তাকে এই বলে সোহাগ করছিলেন যে, উসামা যদি মেয়ে হতো আমি তাকে অলংকার পরাতাম। উসামা যদি মেয়ে হতো আমি তাকে ভালভাল কাপড় পরাতাম।

হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

ليس الحرير والذهب حرام على ذكور امتى وحلال لاناثها

"রেশমী কাপড় এবং স্বর্ণের অলংকার পরিধান আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল।"

হযরত আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, একবার দুজন মহিলা নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলো। তারা স্বর্ণের গহনা পরিহিত ছিল। তিনি তাদের বললেন ঃ এর কারণে আল্লাহ তোমাদের আগুনের চুড়ি পরিধান করান তা কি তোমরা চাও? তারা বললো, না। নবী (সা) বললেন, তাহলে এগুলোর হক আদায় করো অর্থাৎ এর যাকাত দাও।

হযরত আয়েশার উক্তি হচ্ছে, যাকাত আদায় করা হলে অলংকার পরিধানে কোন দোষ নেই।

হযরত উমর (রা) হযরত আবু মূসা আশআরীকে লিখেছিলেন তোমার শাসন কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে যেসব মুসলিম মহিলা আছে তাদেরকে তাদের অলংকারাদির যাকাত দেবার নির্দেশ দাও।

আমর ইবনে দীনারের বরাত দিয়ে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা তাঁর বোনদের এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর মেয়েদেরকে স্বর্ণের অলংকার পরিয়েছিলেন।

এসব বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর আল্লামা জাসসাস লিখছেন ঃ নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হালাল হওয়ার সপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব হাদীস আছে সেগুলো নাজায়েয হওয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ থেকে অধিক মশহুর ও সুস্পষ্ট। উপরোল্লেখিত আয়াতও জায়েয হওয়াই প্রমাণ করছে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের যুগ থেকে আমাদের যুগ (অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ যুগ) পর্যন্ত গোটা উম্মতের কার্যধারাও তাই আছে। এ ব্যাপারে কেউ কোন আপত্তি উত্থাপন

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿২০﴾ أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿২১﴾ بَلْ قَالُوْٓا إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿২২﴾ وَكَذٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿২৩﴾ قٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۗ قَالُوْٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿২৪﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿২৫﴾

এরা বলে ঃ "দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন (যে আমরা তাদের ইবাদত না করি) তাহলে আমরা কখনো তাদের পূজা করতাম না।"[২০] এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এরা আদৌ জানে না, কেবলই অনুমানে কথা বলে। আমি কি এর আগে এদেরকে কোন কিতাব দিয়েছিলাম (নিজেদের এই ফেরেশতা পূজার সপক্ষে) এরা যার সনদ নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করছে?[২১] তা নয়, বরং এরা বলে, আমরা আমাদের বাপ–দাদাকে একটি পন্থার ওপর পেয়েছি, আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।[২২] এভাবে তোমার পূর্বে আমি যে জনপদেই কোন সতর্ককারীকে পাঠিয়েছি, তাদের স্বচ্ছল লোকেরা একথাই বলেছে, আমরা আমাদের বাপ–দাদাদেরকে একটি পন্থার অনুসরণ করতে দেখেছি। আমরাও তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।[২৩] প্রত্যেক নবীই তাদের বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাপ–দাদাদের যে পথে চলতে দেখেছো আমি যদি তোমাদের তার চেয়ে অধিক সঠিক রাস্তা বলে দেই তাহলেও কি তোমরা সেই পথেই চলতে থাকবে? তারা সব রসূলকে এই জবাবই দিয়েছে, যে দীনের দিকে আহবান জানানোর জন্য তুমি প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা অস্বীকার করি। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে মার দিয়েছি এবং দেখে নাও, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

করেনি। এ ধরনের মাসয়ালা সম্পর্কে "আখবারে আহাদের" ভিত্তিতে কোন আপত্তি গ্রহণ করা যেতে পারে না।

১৮. অর্থাৎ পুরুষ বা নারী কোনটাই নয়। বক্তব্যের ধরন থেকে আপনা আপনি এ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে।

১৯. আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে, "এরা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল?"

২০. নিজেদের গোমরাহীর ব্যাপারে এটা ছিল তাদের 'তাকদীর' থেকে প্রমাণ পেশ। এটা অন্যায়কারীদের চিরকালীন অভ্যাস। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, আল্লাহ আমাদের করতে দিয়েছেন বলেই তো ফেরেশতাদের ইবাদত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তিনি যদি না চাইতেন তাহলে আমরা কি করে এ কাজ করতে পারতাম? তাছাড়া দীর্ঘদিন থেকে আমাদের এখানে এ কাজ হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সে জন্য কোন আযাব নাযিল হয়নি। এর অর্থ, আমাদের এ কাজ আল্লাহর কাছে অপসন্দনীয় নয়।

২১. অর্থাৎ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এসব লোক মনে করে পৃথিবীতে যা হচ্ছে তা যেহেতু আল্লাহর অনুমোদনের অধীনে হচ্ছে, তাই এতে আল্লাহর সম্মতি বা স্বীকৃতি আছে। অথচ এ ধরনের যুক্তি যদি সঠিক হয় তাহলে পৃথিবীতে তো শুধু শিরকই হচ্ছে না, চুরি, ডাকাতি, খুন, ব্যভিচার, ঘুষ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে যেগুলোকে কোন ব্যক্তিই নেকী ও কল্যাণ মনে করে না। তাছাড়া এ ধরনের যুক্তি–প্রমাণের ভিত্তিতে কি একথাও বলা যাবে যে, এ কাজ সবই হালাল ও পবিত্র। কারণ, আল্লাহ তাঁর পৃথিবীতে এসব কাজ হতে দিচ্ছেন। আর তিনি যখন এসব হতে দিচ্ছেন তখন অবশ্যই তিনি এসব পসন্দ করেন? পৃথিবীতে যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলো আল্লাহর পসন্দ অপসন্দ জানার মাধ্যম নয়। বরং এ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, যা তাঁর রসূলের মাধ্যমে আসে। আল্লাহ কোন্ ধরনের আকীদা–বিশ্বাস, কাজকর্ম ও চরিত্র পসন্দ করেন এবং কোন্ ধরনের পসন্দ করেন না তা এই কিতাবে তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন। অতএব, এসব লোকের কাছে কুরআনের পূর্বে আগত এমন কোন কিতাব যদি বর্তমান থাকে যেখানে আল্লাহ বলেছেন, আমার সাথে ফেরেশতারাও তোমাদের উপাস্য, তাদের ইবাদত করাও তোমাদের উচিত, তাহলে এরা তার প্রমাণ দিক। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, টীকা ৭১, ৭৯, ৮০, ১১০, ১২২, ১২৫; আল আ'রাফ, টীকা ১৬; ইউনুস টীকা ১০১; হূদ, টীকা ১১৬; আর রা'দ, টীকা ৪৫; আন নাহল, টীকা ১০, ৩১, ৯৪; আয যুমার, টীকা ২০; আশ শূরা, টীকা১১)।

২২. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের কোন সনদ তাদের কাছে নেই। শুধু এই সনদই আছে যে বাপ–দাদা থেকে এরূপই হয়ে আসছে। তাই তাদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে আমরাও ফেরেশতাদের দেবী বানিয়ে নিয়েছি।

২৩. এটি অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয় যে, প্রত্যেক যুগে জাতির সচ্ছল শ্রেণীর লোকেরাই শুধু নবী–রসূলদের বিরুদ্ধে বাপ–দাদার অন্ধ অনুকরণের ঝাণ্ডাবাহী কেন হয়েছে? ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতায় এরাই অগ্রগামী হয়েছে, এরাই প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় তৎপর থেকেছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত ও

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٣٠﴾

৩ রুকূ'

স্মরণ করো সেই সময়টি যখন ইবরাহীম তার বাপ এবং কওমকে বলেছিলো[২৪] "তোমরা যাদের দাসত্ব করো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্ক শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।"[২৫] ইবরাহীম এ কথাটি[২৬] তার পেছনে তার সন্তানদের মধ্যেও রেখে গিয়েছিলো, যাতে তারা এ দিকে ফিরে আসে।[২৭] (এসব সত্ত্বেও যখন এরা অন্যদের দাসত্ব করতে শুরু করলো তখন আমি এদের ধ্বংস করে দিলাম আমি বরং এদের ও এদের বাপ–দাদাদেরকে জীবনোপকরণ দিতে থাকলাম এমনকি শেষ পর্যন্ত এদের কাছে ন্যায় ও সত্য এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল এসে গেল।[২৮] কিন্তু ন্যায় ও সত্য যখন এদের কাছে আসলো তখন এরা বললো ঃ এতো যাদু।[২৯] আমরা তা মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।

উত্তেজিত করে নবী–রসূলদের বিরুদ্ধে ফিতনা সৃষ্টি এরাই করে এসেছে এর কারণ কি? এর মূল কারণ ছিল দুটি। একটি হচ্ছে, সুখী ও সচ্ছল শ্রেণী আপন স্বার্থ উদ্ধার ও তা ভোগ করার নেশায় এমনই ডুবে থাকে যে, তাদের মতে তারা হক ও বাতিলের এই অপ্রাসংগিক বিতর্কে মাথা ঘামানোর জন্য প্রস্তুত থাকে না। তাদের আরাম প্রিয়তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা দীনের ব্যাপারে তাদেরকে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ এবং সাথে সাথে কার্যত রক্ষণশীল (Conservative) বানিয়ে দেয় যাতে প্রতিষ্ঠিত যে অবস্থা পূর্ব থেকেই চলে আসছে হক হোক বা বাতিল হোক—তাই যেন হুবহু প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কোন নতুন আদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করার কষ্ট না করতে হয়। অপরটি হচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সাথে তাদের স্বার্থ ওতপ্রোতোভাবে জড়িত থাকে। নবী–রসূল আলাইহিমুস সালামদের পেশকৃত আদর্শ দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই তারা বুঝে নেয় যে, এটা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মাতব্বরির পাটও চুকিয়ে দেবে এবং তাদের হারামখুরী ও হারাম কর্ম করার স্বাধীনতাও থাকবে না। (আরো ব্যখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ৯১; আল আ'রাফ, টীকা ৪৬, ৫৩, ৫৮, ৭৪, ৮৮, ৯২; হূদ টীকা ৩১, ৩২, ৪১; বানী ইসরাঈল, টীকা ৮১; আল মু'মিনূন, টীকা ২৬, ২৭, ৩৫, ৫৯; সূরা সাবা, আয়াত ৩৪, টীকা ৫৪)।

২৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১২৪ থেকে ১৩৩; আল আন'আম, টীকা ৫০ থেকে ৫৫; ইবরাহীম, টীকা ৪৬ থেকে ৫২; মারয়াম, টীকা ২৬ ও ২৭; আল আম্বিয়া, টীকা ৫৪ থেকে ৬৬; আশ্-শুআরা, টীকা ৫০ থেকে ৬২; আল আনকাবূত, টীকা ২৬ ও ৪৬; আস সাফফাত, আয়াত ৮৩ থেকে ১০০, টীকা ৪৪ থেকে ৫৫।

২৫. একথা দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ) শুধু তাঁর আকীদা বিশ্বাসই বর্ণনা করেননি, তার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণও পেশ করেছেন। অন্য সব উপাস্যদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কারণ হচ্ছে, না তারা সৃষ্টি করেছে, না কোন ব্যাপারে সঠিক পথনির্দেশনা দেয় বা দিতে পারে। শুধু লা-শরীক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার কারণ হচ্ছে, তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দেন এবং দিতে পারেন।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য হওয়ার অধিকারী নয়, একথাটা।

২৭. অর্থাৎ সঠিক পথ থেকে যখনই সামান্য একটু পদস্খলনও ঘটেছে এ বাণী তখনই তার পথনির্দেশনার জন্য সামনে রয়েছে। আর তারাও সেদিকেই ফিরে এসেছে। এখানে এ ঘটনাটি যে উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের অযৌক্তিকতাকে পুরোপুরি উলংগ করে দেয়া এবং একথা বলে তাদের লজ্জা দেয়া যে, তোমরা পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করে থাকলেও এ উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম পূর্ব-পুরুষদের বাদ দিয়ে নিজেদের জঘন্যতম পূর্ব-পুরুষদের বেছে নিয়েছো। আরবে যে কারণে কুরাইশদের পৌরোহিত্য চলছিলো তা হচ্ছে, তারা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের বংশধর এবং তাঁদের নির্মিত কা'বার তত্বাবধায়ক। তাই কুরাইশদের উচিত ছিল তাঁদের অনুসরণ করা। যারা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের পথ ছেড়ে আশে পাশের মূর্তি পূজারী জাতিসমূহের নিকট থেকে শিরকের শিক্ষা লাভ করেছিলো তাদের অনুসরণ কুরাইশদের জন্য সঠিক ছিল না। এই ঘটনা বর্ণনা করে আরো একটি দিক থেকেও এসব পথভ্রষ্ট লোকদের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে, হক ও বাতিল যাচাই বাছাই না করেই যদি চোখ বন্ধ করে বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ঠিক হতো তাহলে সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীমই এ কাজ করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর বা-দাদা ও কওমকে পরিষ্কার ভাষায় একথা বলে দিয়েছিলেন, আমি তোমাদের অজ্ঞতা প্রসূত ধর্মের অনুসরণ করতে পারি না যার বিধান অনুসারে তোমরা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে যারা স্রষ্টা নয় সেই সব সত্তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো। এ থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীম বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণের সমর্থক নন। বরং তাঁর নীতি ছিল বাপ-দাদার অনুসরণের পূর্বে ব্যক্তিকে চোখ খুলে দেখতে হবে তারা সঠিক পথে আছে কিনা। যদি যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা সঠিক পথে চলছে না তখন তাদের অনুসরণ বাদ দিয়ে যুক্তি অনুসারে যেটা ন্যায় ও সত্যের পথ সেটিই অনুসরণ করতে হবে।

২৮. মূল আয়াতে رسول مبين শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, এমন রসূল এসেছেন যার রসূল হওয়া সুস্পষ্ট ছিল, যার নবুওয়াত-পূর্ব জীবন ও নবুওয়াত পরবর্তী জীবন স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছিলো যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ
يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً
وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ
عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾
وَزُخْرُفًا ۚ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ
رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾

তারা বলে, দুটি শহরের বড় ব্যক্তিদের কারো ওপর এ কুরআন নাযিল করা হলো না কেন?[৩০] তোমার রবের রহমত কি এরা বন্টন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বন্টন করেছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের ওপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে।[৩১] (এদের নেতারা) যে সম্পদ অর্জন করছে তোমার রবের রহমত তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।[৩২] সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে যদি এই আশংকা না থাকতো তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরী করে আমি তাদের ঘরের ছাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে তারা তাদের বালাখানায় ওঠে সেই সিঁড়ি, দরজাসমূহ এবং যে সিংহাসনের ওপর তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে তা সবই রৌপ্য এবং স্বর্ণের বানিয়ে দিতাম।[৩৩] এগুলো তো শুধু পার্থিব জীবনের উপকরণ, তোমার রবের দরবারে আখেরাত শুধু মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।

২৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরাতুল আম্বিয়া, টীকা ৫ ও সূরা সোয়াদের ব্যাখ্যা, টীকা ৫।

৩০. দুটি শহর অর্থ মক্কা ও তায়েফ। কাফেররা বলতো সত্যিই যদি আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি সেই রসূলের কাছে তাঁর কিতাব নাযিল করতে

চাইতেন তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় মর্যাদার এই শহরগুলোর মধ্য থেকে কোন নামকরা লোককে বাছাই করতেন। আল্লাহ রসূল বানানোর জন্য পেলেন এমন ব্যক্তিকে যে ইয়াতীম হয়ে জন্মলাভ করেছে, যে কোন উত্তরাধিকার লাভ করেনি, যে বকরী চরিয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, যে এখন স্ত্রীর সম্পদ দিয়ে জীবন যাপনও করে, ব্যবসা–বাণিজ্য করে এবং যে কোন গোত্রের অধিপতি বা গোষ্ঠীর নেতা নয়। মক্কায় কি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ও 'উতবা ইবনে রাবীআর মত সম্মানিত ও নামযাদা লোক ছিল না? তায়েফে কি উরওয়া ইবনে মাসউদ, হাবীব ইবনে 'আমর, কিনানা ইবনে আবদে আমর এবং ইবনে আবদে ইয়ালীলের মত নেতারা ছিল না? এটা ছিল তাদের যুক্তি প্রমাণ। কোন মানুষ নবী হতে পারে প্রথমে তারা একথা মানতেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কুরআন মজীদে যখন একের পর এক যুক্তি–প্রমাণ দিয়ে তাদের এ ধারণা পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হলো এবং বলা হলো, ইতিপূর্বেও মানুষই সবসময় নবী হয়ে এসেছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারেন অন্য কেউ নয়। দুনিয়াতে রসূল হিসেবে যিনিই এসেছেন তিনি হঠাত আসমান থেকে নেমে আসেননি। মানুষের এসব জনপদেই তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, বাজারসমূহে চলাফেরা করতেন, সন্তানের পিতা ছিলেন এবং পানাহারের প্রয়োজন মুক্ত ছিলেন না। (দেখুন, আন–নাহল, আয়াত ৪৩, বানী ইসরাঈল ৯৪ ও ৯৫; ইউসুফ, ১০৯; আল ফুরকান, ৭ ও ২০; আল আম্বিয়া, ৭ ও ৮ এবং আর রা'দ ৩৮ আয়াত) তখন তারা কৌশল পরিবর্তন করে বললো, বেশতো, মানুষই রাসূল হয়েছেন তা ঠিক। কিন্তু তাকে তো কোন নামজাদা লোক হতে হবে। তিনি হবেন সম্পদশালী, প্রভাবশালী, বড় দলবলের অধিকারী এবং মানুষের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব থাকবে। সে জন্য মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি করে উপযুক্ত হতে পারেন?

৩১. এটা তাদের আপত্তির জবাব। এ জবাবের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো, তোমার রবের রহমত বন্টন করার দায়িত্ব তাদেরকে কবে দেয়া হলো? আল্লাহ তাঁর রহমত কাকে দান করবেন আর কাকে দান করবেন না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি তাদের কাজ? (এখানে রবের রহমত অর্থ তাঁর ব্যাপক রহমত। যে রহমত থেকে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ করে থাকে)।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, নবুওয়াত তো অনেক বড় জিনিস। পৃথিবীতে জীবন যাপন করার যে সাধারণ উপায়–উপকরণ আছে তার বন্টন ব্যবস্থাও আমি নিজের হাতেই রেখেছি, অন্য কারো হাতে তুলে দেইনি। আমি কাউকে সুশ্রী এবং কাউকে কুশ্রী, কাউকে সুকন্ঠের অধিকারী এবং কাউকে অপ্রিয় কন্ঠের অধিকারী, কাউকে শক্তিশালী–সুঠামদেহী এবং কাউকে দুর্বল, কাউকে মেধাবী এবং কাউকে মেধাহীন, কাউকে মজবুত স্মৃতি শক্তির অধিকারী এবং কাউকে স্মৃতিশক্তিহীন, কাউকে সুস্থ অঙ্গ–প্রত্যাঙ্গের অধিকারী, কাউকে বিকলাঙ্গ, অন্ধ অথবা বোবা, কাউকে আমীর পুত্র এবং কাউকে গরীবের পুত্র, কাউকে উন্নত জাতির সদস্য এবং কাউকে পরাধীন অথবা পশ্চাদপদ জাতির সদস্য হিসেবে সৃষ্টি করে থাকি। জন্মগত এই ভাগ্যের ব্যাপারে কেউ সামান্যতম কর্তৃত্বও খাটাতে পারে না। আমি যাকে যা বানিয়েছি সে তাই হতে বাধ্য এবং কারো তাকদীরের ওপর এই ভিন্ন ভিন্ন

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪ রুকূ'

যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ[৩৪] থেকে গাফিল থাকে আমি তার ওপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, সে তার বন্ধু হয়ে যায়। এ শয়তানরা এসব লোকদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা দেয়, কিন্তু এরা মনে করে আমরা ঠিক পথেই চলছি। অবশেষে যখন এ ব্যক্তি আমার কাছে পৌছবে তখন তার শয়তানকে বলবে ঃ "আহা, যদি আমার ও তোমার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হতো! তুমি তো জঘন্যতম সাথী প্রমাণিত হয়েছো।" সেই সময় এদের বলা হবে, তোমরা যখন জুলুম করেছো তখন আজ একথা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। তোমরা ও তোমাদের শয়তানরা সমানভাবে আযাব ভোগ করবে।[৩৫]

জন্মগত অবস্থার যে প্রভাবই পড়ে তা পাল্টে দেয়ার সাধ্য কারো নেই। তাছাড়া আমিই মানুষের মধ্যে রিযিক, ক্ষমতা, মর্যাদা, খ্যাতি, সম্পদ ও শাসন কর্তৃত্ব ইত্যাদি বন্টন করছি। যে আমার পক্ষ থেকে সৌভাগ্য লাভ করে কেউ তার মর্যাদাহানি করতে পারে না। আর আমার পক্ষ থেকে যার জন্য দুর্ভাগ্য ও অধপতন এসে যায় কেউ তাকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারে না। আমার সিদ্ধান্তের মোকাবিলায় মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও কৌশল কোন কাজেই আসে না। এই বিশ্ব জনীন খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব জাহানের অধিপতি কাকে তাঁর নবী বানাবেন আর কাকে বানাবেন না সে ব্যাপারে এসব লোক কি ফায়সালা করতে চায়?

তৃতীয় বিষয়টি হলো, এই খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় একজনকেই সব কিছু অথবা সবাইকে সব কিছু না দেয়ার চিরস্থায়ী একটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। চোখ মেলে দেখো, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বত্র সর্ব ক্ষেত্রে পার্থক্যই নজরে পড়বে। আমি কাউকে

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

হে নবী, তাহলে এখন কি তুমি বধিরদের শোনাবে? নাকি অন্ধ ও সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে থাকা লোকদের পথ দেখাবে?[৩৬] আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই কিংবা এদেরকে যে পরিণামের প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি তা তোমাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেই এখন তো আমার এদেরকে শাস্তি দিতে হবে। এদের বিরুদ্ধে আমি পূর্ণ ক্ষমতা রাখি।[৩৭] অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে সর্বাবস্থায় তুমি দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে থাকো নিশ্চয়ই তুমি সোজা পথে আছো।[৩৮] প্রকৃত সত্য হলো, এ কিতাব তোমার ও তোমার কওমের জন্য অনেক বড় একটি মর্যাদা এবং এ জন্য অচিরেই তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।[৩৯] তোমার পূর্বে আমি যত রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি উপাসনার জন্য রহমান খোদা ছাড়া আর কোন উপাস্য নির্দিষ্ট করেছিলাম কিনা?[৪০]

কোন জিনিস দিয়ে থাকলে আরেকটি জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করেছি। এবং সেটি অন্য কাউকে দিয়েছি। এমনটি করার ভিত্তি হলো কোন মানুষই যেন অন্য মানুষদের মুখাপেক্ষিতা মুক্ত না হয়। বরং কোন না কোন ব্যাপারে প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকে। যাকে আমি নেতৃত্ব ও প্রভাব–প্রতিপত্তি দান করেছি নবুওয়াতও তাকেই দিতে হবে এরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক ধ্যান–ধারণা তোমাদের মগজে ঢুকলো কি করে? অনুরূপ তোমরা কি একথাও বলবে যে, একজনের মধ্যেই বুদ্ধি, জ্ঞান, সম্পদ, সৌন্দর্য, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং অন্য সব পূর্ণতার সমাবেশ ঘটাতে হবে এবং যে একটি জিনিসও পায়নি তাকে অন্য কোন জিনিসই দিতে হবে না?

৩২. এখানে রবের রহমত অর্থ তাঁর বিশেষ রহমত, অর্থাৎ নবুওয়াত। এর সারমর্ম হলো, তোমরা নিজেদের যেসব নেতাকে তাদের সম্পদ, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মুরুব্বিয়ানার

কারণে বড় একটা কিছু মনে করছো তা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সম্পদ দেয়া হয়েছে তার সমপর্যায়ের নয়। এ সম্পদ ঐ সম্পদ থেকে অনেক গুণ বেশী উৎকৃষ্ট পর্যায়ের এবং তার উৎকৃষ্টতার মানদণ্ড অন্য কিছু। তোমরা যদি মনে করে থাকো, তোমাদের প্রত্যেক চৌধুরী আর শেঠই নবী হওয়ার উপযুক্ত তাহলে সেটা তোমাদের নিজেদের ধ্যান–ধারণার পশ্চাদপদতা। আল্লাহর কাছে এ ধরনের অজ্ঞতার আশা করো কেন?

৩৩. অর্থাৎ এই সোনা রূপা যা কারো লাভ করা তোমাদের দৃষ্টিতে চরম নিয়ামত প্রাপ্তি এবং সম্মান ও মর্যাদার চরম শিখরে আরোহণ, তা আল্লাহর দৃষ্টিতে এতই নগণ্য যে, যদি সমস্ত মানুষের কুফরীর প্রতি ঝুঁকে পড়ার আশংকা না থাকতো তাহলে তিনি প্রত্যেক কাফেরের বাড়ীঘর সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরী করে দিতেন। এই নিকৃষ্ট বস্তুটি কখন থেকে মানুষের মর্যাদা ও আত্মার পবিত্রতার প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে? এই সম্পদ তো এমন সব মানুষের কাছেও আছে যাদের ঘৃণ্য কাজ–কর্মের পংকিলতায় গোটা সমাজ পূতিগন্ধময় হয়ে যায়। আর একেই তোমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছো।

৩৪. ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। রহমানের 'যিকর' অর্থ তাঁর স্মরণ, তাঁর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বাণী এবং কুরআনও।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনাকারীরা শাস্তি পাচ্ছে এতে তোমাদের সান্তনা লাভের কিছুই নেই। কারণ, গোমরাহীর পথে চলার অপরাধে তোমরাও একই শাস্তি লাভ করতে যাচ্ছো।

৩৬. অর্থাৎ যারা শোনার জন্য প্রস্তুত এবং যারা প্রকৃত সত্যের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়নি তাদের প্রতি মনযোগ দাও এবং অন্ধদের দেখানো ও বধিরদের শুনানোর প্রয়াসে প্রাণপাত করো না। কিংবা তোমার এসব ভাই বেরাদর কেন সঠিক পথে আসে না এবং কেনই বা তারা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানাচ্ছে সেই দুঃখে নিজেই নিজেকে নিঃশেষ করো না।

৩৭. যে পরিস্থিতিতে একথা বলা হয়েছে তা সামনে রাখলেই এ কথার তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। মক্কার কাফেররা মনে করছিলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তাই তাদের জন্য বিপদ হয়ে আছে। মাঝ পথ থেকে এই কাঁটা সরিয়ে দিতে পারলেই তাদের সব কিছু সুন্দর ও ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন না কোনভাবে তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা রাত দিন বসে বসে পরামর্শ করতো। এতে আল্লাহ তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর নবীকে উদ্দেশ করে বলছেন ঃ তোমার বর্তমান থাকা না থাকায় কিছুই আসে যায় না। তুমি বেঁচে থাকলে তোমার চোখের সামনেই তাদের দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। আর যদি তোমাকে উঠিয়ে নেয়া হয় তাহলে তোমার বিদায়ের পরে তাদের দফারফা হবে। অশুভ কর্মফল এখন তাদের ভাগ্যের লিখন হয়ে গিয়েছে। এর হাত থেকে তাদের পক্ষে রক্ষা পাওয়া আর সম্ভব নয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

৫ রুকূ'

আমি[৪১] মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহসহ[৪২] ফেরাউন ও তার সভাসদদের কাছে পঠিয়েছিলাম। সে গিয়ে তাদের বলেছিলো : আমি বিশ্ব জাহানের রবের রসূল। অতপর সে যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনসমূহ পেশ করলো তখন তারা বিদ্রূপ করতে লাগলো। আমি তাদেরকে একের পর এক এমন সব নিদর্শন দেখাতে থাকলাম যা আগেরটার চেয়ে বড় হতো। আমি তাদেরকে আযাবের মধ্যে লিপ্ত করলাম যাতে তারা তাদের আচরণ থেকে বিরত থাকে।[৪৩]

৩৮. অর্থাৎ জুলুম ও বে-ঈমানীর সাহায্যে ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতাকারীরা তাদের এই কৃতকর্মের শাস্তি কখন এবং কি পায় তুমি সে চিন্তা করবে না। অথবা তোমার জীবদ্দশায় ইসলাম প্রসার লাভ করে কিংবা করে না, সে চিন্তাও তুমি করবে না। তোমার জন্য সান্তনা হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছ। অতএব, ফলাফলের চিন্তা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকো। আর আল্লাহ তোমার সামনেই বাতিলে মাথা অবনত করান না তোমার বিদায়ের পরে করান সেটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।

৩৯. অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকেই তাঁর কিতাব নাযিলের জন্য বাছাই করছেন এবং কোন জাতির জন্যও এর চেয়ে বড় কোন সৌভাগ্য কল্পনা করা যেতে পারে না যে, দুনিয়ার অন্য সব জাতিকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তাদের মধ্যেই তাঁর নবীকে সৃষ্টি করছেন, তাদের ভাষায় তাঁর কিতাব নাযিল করছেন এবং তাদেরকেই গোটা বিশ্বব্যাপী আল্লাহর বানীবাহক হওয়ার মহা সুযোগ দান করছেন যদি কুরাইশ ও আরববাসীদের এই বিরাট মর্যাদার উপলব্ধি না থেকে থাকে এবং যদি তারা তার অমর্যাদা করতে চায় তাহলে এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন এ জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

৪০. রসূলদের জিজ্ঞেস করার অর্থ তাঁদের আনীত কিতাবসমূহ থেকে জেনে নেয়া। যেমন فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ আয়াতাংশের অর্থ "যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের কাছে নিয়ে যাও নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে, সে ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের স্মরণাপন্ন হও। অনুরূপ রসূলদেরকে জিজ্ঞেস করার অর্থ, যে রসূলগণ দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন তাদের সবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো নয়, বরং এর সঠিক তাৎপর্য হলো

আল্লাহর রসূলগণ পৃথিবীতে যেসব শিক্ষা রেখে গিয়েছেন তার মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখো, মহান আল্লাহ ছাড়া আরো কেউ উপাসনা লাভের যোগ্য তা কেউ শিখিয়েছিলেন কি না।

৪১. এখানে এ ঘটনাটা তিনটি উদ্দেশ্যে বর্ণণা করা হয়েছে। এক—আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আরববাসীদের বর্তমানে একটি সুযোগ দান করেছেন। যখনই আল্লাহ কোন দেশ ও জাতির কাছে তাঁর নবী পাঠিয়ে তাদের এ ধরনের সুযোগ দান করেন কিন্তু সে জাতি তার মর্যাদা ও মূল্য দেয়া এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে ফিরাউন ও তার কওম যেমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছিলো তেমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করে বসে। তখন তারা এমন পরিণামের সম্মুখীন হয় যা ইতিহাসে শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে আছে। দুই—যেভাবে বর্তমানে মক্কার কুরাইশ গোত্রের কাফেররা তাদের নেতাদের তুলনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নগণ্য ও হেয় মনে করছে ফিরাউনও তার বাদশাহী, জাঁকজমক, প্রতিপত্তি এবং ধন-সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে ঠিক তেমনি নগণ্য ও হেয় মনে করেছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন রকম। এবং বাস্তবে হেয় ও নগণ্য কে ছিলো সেই ফায়সালাই শেষ পর্যন্ত তা বুঝিয়ে দিয়েছে। তিন—আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সাথে বিদ্রূপ করা এবং তাঁর সতর্ক বাণীসমূহের বিরুদ্ধে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করা কোন ছোটখাট ব্যাপার নয়, বরং অত্যন্ত চড়া মূল্য দাবি করার মত ব্যাপার। যারা এর পরিণাম ভোগ করেছে তাদের উদাহরণ থেকে যদি শিক্ষা গ্রহণ না করো তাহলে নিজেও একদিন সেই পরিণাম ভোগ করবে।

৪২. এর অর্থ প্রাথমিক যেসব নিদর্শন নিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের দরবারে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ লাঠি ও 'ইয়াদে বায়দা' বা আলোকোজ্জ্বল হাত(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৮৭ থেকে ৮৯; ত্বাহা, টীকা ১২, ১৩, ২৯, ৩০; আশ শুআরা, টীকা ২৬ থেকে ২৯; আন নামল, টীকা ১৬; আল কাসাস, টীকা ৪৪ ও ৪৫)।

৪৩. এসব নিদর্শন বলতে বুঝানো হয়েছে সেই নিদর্শনসমূহকে যা আল্লাহ পরবর্তীকালে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদের দেখিয়েছিলেন। নিদর্শনগুলো ছিল ঃ

এক ঃ জন সমক্ষে যাদুকরদের সাথে আল্লাহর নবীর মোকাবিলা হয় এবং তারা পরাজিত হয়ে ঈমান আনে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল 'আরাফ, টীকা ৮৮ থেকে ৯২; ত্বাহা, টীকা ৩০ থেকে ৫০ এবং আশ শুআরা, টীকা ২৯ থেকে ৪০।

দুই ঃ হযরত মূসার ভবিষ্যত বাণী অনুসারে মিসর দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয় এবং হযরত মূসার দোয়ার কারণেই তা দূরীভূত হয়

তিন ঃ তাঁর ভবিষ্যত বাণীর পর গোটা দেশে ভয়াবহ বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ বর্ষণসহ প্রবল ঝড়, তুফান আসে, যা জনপদ ও কৃষি ক্ষেত্র ধ্বংস করে ফেলে। এ বিপদও তাঁর দোয়াতেই কেটে যায়।

চার ঃ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গোটা দেশে পঙ্গপালের ভয়ানক আক্রমণ হয় এবং এ বিপদও ততক্ষণ পর্যন্ত দূরীভূত হয়নি যতক্ষণ না তিনি তা দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করেছেন।

পাঁচ ঃ তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী গোটা দেশে উকুন ও কীটাণু ছড়িয়ে পড়ে যার কারণে একদিকে মানুষ ও জীবজন্তু মারাত্মক কষ্টে পড়ে, অপর দিকে খাদ্য শস্যের গুদাম ধ্বংস হয়ে যায়। এ আযাব কেবল তখনই দূরীভূত হয় যখন কাকুতি-মিনতি করে হযরত মূসার দ্বারা দোয়া করানো হয়।

ছয় ঃ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পূর্ব-সতর্ক বাণী অনুসারে গোটা দেশের আনাচে কানাচে ব্যাঙের সয়লাব আসে যার ফলে গোটা জনপদের প্রায় দমবন্ধ হওয়ার মত অবস্থা হয়। আল্লাহর এই সৈনিকরাও হযরত মূসার দোয়া ছাড়া ফিরে যায়নি।

সাত ঃ ঠিক তাঁর ঘোষণা মোতাবেক রক্তের আযাব দেখা দেয়। যার ফলে সমস্ত নদীনালা, কূপ, ঝর্ণাসমূহ, দিঘী এবং হাউজের পানি রক্তে পরিণত হয়, মাছ মরে যায়, সর্বত্র পানির আধারে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং পুরো এক সপ্তাহ পর্যন্ত মিসরের মানুষ পরিষ্কার পানির জন্য তড়পাতে থাকে। এ বিপদও কেবল তখনই কেটে যায় যখন তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হযরত মূসাকে দিয়ে দোয়া করানো হয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ৯৪ থেকে ৯৬; আন নামল, টীকা ১৬ ও ১৭; আল মু'মিন, টীকা ৩৭।

বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২ অধ্যায়েও এ সব আযাবের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। তবে তা কল্পকাহিনী ও সত্যের সংমিশ্রণ মাত্র। সেখানে বলা হয়েছে যখন রক্তের আযাব এলো তখন যাদুকররাও অনুরূপ রক্ত তৈরী করে দেখালো। কিন্তু উকুনের আযাব আসলে জবাবে যাদুকররা উকুন সৃষ্টি করতে পারলো না। তারা বললো, এটা আল্লাহর কাজ। এর চেয়েও অধিক মজার ব্যাপার হলো, অসংখ্য ব্যাঙের সয়লাব সৃষ্টি হলে জবাবে যাদুকররাও ব্যাঙের সয়লাব আনলো এবং এরপরও ফেরাউন মূসার কাছেই আবেদন জানালো যে, আল্লাহর কাছে দোয়া করে এ আযাব দূর করিয়ে দিন। প্রশ্ন হচ্ছে, যাদুকররাও যেখানে ব্যাঙের সয়লাব আনতে সমর্থ ছিল সেখানে ফেরাউন যাদুকরদের দিয়েই এই আযাব দূর করিয়ে নিলো না কেন? তাছাড়া কোনগুলো যাদুকরদের ব্যাঙ আর কোনগুলো আল্লাহর ব্যাঙ তাই বা কি করে বুঝা গেল? রক্ত সম্পর্কেও এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত মূসার সাবধান বাণী অনুসারে যখন সব জায়গার পানির ভাণ্ডার রক্তে পরিণত হয়েছিলো তখন যাদুকররা কোন পানিকে রক্ত বানিয়েছিলো এবং কিভাবে বুঝা গেল অমুক জায়গার পানি যাদুকরদের যাদু বিদ্যা দ্বারা রক্তে পারিণত হয়েছে? এ ধরনের বক্তব্যের কারণে স্পষ্ট বুঝা যায়, বাইবেল আল্লাহর নির্ভেজাল বাণী সমাহার নয়। বরং যারা তা রচনা করেছে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে তার মধ্যে অনেক কিছু সংযোজিত করেছে। তবে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, ঐ সব রচয়িতারা ছিল নগণ্য জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক। কোন কথা সুন্দর করে রচনা করার যোগ্যতা পর্যন্ত তাদের ছিল না।

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ
قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ
أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا
يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ
سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

প্রত্যেক আযাবের সময় তারা বলতো, হে যাদুকর! তোমার রবের পক্ষ থেকে তুমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছো তার ভিত্তিতে আমাদের জন্য তাঁর কাছে দোয়া করো। আমরা অবশ্যই সঠিক পথে এসে যাবো। কিন্তু আমি যেই মাত্র তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দিতাম তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো।[৪৪] একদিন ফেরাউন তার কওমের মাঝে ঘোষণা করলো[৪৫] ঃ হে জনগণ, মিসরের বাদশাহী কি আমার নয় এবং এসব নদী কি আমার অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ না?[৪৬] আমিই উত্তম না এই ব্যক্তি যে হীন ও নগণ্য[৪৭] এবং নিজের বক্তব্যও স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে না।[৪৮] তার কাছে সোনার বালা কেন পাঠানো হলো না? অথবা তার আরদালী হিসেবে একদল ফেরেশতা কেন আসলো না?[৪৯]

সে তার জাতিকে হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক।[৫০] অবশেষে তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, তাদের সবাইকে এক সাথে ডুবিয়ে মারলাম বেং পরবর্তীদের জন্য অগ্রবর্তী ও শিক্ষণীয় উদাহরণ বানিয়ে দিলাম।[৫১]

৪৪. ফেরাউন ও তার কওমের নেতাদের হঠকারিতার মাত্রা পরিমাপ করা যায় এভাবে যে, যখন তারা আল্লাহর আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মূসাকে দিয়ে দোয়া করাতে চাইতো তখনও তারা তাঁকে নবী বলে সম্বোধন না করে যাদুকর বলেই সম্বোধন করতো। অথচ যাদুর তাৎপর্য তারা জানতো না, তা নয়। তাছাড়া একথাও তাদের কাছে গোপন ছিল না যে, এসব অদ্ভূত কর্মকাণ্ড কোন প্রকার যাদুর সাহায্যে সংঘটিত হতে পারে না। একজন যাদুকর বড় জোর যা করতে পারে তা হচ্ছে, একটি সীমিত পরিসরে যেসব মানুষ তার সামনে বর্তমান থাকে সে তাদের মন–মস্তিষ্কের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে তারা মনে করতে থাকে, পানি রক্তে পরিণত হয়েছে, অথবা ব্যাঙ উপছে পড়ছে কিংবা পঙ্গপালের ঝাঁক ক্রমে এগিয়ে আসছে। এই সীমিত পরিসরের মধ্যেও পানি বাস্তবিকই রক্তে পরিণত হবে না। বরং ঐ পরিসর থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই পানি পানিতে পরিণত হবে। বাস্তবে কোন ব্যাঙ সৃষ্টি হবে না। আপনি যদি সেটিকে ধরে ঐ গণ্ডির বাইরে নিয়ে যান তাহলে আপনার হাতে ব্যাঙের বদলে থাকবে শুধু বাতাস। পঙ্গপালের ঝাঁকও হবে শুধু মনের কল্পনা। তা কোন ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করতে পারবে না। এখন কথা হলো, একটা গোটা দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হওয়া, কিংবা সমগ্র দেশের নদী–নালা, ঝর্ণা এবং কূপসমূহ রক্তে পরিপূর্ণ হওয়া অথবা হাজার হাজার মাইল এলাকা জুড়ে পঙ্গপালের আক্রমণ হওয়া এবং লাখ লাখ একর জমির ফসল ধ্বংস করা। আজ পর্যন্ত কখনো কোন যাদুকর এ কাজ করতে সক্ষম হয়নি এবং যাদুর জোরে কখনো তা সম্ভবও নয়। কোন রাজা–বাদশাহর কাছে এমন কোন যাদুকর থাকলে তার সেনাবাহিনী রাখার এবং যুদ্ধের বিপদাপদ সহ্য করার প্রয়োজনই হতো না। যাদুর জোরেই সে গোটা দুনিয়াকে পদানত করতে পারতো। যাদুকরদের এমন শক্তি থাকলে তারা কি রাজা–বাদশাহদের অধীনে চাকরি করতো? তারা নিজেরাই কি বাদশাহ হয়ে বসতো না?

মুফাসসিরগণ এখানে সাধারণভাবে একটি জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন। অর্থাৎ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফেরাউন ও তার সভাসদরা হযরত মূসার কাছে যখন দোয়ার জন্য আবেদন করতো তখনো তারা তাঁকে 'হে যাদুকর' বলে সম্বোধন করতো কি করে? বিপদের সময় সাহায্য প্রার্থনাকারী তো তোষামোদ করে থাকে, নিন্দাবাদ নয়। এ কারণে তারা এই বলে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সে যুগে মিসরবাসীদের দৃষ্টিতে যাদু অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যা ছিল। 'হে যাদুকর' বলে তারা প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসার নিন্দাবাদ করতো না, বরং তাদের মতে যেন সম্মানের সাথে তাকে 'হে জ্ঞানী' বলে সম্বোধন করতো। কিন্তু এ ব্যাখ্যা পুরোপুরিই ভুল। কারণ কুরআনের অন্যান্য স্থানে যেখানেই ফেরাউন কর্তৃক মূসাকে যাদুকর এবং তাঁর পেশকৃত মু'জিযাসমূহকে যাদু বলে আখ্যায়িত করার কথা উদ্ধৃত হয়েছে সেখানেই নিন্দাবাদ ও হেয়ো প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং স্পষ্ট বুঝা গেছে, তাদের কাছে যাদু ছিল একটি মিথ্যা জিনিস। আর এ কারণেই তারা হযরত মূসার বিরুদ্ধে যাদুর অভিযোগ আরোপ করে তাঁকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলে আখ্যায়িত করতো। তাই এ ক্ষেত্রে 'যাদুকর' কথাটি হঠাত করে তাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত আলেম বা বিদ্বানের উপাধি হয়ে যাবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এখন প্রশ্ন হলো, দোয়ার জন্য আবেদন জানানোর সময়ও যখন তারা প্রকাশ্যে হযরত মূসার অমর্যাদা করতো তখন তিনি তাদের আবেদন গ্রহণই বা করতেন কেন? এর জবাব হচ্ছে,

হযরত মূসার লক্ষ্য ছিল আল্লাহর নির্দেশে ঐ সব লোকদের কাছে 'ইতমামে হুজ্জত' বা যুক্তি–প্রমাণের চূড়ান্ত করা। আযাব দূরীভূত করার জন্য তাঁর কাছে তাদের দোয়ার আবেদন করাই প্রমাণ করছিলো যে, আযাব কেন আসছে কোথা থেকে আসছে এবং কে তা দূর করতে পারে মনে মনে তারা তা উপলব্ধি করে ফেলেছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন তারা হঠকারিতা করে তাঁকে যাদুকর বলতো এবং আযাব কেটে যাওয়ার পর সঠিক পথ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো তখন মূলত তারা আল্লাহর নবীর কোন ক্ষতি করতো না। বরং নিজেদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাকে আরো বেশী জোরালো করে তুলতো। আর আল্লাহ তার ফায়সালা করে দিয়েছিলেন তাদের পুরোপুরি মূলোৎপাটন করার মাধ্যমে। তাঁকে তাদের যাদুকর বলার অর্থ এ নয় যে, তারা সত্যিই মন থেকেও বিশ্বাস করতো, তাদের ওপর যেসব আযাব আসছে তা যাদুর জোরেই আসছে। তারা মনে মনে ঠিকই উপলব্ধি করতো যে এগুলো সবই বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর নিদর্শন। কিন্তু জেনে শুনেও তা অস্বীকার করতো। সূরা নামলে এ কথাটিই বলা হয়েছে ঃ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (ايت ١٤)

"তারা মনে মনে বিশ্বাস করে ফেলেছিলো। কিন্তু জুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এসব নিদর্শন অস্বীকার করতো।"

৪৫. গোটা জাতির মধ্যে ঘোষণার বাস্তব রূপ সম্ভবত এই ছিল যে, ফেরাউন তার দরবারে সাম্রাজ্যের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও জাতির বড় বড় নেতাদের উদ্দেশ করে যে কথা বলেছিলো ঘোষকদের মাধ্যমে তা গোটা দেশের সমস্ত শহর ও জনপদে প্রচার করা হয়েছিলো। সেই যুগে তার কাছে তো তোষামুদে প্রেস, নিজের পোষা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বেতার ছিল না যে তার মাধ্যমে ঘোষণা করতো।

৪৬. ঘোষণার এই বিষয়বস্তু থেকেই প্রকাশ পায় যে "হিজ ম্যাজেষ্টির" পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের একের পর এক মু'জিযা দেখানো দেবতাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস নড়বড়ে করে দিয়েছিলো এবং যে তেলেসমাতির মাধ্যমে ফেরাউনদের খান্দান আল্লাহর অবতার সেজে মিসরে তাদের খোদায়ী চালিয়ে যাচ্ছিলো তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। এই পরিস্থিতি দেখে ফেরাউন বলে উঠেছিলো ঃ হতভাগারা, এ দেশে কার রাজত্ব চলছে এবং নীল নদ থেকে উৎপন্ন যে সব নদী নালার ওপর তোমাদের গোটা আর্থিক কায়–কারবার নির্ভরশীল তা কার নির্দেশে প্রবাহিত হচ্ছে তা তোমরা চোখে দেখতে পাও না? এসব উন্নয়ন মূলক কাজ তো করেছি আমি এবং আমার খান্দান আর তোমরা ভক্ত অনুরক্ত হচ্ছো এই ফকীরের।

৪৭. অর্থাৎ যার কাছে না আছে অর্থ–সম্পদ না আছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব।

৪৮. কোন কোন মুফাসসিরের ধারণা, বাল্যকাল থেকেই হযরত মূসার (আ) কথায় যে তোতলামি ছিল সে বিষয়েই ফেরাউনের এই আপত্তি। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। সূরা তোয়াহাতে একথা বলা হয়েছে যে, হযরত মূসাকে (আ) যে সময় নবুওয়াতের পদ–মর্যাদায় ভূষিত করা হচ্ছিলো তখন তিনি আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন যে, আমার কথার জড়তা দূর করে দিন যাতে মানুষ ভালভাবে আমার কথা বুঝতে পারে। সেই সময়ই তাঁর অন্যান্য প্রার্থনার সাথে এই প্রার্থনাও মঞ্জুর করা হয়েছিলো (আয়াত ২৭

থেকে ৩৬)। তাছাড়া কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে হযরত মূসার (আ) যে সব বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা তাঁর পূর্ণ মাত্রার সাবলীল ভাষার প্রতি ইংগিত করে। অতএব, ফেরাউনের আপত্তির কারণ তাঁর কথার তোতলামি ছিল না। বরং তার আপত্তির বিষয় ছিল এই যে, এ ব্যক্তি অজানা কি সব এলোমেলো কথাবার্তা বলে যার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় কখনো আমাদের বোধগম্য হয়নি।

৪৯. প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তিকে যখন কোন এলাকার শাসন কর্তৃত্ব অথবা অন্য দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে নিয়োগ করা হতো তখন বাদশাহর পক্ষ থেকে তাঁকে খেলাত দেয়া হতো যার মধ্যে স্বর্ণ-বলাকা অথবা চুড়িও থাকতো। তার সাথে সিপাই, দণ্ডধারী ও সেবকদের একটি দল থাকতো যাতে তার প্রভাব ও শান শওকত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে বাদশাহর পক্ষ থেকে সে আদিষ্ট হয়ে আসছে তার জৌলুস ও জাঁকজমক প্রকাশ পায়। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, সত্যিই যদি আসমানের বাদশাহ মূসাকে (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে তাঁর দূত বানিয়ে পাঠাতেন তাহলে সে বাদশাহী খেলাত লাভ করতো এবং তাঁর সাথে ফেরেশতাদের অনেক দল আসতো। এ কেমন কথা যে, একজন নিস্ব ও সহায়-সম্বলহীন মানুষ হাতে একখানা লাঠি নিয়ে এসে বলছে, 'আমি বিশ্ব জাহানের রবের রসূল।'

৫০. এই ছোট্ট আয়াতটিতে একটি অনেক বড় সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি কোন দেশে তার স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর চেষ্টা করে এবং সে জন্য প্রকাশ্যে সব রকমের চক্রান্ত করে। সব রকমের প্রতারণা, শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয়। প্রকাশ্যে বিবেক বিক্রির কারবার চালায় এবং যারা বিক্রি হয় না তাদেরকে দ্বিধাহীন চিত্তে পদদলিত করে তখন সে মুখে না বললেও কার্যক্ষেত্রে একথা স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রকৃত পক্ষে সে ঐ দেশের অধিবাসীদেরকে বুদ্ধি-বিবেক, নৈতিকতা ও সাহসিকতার দিক থেকে গুরুত্বহীন মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে এই মত পোষণ করে যে, এসব নির্বোধ, বিবেক-বুদ্ধিহীন ও ভীরু লোকগুলোকে আমি যেদিকে ইচ্ছা তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। তার এ প্রচেষ্টা যখন সফল হয় এবং দেশের অধিবাসীরা এর অনুগত দাসে পরিণত হয় তখন নিজেদের কাজ দ্বারাই তারা প্রমাণ করে দেয় যে, সেই ঘৃণ্য লোকটি তাদেরকে যা মনে করেছিলো তারা বাস্তবেও তাই। তাদের এই লাঞ্ছনাকর অবস্থায় পতিত হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে, তারা মৌলিকভাবে 'ফাসেক'। হক ও বাতিল এবং ইনসাফ ও জুলুম কি তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা থাকে না। সততা, দীনদারী এবং মহত্ব মূল্য ও মর্যাদা লাভের উপযুক্ত না মিথ্যা, বে-ঈমানী এবং নীচতা মূল্য ও মর্যাদা লাভের উপযুক্ত তা নিয়েও তাদের কোন মাথা ব্যাথা থাকে না। এসব বিষয়ের পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থই তাদের কাছে আসল গুরুত্বের বিষয়। সে জন্য তারা যে কোন জালেমকে সহযোগিতা করতে, যে কোন স্বৈরাচারের সামনে মাথা নত করতে, যে কোন বাতিলকে গ্রহণ করতে এবং সত্যের যে কোন আওয়াজকে দাবিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

৫১. অর্থাৎ যারা তাদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ না করবে এবং তাদের মতই আচরণ করবে তাদের জন্য তারা অগ্রবর্তী আর যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوٓا ءَأَٰلِهَتُنَا
خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾
وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُۥ
لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

৬ রুকূ'

আর যেই মাত্র ইবনে মারয়ামের উদাহরণ দেয়া হলো তোমার কওম হৈ চৈ শুরু করে দিলো এবং বলতে শুরু করলো ঃ আমাদের উপাস্য উৎকৃষ্ট না সে?[৫২] তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির জন্য তোমার সামনে এ উদাহরণ পেশ করেছে। সত্য কথা হলো, এরা মানুষই কলহ প্রিয়। ইবনে মারয়াম আমার বান্দা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে নিয়ামত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদের জন্য আমার অসীম ক্ষমতার একটি নমুনা বানিয়েছিলাম।[৫৩] আমি চাইলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতা সৃষ্টি করে দিতে পারি[৫৪] যারা পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর প্রকৃতপক্ষে সে তো কিয়ামতের একটি নিদর্শন।[৫৫] অতএব সে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার কথা মেনে নাও। এটাই সরল-সোজা পথ। শয়তান যেন তা থেকে তোমাদের বিরত না রাখে।[৫৬] সে তো তোমাদের প্রাকশ্য দুশমন।

৫২. ইতিপূর্বে এ সূরার ৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে "তোমাদের পূর্বে যে রসূলগণ অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি বন্দেগী করার জন্য রহমান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য মনোনীত করেছি কিনা?" মক্কাবাসীদের সামনে যখন এ বক্তব্য পেশ করা হচ্ছিলো তখন এক ব্যক্তি হাদীসসমূহে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনুয যিবা'রা আপত্তি উত্থাপন করে বললো ঃ কেন খৃষ্টানরা মারয়ামের পুত্র ঈসাকে খোদার পুত্র মনে করে তার ইবাদত করে কিনা? তাহলে আমাদের উপাস্যের দোষ কি? এতে কাফেরদের সমাবেশে হাসির রোল পড়ে গেল এবং শ্লোগান শুরু হলো, এবার আচ্ছা মত জব্দ হয়েছে, ঠিকমত ধরা হয়েছে। এখন এর জবাব দাও। কিন্তু তাদের এই বাচালতার কারণে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন না করে প্রথমে তা পূর্ণ করা হয়েছে

এবং তারপর আপত্তিকারীর প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। (প্রকাশ থাকে যে, তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ সব সূত্র সম্পর্কে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু আয়াতটির পূর্বাপর প্রসঙ্গ এবং ঐসব বর্ণনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পর আমরা ওপরে যা বর্ণনা করেছি সেটিই আমাদের মতে ঘটনার সঠিক রূপ বলে প্রতিভাত হয়েছে)

৫৩. অসীম ক্ষমতার নমুনা বানানোর অর্থ হযরত ঈসাকে বিনা বাপে সৃষ্টি করা এবং তাঁকে এমন মু'জিযা দান করা যা না তাঁর পূর্বে কাউকে দেয়া হয়েছিলো না পরে। তিনি মাটি দিয়ে পাখি তৈরী করে তাতে ফুঁ দিতেন আর অমনি তা জীবন্ত পাখি হয়ে যেতো। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতেন এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতেন। এমনকি মৃত মানুষকে পর্যন্ত জীবিত করতেন। আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, শুধু অসাধারণ জন্ম এবং এসব বড় বড় মু'জিযার কারণে তাঁকে আল্লাহর দাসত্বের উর্ধে মনে করা এবং আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করে তাঁর উপাসনা করা নিতান্তই ভ্রান্তি। একজন বান্দা হওয়ার চেয়ে অধিক কোন মর্যাদা তাঁর ছিল না। আমি তাকে আমার নিয়ামতসমূহ দিয়ে অভিসিক্ত করে আমার অসীম ক্ষমতার নমুনা বানিয়ে দিয়েছিলাম। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ইমরান, টীকা ৪২ থেকে ৪৪; আন নিসা, ১৯০; আল মায়েদা, টীকা ৪০, ৪৬ ও ১২৭; মারয়াম, টীকা ১৫ থেকে ২২; আল আম্বিয়া, টীকা ৮৮ থেকে ৯০; আল মু'মিনূন, টীকা ৪৩)।

৫৪. আরেকটি অনুবাদ হতে পারে তোমাদের কোন কোন লোককে ফেরেশতা বানিয়ে দেবো।

৫৫. এ আয়াতাংশের অনুবাদ এও হতে পারে যে তিনি কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞানের একটি মাধ্যম। এখানে এই মর্মে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, "সে" শব্দ দ্বারা কি জিনিস বুঝানো হয়েছে? হযরত হাসান বাসারী এবং সাঈদ ইবনে জুবায়েরের মতে এর অর্থ কুরআন মজীদ। অর্থাৎ কিয়ামত আসবে কুরআন মজীদ থেকে মানুষ তা জানতে পারে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা পূর্বাপর প্রসঙ্গের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। কথার মধ্যে এমন কোন ইংগিত বর্তমান নেই যার ভিত্তিতে বলা যাবে যে এখানে কুরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অন্য সব তাফসীরকারগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবে এ মত পোষণ করেন যে, এর অর্থ হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম এবং পূর্বাপর প্রসঙ্গের মধ্যে এটাই সঠিক। এরপর প্রশ্ন আসে, তাঁকে কোন্ অর্থে কিয়ামতের নিদর্শন অথবা কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যম বলা হয়েছে? ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী, দাহ্হাক, আবুল আলিয়া ও আবু মালেক বলেন, এর অর্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় আগমন, যে সম্পর্কে বহু হাদীসে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তিনি দ্বিতীয় বার যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন বুঝা যাবে কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। কিন্তু এসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মহাসম্মান সত্ত্বেও একথা মেনে নেয়া কঠিন যে, এ আয়াতে হযরত ঈসার পুনরাগমনকে কিয়ামতের নিদর্শন অথবা সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যম বলা হয়েছে। কেননা, পরের বাক্যই এ অর্থ গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক। তাঁর পুনরাগমন কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমে শুধু তাদের জন্য হতে পারে যারা সেই যুগে বর্তমান থাকবে অথবা সেই যুগের পরে জন্ম লাভ করবে। মক্কার কাফেরদের জন্য তিনি কিভাবে

وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

ঈসা যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো, বলেছিলো ঃ আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে এসেছি এবং এ জন্য এসেছি যে, তোমরা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করছো তার কিছু বিষয়ের তাৎপর্য প্রকাশ করবো। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহই আমার ও তোমাদের রব। তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সরল-সোজা পথ।[৫৭] কিন্তু (তাঁর এই সুস্পষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী পরস্পর মতপার্থক্য করলো।[৫৮] যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক দিনের আযাব।

এখন এসব লোকেরা কি শুধু এ জন্যই অপেক্ষমান যে অকস্মাত এদের ওপর কিয়ামত এসে যাক এবং এরা আদৌ টের না পাক? যখন সে দিনটি আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া অবশিষ্ট সব বন্ধুই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে।[৫৯]

কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যম হতে পারেন যার কারণে তাদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা সঠিক হবে যে, "অতএব তোমরা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না।" অতএব, অন্য কয়েকজন মুফাসসির এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন আমাদের মতে সেটিই সঠিক ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে এখানে হযরত ঈসার বিনা বাপে জন্ম লাভ, মাটি দিয়ে জীবন্ত পাখি তৈরী করা এবং মৃতকে জীবিত করাকে কিয়ামতের সম্ভাবনার একটি প্রমাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য এই যে, যে আল্লাহ বিনা বাপে সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন এবং যে আল্লাহর এক বান্দা মাটির একটি কাঠামোর মধ্যে জীবন সঞ্চার করতে ও মৃতদের জীবিত করতে পারেন তিনি মৃত্যুর পর তোমাদের ও সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন তা তোমরা অসম্ভব মনে করো কেন?

৫৬. অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা থেকে যেন বিরত না রাখে।

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ
تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا
تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ
الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا
تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ
عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭ রুকূ'

যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছিলো এবং আমার আদেশের অনুগত হয়েছিল সেই দিন তাদের বলা হবে, "হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং কোন দুঃখও আজ তোমাদের স্পর্শ করবে না। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা[৬০] জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের খুশী করা হবে।" তাদের সামনে স্বর্ণের প্লেট ও পেয়ালাসমূহ আনা নেয়া করানো হবে এবং মনের মত ও দৃষ্টি পরিতৃপ্তকারী প্রতিটি জিনিস সেখানে থাকবে। তাদের বলা হবে, "এখন তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে। পৃথিবীতে তোমরা যেসব কাজ করেছো তার বিনিময়ে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছো। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল মজুদ আছে যা তোমরা খাবে।" আর অপরাধীরা তারা তো চিরদিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। তাদের আযাব কখনো কম করা হবে না এবং তারা সেখানে নিরাশ অবস্থায় পড়ে থাকবে। আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

৫৭. অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম একথা কখনো বলেননি যে, আমি আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র। তোমরা আমার উপাসনা করো। অন্য সব নবী-রসূল যে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে দাওয়াত দিচ্ছেন তাঁর দাওয়াত তাই ছিল। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ইমরান, টীকা ৪৫ থেকে ৪৮; আন নিসা, টীকা ২১৩, ২১৭ ও ২১৮; আল মায়েদা, টীকা ১০০, ১৩০; মারয়াম, টীকা ২১ থেকে ২৩)।

وَنَادَوْا يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَٰبِدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَٰقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾

তারা চিৎকার করে বলবে "হে মালেক।[৬১] তোমার রব আমাদেরকে. একেবারে ধ্বংস করে দেন তাহলে সেটাই ভাল" সে জবাবে বলবে ঃ "তোমাদের এভাবেই থাকতে হবে। আমরা তোমাদের কাছে ন্যায় ও সত্য নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশের কাছে ন্যায় ও সত্য ছিল অপসন্দনীয়।"[৬২]

এ লোকেরা কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে?[৬৩] বেশ তো! তাহলে আমিও একটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এরা কি মনে করেছে, আমি এদের গোপন এবং এদের চুপিসারে বলা কথা শুনতে পাই না! আমি সব কিছু শুনছি এবং আমার ফেরেশতা তাদের কাছে থেকেই তা লিপিবদ্ধ করছে।

এদের বলো, "সত্যিই যদি রহমানের কোন সন্তান থাকতো তাহলে তার সর্বপ্রথম ইবাদতকারী হতাম আমি।[৬৪] আসমান ও যমীনের শাসনকর্তা আরশের অধিপতি এমন সমস্ত বিষয় থেকে পবিত্র যা এরা তার প্রতি আরোপ করে থাকে। ঠিক আছে, যে দিনের ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে সেই দিন না দেখা পর্যন্ত তাদেরকে বাতিল ধ্যান–ধারণার মধ্যে ডুবে এবং নিজেদের খেলায় মেতে থাকতে দাও।"

৫৮. অর্থাৎ একটি গোষ্ঠী তাঁকে অস্বীকার করলে বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হলো যে, তাঁর প্রতি অবৈধভাবে জন্মলাভ করার অপবাদ আরোপ করলো এবং নিজেদের ধারণায় তাঁকে শূলি বিদ্ধ করে তবেই ক্ষান্ত হলো। আরেকটি গোষ্ঠী তাঁকে মেনে নিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে লাগামহীন বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে ছাড়লো এবং

একজন মানুষের আল্লাহ হওয়ার বিষয়টি তাদের জন্য এমন জটিলতা সৃষ্টি করলো যার সমাধান করতে করতে তাদের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট দলের সৃষ্টি হলো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, টীকা ২১১ থেকে ২১৬; আল মায়েদা, টীকা ৩৯, ৪০, ১০১ ও ১৩০)।

৫৯. অন্য কথায় কেবল সেই সব বন্ধুত্ব টিকে থাকবে যা পৃথিবীতে নেকী ও আল্লাভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য সব বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপান্তরিত হবে। আজ যারা গোমরাহী, জুলুম-অত্যাচার এবং গোনাহর কাজে একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী কাল কিয়ামতের দিন তারাই একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে এবং নিজেকে রক্ষার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলা হয়েছে। যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এই পৃথিবীতেই ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখতে সক্ষম হয় যে, কোন্ প্রকৃতির লোকদের বন্ধু হওয়া তাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোন্ প্রকৃতির লোকদের বন্ধু হওয়া ধ্বংসাত্মক।

৬০. মূল আয়াতে ازواج শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রীদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে আবার কোন ব্যক্তির একই পথের পথিক সমমনা ও সহপাঠী বন্ধুদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্য যে, তার মধ্যে যেন এই উভয় অর্থই শামিল হয়। ঈমানদারদের ঈমানদার স্ত্রীরা এবং তাদের মু'মিন বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সাথে থাকবে।

৬১. মালেক অর্থ জাহান্নামের ব্যবস্থাপক। কথার ইংগিত থেকেই এটিই প্রকাশ পাচ্ছে।

৬২. অর্থাৎ আমি তোমাদের সামনে প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা ছিলে সত্যের পরিবর্তে কেচ্ছা-কাহিনীর ভক্ত এবং সত্য ছিল তোমাদের কাছে অত্যন্ত অপসন্দনীয়। এখন নিজেদের এই নির্বুদ্ধিতা মূলক পসন্দের পরিণাম দেখে অস্থির হয়ে উঠছো কেন? হতে পারে এটা জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের জবাবেরই একটা অংশ। আবার এও হতে পারে যে, "তোমরা এভাবেই এখানে পড়ে থাকবে" পর্যন্তই জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের জবাব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং এই দ্বিতীয় বাক্যাংশটা আল্লাহর নিজের কথা। প্রথম ক্ষেত্রে জাহান্নামের ব্যবস্থাপকের উক্তি "আমি তোমাদের কাছে ন্যায় ও সত্য নিয়ে গিয়েছিলাম" ঠিক তেমনি যেমন সরকারের কোন বড় কর্মকর্তা সরকারের পক্ষ থেকে বলতে গিয়ে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করে এবং তার অর্থ হয় আমাদের সরকার এ কাজ করেছে বা এ নির্দেশ দিয়েছে।

৬৩. কুরাইশ নেতারা তাদের গোপন সভাসমূহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে যেসব কথা আলোচনা করছিলো এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৬৪. অর্থাৎ কাউকে আল্লাহর সন্তান হিসেবে মানতে আমার অস্বীকৃতি এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সন্তান বলে আখ্যায়িত করছো তাদের ইবাদত করতে আমার অস্বীকৃতি কোন জিদ বা হঠকারিতার ভিত্তিতে নয়। আমি যে কারণে তা অস্বীকার করি তা শুধু এই যে, প্রকৃতপক্ষে কেউই আল্লাহর পুত্র বা কন্যা নয়। তোমাদের এই আকীদা-বিশ্বাস সত্য ও বাস্তবতার পরিপন্থী। আল্লাহর সন্তান আছে এটাই যদি বাস্তব হতো তাহলে আমি আল্লাহর এমন বিশ্বাসী বান্দা যে, তোমাদের সবার আগে আমি তাঁর বন্দেগী মেনে নিতাম।

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن
سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ
يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

সেই একজনই আসমানেও আল্লাহ এবং যমীনেও আল্লাহ। তিনি মহাকুশলী ও মহাজ্ঞানী।[৬৫] অনেক উচ্চ ও সম্মানিত সেই মহান সত্তা যার মুঠিতে যমীন ও আসমানসমূহ এবং যমীন ও আসমানে যা কিছু আছে তার প্রতিটি জিনিসের বাদশাহী।[৬৬] তিনিই কিয়ামতের সময়ের জ্ঞান রাখেন এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।[৬৭]

এরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা শাফায়াতের কোন ইখতিয়ার রাখে না। তবে যদি কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দান করে।[৬৮]

যদি তোমরা এদের জিজ্ঞেস করো, কে এদের সৃষ্টি করেছে তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ।[৬৯] তাহলে কোথা থেকে এরা প্রতারিত হচ্ছে? রসূলের এই কথার শপথ, 'হে রব, এরাই সেই সব লোক যারা মানছে না।[৭০]

ঠিক আছে, হে নবী, এদের উপেক্ষা করো এবং বলে দাও, তোমাদের সালাম জানাই।[৭১] অচিরেই তারা জানতে পারবে।

৬৫. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের আল্লাহ আলাদা আলাদা নয়, বরং গোটা বিশ্ব জাহানের আল্লাহ একজনই। গোটা বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা তাঁরই জ্ঞান ও কৌশলে পরিচালিত হচ্ছে এবং সমস্ত সত্য তিনিই জানেন।

৬৬. অর্থাৎ খোদায়ীর ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদার থাকবে এবং এই বিশাল বিশ্ব জাহানের শাসন কর্তৃত্বে কারো দখল থাকবে এমন অবস্থা থেকে তাঁর মহান সত্তা অনেক

উর্ধে। নবী হোক বা অলী, ফেরেশতা হোক বা জিন কিংবা রূহ, তারকা হোক বা গ্রহ আসমানে ও যমীনে যারাই আছে সবাই তাঁর বান্দা, দাস ও নির্দেশের অনুগত। খোদায়ীর কোন গুণে গুণান্বিত হওয়া কিংবা খোদায়ী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

৬৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমরা যাকেই সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক বানাও না কেন মৃত্যুর পর সেই একমাত্র আল্লাহর সাথেই তোমাদের পাল্লা পড়বে। তাঁর আদালতেই তোমাদের সমস্ত কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৬৮. এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ ঃ

প্রথম অর্থ হচ্ছে, মানুষ পৃথিবীতে যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে তারা কেউই আল্লাহর কাছে শাফায়াতকারী নয়। তাদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট ও দুষ্কর্মশীল তারা নিজেরাই তো সেখানে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হবে। তবে যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে (না জেনে শুনে নয়) ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছিলো তাদের কথা ভিন্ন।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যারা শাফায়াত করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার লাভ করবে তারাও কেবল সেই সব লোকের জন্যই শাফায়াত করতে পারবে যারা পৃথিবীতে জেনে শুনে (গাফলতিতে ও অজান্তে নয়) ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের প্রতি রুষ্ঠ ছিল কিংবা না বুঝে শুনে اشهد ان لا اله الا الله -ও বলতো এবং অন্যান্য উপাস্যদের উপাসনাও করতো এমন কোন ব্যক্তির শাফায়াত না তারা নিজেরা করবে না তা করার অনুমতি পাবে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি বলে, সে যাদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছে তারা অবশ্যই শাফায়াতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার রাখে। এবং আল্লাহর কাছে তাদের এমন ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে যে, আকীদা–বিশ্বাস যাই হোক না কেন তারা যাকে ইচ্ছা মাফ করিয়ে নিতে পারে, তাহলে সে মিথ্যা বলে। আল্লাহর কাছে কারোরই এই মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি কারো জন্য এমন শাফায়াতের দাবী করে সে যদি জ্ঞানের ভিত্তিতে একথা সত্য হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে সাহস করে এগিয়ে আসুক। কিন্তু সে যদি এরূপ প্রমাণ পেশ করার মত পজিশনে না থাকে—এবং নিশ্চিতভাবেই নেই—তাহলে অযথা শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে কিংবা শুধু অনুমান, সংস্কার ও ধারণার বশবর্তী হয়ে এরূপ একটি আকীদা পোষণ করা একেবারেই অর্থহীন আর এই খেয়ালীপনার ওপর নির্ভর করে নিজেদের পরিণামকে বিপদগ্রস্ত করা চরম নির্বুদ্ধিতা।

এ আয়াত থেকে আনুসাঙ্গিকভাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি পাওয়া যায়। এক, এ থেকে জানা যায়, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে জ্ঞানবিহীন সাক্ষ্য দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য হলেও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। দুনিয়াতে যে ব্যক্তিই মুখে কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করবে আমরা তাকে মুসলমান হিসেবে মেনে নেবো এবং যতক্ষণ না সে প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট কুফরী করবে ততক্ষণ আমরা তার সাথে মুসলমানদের মতই আচরণ করতে থাকবো। কিন্তু আল্লাহর কাছে শুধু সেই ব্যক্তিই ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে যে তার জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা অনুসারে জেনে বুঝে لا اله الا الله বলেছে এবং সে একথা বুঝে যে এভাবে সে কি কি বিষয় অস্বীকার করছে এবং কি কি বিষয় স্বীকার করে নিচ্ছে।

দুই, এ থেকে সাক্ষ আইনের এই সূত্রটিও পাওয়া যায় যে, সাক্ষের জন্য জ্ঞান থাকা শর্ত। সাক্ষী যে ঘটনার সাক্ষ দান করছে তার যদি সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তাহলে তার সাক্ষ অর্থহীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ফায়সালা থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। তিনি একজন সাক্ষীকে বলেছিলেন ঃ

اذا رايت مثل الشمس فاشهد والافدع (احكام القران للجصاص)

"যদি তুমি নিজ চোখে ঘটনা এমনভাবে দেখে থাকো যেমন সূর্যকে দেখছো তা হলে সাক্ষ দাও। তা না হলে দিও না।"

৬৯. এর দুটি অর্থ। একটি হচ্ছে, যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, তাদের কে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তারা বলবে, 'আল্লাহ'। অপরটি হচ্ছে, যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, তাদের উপাস্যদের স্রষ্টা কে তাহলে তারা বলবে, 'আল্লাহ'।

৭০. কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে আরবী ব্যাকরণের অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় এ আয়াতটি তার অন্যতম। এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, وقيله কথাটির মধ্যে واو কোন্ প্রকৃতির এবং ওপরের বক্তব্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন্ জিনিসটির সাথে এর সম্পর্ক? তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাদের সেই সব আলোচনার মধ্যে আমি কোন সন্তোষজনক বিষয় পাইনি। শাহ আবদুল কাদের (র) সাহেবের অনুবাদ থেকে যে ইংগিত পাওয়া যায় সেইটিই আমার কাছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয় অর্থাৎ এখানে واو 'আতাফ'-এর (বাক্য সংযোজনের জন্য) জন্য ব্যবহৃত হয়নি, বরং শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা فَانّٰى يُؤْفَكُوْنَ আয়াতাংশের সাথে সম্পর্কিত। আর قيله এর সর্বনাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। يَا رَبِّ اِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ (হে রব, এরাই সেই সব লোক যারা মানছে না) আয়াতাংশ যার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত করছে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ

"রসূলের এই বাণীর শপথ যে, "হে রব! এরাই সেই সব লোক যারা মানছে না" কী বিস্ময়কর এদের প্রতারিত হওয়া। এরা নিজেরাই স্বীকার করছে যে, এদের ও এদের উপাস্যদের স্রষ্টাও আল্লাহ। তা সত্ত্বেও স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির উপাসনার জন্য গোঁ ধরে আছে।

রসূলের এই কথাটির শপথ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের এই আচরণ স্পষ্ট প্রমাণ করছিলো যে, তারা প্রকৃতই হঠকারী লোক। কারণ, তাদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুসারে তাদের আচরণের অযৌক্তিকতা প্রকাশ পাচ্ছে। এ ধরনের অযৌক্তিক আচরণ শুধু সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে না মানার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে। অন্য কথায় এ শপথের অর্থ হচ্ছে, রসূল অতীব সত্য কথাই বলেছেন। প্রকৃতই এরা মেনে নেয়ার মত লোক নয়।

৭১. অর্থাৎ তাদের রূঢ় কথা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে তাদের জন্য বদদোয়া করো না কিংবা তার জবাবে রূঢ় কথা বলো না। বরং সালাম দিয়ে তাদের কাছে থেকে সরে যাও।

আদ দুখান

৪৪

নামকরণ

সূরার ১০ নম্বর আয়াত يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ এর دُخَان শব্দকে এ সূরার শিরোনাম বানানো হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে دخان শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য বলছে, যে সময় সূরা 'যুখরুফ' ও তার পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা নাযিল হয়েছিলো। এ সূরাটিও সেই যুগেই নাযিল হয়। তবে এটি ঐগুলোর অল্প কিছুকাল পরে নাযিল হয়। এর ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফেরদের বৈরী আচরণ যখন কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত একটি দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। নবী (সা) মনে করেছিলেন, এদের ওপর বিপদ আসলে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ভাল কথা শোনার জন্য মন নরম হবে। আল্লাহ নবীর (সা) দোয়া কবুল করলেন। গোটা অঞ্চলে এমন দুর্ভিক্ষ নেমে এলো যে, সবাই অস্থির হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত কতিপয় কুরাইশ নেতা—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যাদের মধ্যে বিশেষভাবে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন—নবীর (সা) কাছে এসে আবেদন জানালো যে, নিজের কওমকে এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এ অবস্থায় আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এই পরিস্থিতিতে মক্কার কাফেরদের উপদেশ দান ও সতর্ক করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে বক্তব্য নাযিল করা হয় তার ভূমিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে ঃ

এক ঃ এই কুরআনকে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা মনে করে ভুল করছো। এ গ্রন্থ তো তার আপন সত্তায় নিজেই এ বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ যে তা কোন মানুষের নয়, বরং বিশ্ব জাহানের আল্লাহর রচিত কিতাব।

দুই ঃ তোমরা এই গ্রন্থের মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি করতেও ভুল করছো। তোমাদের মতে এটা একটা মহাবিপদ। এ মহাবিপদই তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাঁর রহমতের ভিত্তিতে যে সময় সরাসরি তোমাদের কাছে তাঁর রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই মুহূর্তটি ছিল অতীব কল্যাণময়।

তিন ঃ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তোমরা এই ভুল ধারণার মধ্যে ডুবে আছো যে, এই রসূল এবং এই কিতাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে তোমরাই বিজয়ী হবে। অথচ এমন এক বিশেষ মুহূর্তে এই রসূলকে রিসালাত দান ও এই কিতাব নাযিল করা হয়েছে যখন আল্লাহ সবার কিসমতের ফায়সালা করেন। আর আল্লাহর ফায়সালা এমন অথর্ব ও দুর্বল বস্তু নয় যে, ইচ্ছা করলে যে কেউ তা পরিবর্তিত করতে পারে। তাছাড়া তা কোন প্রকার মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রসূত হয় না যে, তাতে ভ্রান্তি ও অপূর্ণতার সম্ভাবনা থাকবে। তা তো বিশ্ব জাহানের শাসক ও অধিকর্তার অটল ফায়সালা যিনি সর্বশ্রোতা। সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করা কোন ছেলেখেলা নয়।

চার ঃ তোমরা নিজেরাও আল্লাহকে যমীন, আসমান এবং বিশ্ব জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক ও পালনকর্তা বলে মানো এবং একথাও মানো যে, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই এখতিয়ারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা অন্যদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণের জন্য গোঁ ধরে আছো। এর সপক্ষে এছাড়া তোমাদের আর কোন যুক্তি নেই যে, তোমার বাপ–দাদার সময় থেকেই এ কাজ চলে আসছে। অথচ কেউ যদি সচেতনভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহই মালিক ও পালনকর্তা এবং তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক মুখতার তাহলে কখনো তার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ পর্যন্ত দানা বাঁধতে পারে না যে, তিনি ছাড়া আর কে–উপাস্য হওয়ার যোগ্য আছে। কিংবা উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে। তোমাদের বাপ–দাদা যদি এই বোকামি করে থাকে তাহলে চোখ বন্ধ করে তোমরাও তাই করতে থাকবে তার কোন যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে সেই এক আল্লাহ তাদেরও রব ছিলেন যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের যেমন সেই এক আল্লাহর দাসত্ব করা উচিত তাদেরও ঠিক তেমনি তাঁর দাসত্ব করা উচিত ছিল।

পাঁচ ঃ আল্লাহর রবুবিয়াত ও রহমতের দাবি এ নয় যে, তিনি শুধু তোমাদের পেট ভরাবেন। তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন তাও এর অন্তর্ভুক্ত। সেই পথ প্রদর্শনের জন্যই তিনি রসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

এই প্রারম্ভিক কথাগুলো বলার পর সেই সময় যে দুর্ভিক্ষ চলছিলো সে কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টি আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। এ দুর্ভিক্ষ এসেছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার ফলে। তিনি দোয়া করেছিলেন এই ধারণা নিয়ে যে বিপদে পড়লে কুরাইশদের বাঁকা ঘাড় সোজা হবে এবং তখন হয়তো তাদের কাছে উপদেশ বাণী কার্যকর হবে। সেই সময় এই প্রত্যাশ্যা কিছুটা পূরণ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিলো। কেননা, ন্যায় ও সত্যের বড় বড় ঘাড় বাঁকা দুশমনও দুর্ভিক্ষের আঘাতে বলতে শুরু করেছিলো, হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দিন, আমরা ঈমান আনবো। এ অবস্থায় একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, এ রকম বিপদে পড়ে এরা ঈমান আনার লোক নয়। যে রসূলের জীবন, চরিত্র, কাজকর্ম এবং কথাবার্তায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছিলো যে তিনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল সেই রসূল থেকেই যখন এরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন শুধু একটি দুর্ভিক্ষ এদের গাফলতি ও অচৈতন্য কি করে দূর করবে? অপরদিকে কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমাদের ওপর থেকে এ আযাব সরিয়ে নিলেই তোমরা ঈমান আনবে, এটা তোমাদের চরম মিথ্যাচার। আমি এ আযাব সরিয়ে নিচ্ছি। এখনই বুঝা যাবে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতিতে কতটা সত্যবাদী।

তোমাদের মাথার ওপরে দুর্ভাগ্য খেলা করছে। তোমরা একটি প্রচণ্ড আঘাত কামনা করছো। ছোট খাট আঘাতে তোমাদের বোধোদয় হবে না।

এ প্রসংগে পরে ফেরাউন ও তার কওমের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, বর্তমানে কুরাইশ নেতারা যে বিপদের সম্মুখীন তাদের ওপর ঠিক একই বিপদ এসেছিলো। তাদের কাছেও এ রকম একজন সম্মানিত রসূল এসিছিলেন। তারাও তাঁর কাছে থেকে এমন সব সুস্পষ্ট আলামত ও নিদর্শনাদি দেখেছিলো যা তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়া প্রমাণ করছিলো। তারাও একের পর এক নিদর্শন দেখেছে কিন্তু জিদ ও একগুঁয়েমি থেকে বিরত হয়নি। এমন কি শেষ পর্যন্ত রসূলকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। ফলে এমন পরিণাম ভোগ করেছে যা চিরদিনের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে আছে।

এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আখেরাত, যা মেনে নিতে মক্কার কাফেরদের চরম আপত্তি ছিল। তারা বলতো ঃ আমরা কাউকে মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠে আসতে দেখিনি। আরেক জীবন আছে তোমাদের এ দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মৃত বাপ–দাদাকে জীবিত করে আনো। এর জবাবে আখেরাত বিশ্বাসের সপক্ষে সংক্ষিপ্তাকারে দুটি দলীল পেশ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, আখেরাত বিশ্বাসের অস্বীকৃতি সবসময় নৈতিক চরিত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়েছে। আরেকটি হচ্ছে, বিশ্ব জাহান কোন খেলোয়াড়ের খেলার জিনিস নয়, বরং এটি একটি জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাপনা। আর জ্ঞানীর কোন কাজ অর্থহীন হয় না। তাছাড়া "আমাদের বাপ–দাদাদের জীবিত করে আনো" কাফেরদের এই দাবির জবাব দেয়া হয়েছে এই বলে যে, এ কাজটি প্রতি দিনই একেকজনের দাবী অনুসারে হবে না। আল্লাহ এ জন্য একটি সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। সেই সময় তিনি সমস্ত মানব জাতিকে যুগপত একত্রিত করবেন এবং নিজের আদালতে তাদের জবাবদিহি করাবেন। কেউ যদি সেই সময়ের চিন্তা করতে চায় তাহলে এখনই করুক। কারণ, সেখানে কেউ যেমন নিজের শক্তির জোরে রক্ষা পাবে না তেমনি কারো বাঁচানোতে বাঁচতে পারবে না।

আল্লাহর সেই আদালতের উল্লেখ করতে গিয়ে যারা সেখানে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে তাদের কি হবে তা বলা হয়েছে এবং যারা সেখানে সফলকাম হবে তারা কি পুরস্কার লাভ করবে তাও বলা হয়েছে। সব শেষে কথার সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, তোমাদের বুঝানোর জন্য পরিষ্কার ও সহজ–সরল ভংগিতে তোমাদের নিজের ভাষায় এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এখন যদি বুঝানো সত্ত্বেও তোমরা না বুঝো এবং চরম পরিণতি দেখার জন্যই গোঁ ধরে থাকো তাহলে অপেক্ষা করো। আমার নবীও অপেক্ষা করছেন। যা হওয়ার তা যথা সময়ে দেখতে পাবে।

حٰمٓ ۚ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾

হা–মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে নাযিল করেছি। কারণ, আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম।[১] এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা[২] দেয়া হয়ে থাকে।[৩] আমি একজন রসূল পাঠাতে যাচ্ছিলাম, তোমার রবের রহমত স্বরূপ।[৪] নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।[৫] তিনি আসমান ও যমীনের রব এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানের প্রতিটি জিনিসের রব, যদি তোমরা সত্যিই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী হও।[৬] তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।[৭] তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।[৮] তোমাদের রব ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের রব যারা অতীত হয়ে গিয়েছেন।[৯] (কিন্তু বাস্তবে এসব লোকের দৃঢ় বিশ্বাস নেই) বরং তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে খেলছে।[১০]

১. কিতাবুম মুবীন বা সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ করার উদ্দেশ্য সূরা যুখরুফের ১ নম্বর টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে এখানেও যে বিষয়টির জন্য শপথ করা হয়েছে তা হলো এ কিতাবের রচিয়তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন, আমি নিজে। তার প্রমাণ

অন্য কোথাও অনুসন্ধান করার দরকার নেই, এ কিতাবই তার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এর পর আরো বলা হয়েছে, যে রাতে তা নাযিল করা হয়েছে সে রাত ছিল অত্যন্ত বরকত ও কল্যাণময়। অর্থাৎ যেসব নির্বোধ লোকদের নিজেদের ভালমন্দের বোধ পর্যন্ত নেই তারাই এ কিতাবের আগমনকে নিজেদের জন্য আকস্মিক বিপদ মনে করছে এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড়ই চিন্তিত। কিন্তু গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকা লোকদের সতর্ক করার জন্য আমি যে মুহূর্তে এই কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাদের ও গোটা মানব জাতির জন্য সেই মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্যময়।

কোন কোন মুফাসসির সেই রাতে কুরআন নাযিল করার অর্থ গ্রহণ করেছেন এই যে, ঐ রাতে কুরআন নাযিল শুরু হয় আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ গ্রহণ করেন, ঐ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন 'উম্মুল কিতাব' থেকে স্থানান্তরিত করে অহীর ধারক ফেরেশতাদের কাছে দেয়া হয় এবং পরে তা অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন মত ২৩ বছর ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হতে থাকে। প্রকৃত অবস্থা কি তা আল্লাহই ভাল জানেন।

ঐ রাত অর্থ সূরা কদরে যাকে 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ আর এখানে বলা হয়েছে اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ তাছাড়া কুরআন মজীদেই একথাও বলা হয়েছে যে, সেটি ছিল রমযান মাসের একটি রাত شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ (البقره : ١٨٥) ।

২. মূল আয়াতে اَمْرٍ حَكِيْمٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, সেই নির্দেশটি সরাসরি জ্ঞানভিত্তিক হয়ে থাকে। তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতার সম্ভাবনা নেই। অপর অর্থটি হচ্ছে, সেটি অত্যন্ত দৃঢ় ও পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। তা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই।

৩. এ বিষয়টি সূরা কদরে বলা হয়েছে এভাবে ঃ

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ

সেই রাতে ফেরেশতারা ও জিবরাঈল তাদের রবের আদেশে সব রকম নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় এটা এমন এক রাত যে রাতে তিনি ব্যক্তি, জাতি এবং দেশসমূহের ভাগ্যের ফায়সালা করে তাঁর ফেরেশতাদের কাছে দিয়ে দেন। পরে তারা ঐ সব ফায়সালা অনুসারে কাজ করতে থাকে। কতিপয় মুফাসসিরের কাছে এ রাতটি শা'বানের পনের তারিখের রাত বলে সন্দেহ হয়েছে তাদের মধ্যে হযরত ইকরিমার নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কারণ, কোন কোন হাদীসে এ রাত সম্পর্কে এ কথা উল্লেখ আছে যে, এ রাতেই ভাগ্যের ফায়সালা করা হয়। কিন্তু ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান বাসারী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবনে যায়েদ, আবু মালেক, দাহ্হাক এবং আরো অনেক মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এটা রমযানের সেই রাত যাকে "লাইলাতুল কদর" বলা হয়েছে। কারণ, কুরআন মজীদ

নিজেই সুস্পষ্ট করে তা বলছে। আর যে ক্ষেত্রে কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে 'আখবারে আহাদ'* ধরনের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। ইবনে কাসীর বলেন : এক শা'বান থেকে আরেক শা'বান পর্যন্ত ভাগ্যের ফায়সালা হওয়া সম্পর্কে 'উসমান ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণিত যে হাদীস ইমাম যুহরী উদ্ধৃত করেছেন তা একটি 'মুরসাল'** হাদীস। কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তির (نص) বিরুদ্ধে এ ধরনের হাদীস পেশ করা যায় না। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন : শা'বানের পনের তারিখের রাত সম্পর্কে কোন হাদীসই নির্ভরযোগ্য নয়, না তার ফযীলত সম্পর্কে, না ঐ রাতে ভাগ্যের ফয়সালা হওয়া সম্পর্কে। তাই সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা উচিত। (আহকামুল কুরআন)।

৪. অর্থাৎ এই কিতাবসহ একজন রসূল পাঠানো শুধু জ্ঞান ও যুক্তির দাবীই ছিল না, আল্লাহর রহমতের দাবীও তাই ছিল। কারণ, তিনি রব। আর রবুবিয়াত শুধু বান্দার দেহের প্রতিপালন ব্যবস্থা দাবীই করে না, বরং নির্ভুল জ্ঞানানুযায়ী তাদের পথপ্রদর্শন করা, হক ও বাতলির পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে না দেয়ার দাবীও করে।

৫. এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহর এ দু'টি গুণ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য মানুষকে এ সত্য জানিয়ে দেয়া যে, কেবল তিনিই নির্ভুল জ্ঞান দিতে পারেন। কেননা, তিনিই সমস্ত সত্যকে জানেন। একজন মানুষ তো দূরের কথা সমস্ত মানুষ মিলেও যদি নিজেদের জন্য জীবন পদ্ধতি রচনা করে তবুও তার ন্যায়, সত্য ও বাস্তবানুগ হওয়ার কোন গ্যারান্টি নেই। কারণ, গোটা মানব জাতি এক সাথে মিলেও একজন سَمِيعٌ ও عَلِيمٌ (সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী) হয় না। একটি সঠিক ও নির্ভুল জীবন পদ্ধতি রচনার জন্য যেসব জ্ঞান ও সত্য জানা জরুরী তার সবগুলো আয়ত্ব করা তার সাধ্যাতীত। এরূপ পূর্ণ জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। তাই মানুষের জন্য কোন্‌টি হিদায়াত আর কোন্‌টি গোমরাহী, কোন্‌টি হক আর কোন্‌টি বাতিল এবং কোন্‌টি কল্যাণ আর কোন্‌টি অকল্যাণ তা তিনিই বলতে পারেন।

৬. আরববাসীরা নিজেরাই স্বীকার করতো, আল্লাহই গোটা বিশ্ব জাহান ও তার প্রতিটি জিনিসের রব (মালিক ও পালনকর্তা)। তাই তাদের বলা হয়েছে, যদি তোমরা না বুঝে শুনে এবং শুধু মৌখিকভাবে একথা না বলে থাকো, বরং প্রকৃতই যদি তাঁর প্রভুত্বের উপলব্ধি ও মালিক হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস তোমাদের থাকে তাহলে তোমাদের মেনে নেয়া উচিত যে, (১) মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য কিতাব ও রসূল প্রেরণ তাঁর রহমত ও প্রতিপালন গুণের অবিকল দাবী এবং (২) মালিক হওয়ার কারণে এটা তাঁর হক এবং তাঁর মালিকানাধীন হওয়ার কারণে তোমাদের কর্তব্য হলো, তাঁর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত আসে তা মেনে চলো এবং যে নির্দেশ আসে তার আনুগত্য করো।

* আখবারে আহাদ বলতে এমন হাদীস বুঝায় যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রের কোনো এক স্তরে বর্ণনাকারী মাত্র একজন থাকে। এ বিষয়টি হাদীসের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিছুটা দুর্বলতা সঞ্চার করে।

** যে হাদীসে মূল রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত থাকে না বরং তাবেঈ নিজেই রাসূলের (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা ছাড়া অন্য কোনো ইমামই এ ধরনের হাদীসকে নিসংকোচে গ্রহণ করেননি।

৭. উপাস্য অর্থ প্রকৃত উপাস্য। আর প্রকৃত উপাস্যের হক হচ্ছে তাঁর ইবাদত (দাসত্ব ও পূজা–অর্চনা) করতে হবে।

৮. এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং থাকতে পারে না। অতএব যিনি নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে তোমাদের জীবন্ত মানুষ বানিয়েছেন এবং যিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক যে, যতক্ষণ ইচ্ছা তোমাদের এ জীবনকে টিকিয়ে রাখবেন এবং যখন ইচ্ছা এটা পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তোমরা তাঁর দাসত্ব করবে না, কিংবা তাঁর ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে অথবা তাঁর সাথে অন্যদেরও দাসত্ব করতে শুরু করবে তা সরাসরি বিবেক–বুদ্ধির পরিপন্থী।

৯. এখানে এ বিষয়ের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে যে, তোমাদের যে পূর্বসূরীরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাস্য বানিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের রবও তিনিই ছিলেন। তারা তাদের প্রকৃত রবকে বাদ দিয়ে অন্যদের দাসত্ব করে ঠিক কাজ করেনি। তাই তাদের অন্ধ অনুসরণ করে তোমরা ঠিকই করেছো এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে নিজেদের ধর্মের সঠিক হওয়ার যুক্তি–প্রমাণ বলে ধরে নেবে তা ঠিক নয়। তাদের কর্তব্য ছিল একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা। কারণ তিনিই ছিলেন তাদের রব। কিন্তু তারা যদি তা না করে থাকে তা হলে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সবার দাসত্ব পরিত্যাগ করে কেবল সেই এক আল্লাহর দাসত্ব করা। কারণ, তিনিই তোমাদের রব।

১০. এই সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশের মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। নাস্তিক হোক বা মুশরিক তাদের জীবনে মাঝে মধ্যে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন ভেতর থেকে তাদের মন বলে ওঠে ঃ তুমি যা বুঝে বসে আছো তার মধ্যে কোথাও না কোথাও অসংগতি বিদ্যমান। নাস্তিক আল্লাহকে অস্বীকার করার ব্যাপারে বাহ্যত যতই কঠোর হোক না কেন, কোন না কোন সময় তার মন এ সাক্ষ্য অবশ্যই দেয় যে, মাটির একটি পরমাণু থেকে শুরু করে নীহারিকা পুঞ্জ পর্যন্ত এবং একটি তৃণপত্র থেকে শুরু করে মানুষের সৃষ্টি পর্যন্ত এই বিস্ময়কর জ্ঞানময় ব্যবস্থা কোন মহাজ্ঞানী স্রষ্টা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। অনুরূপ একজন মুশরিক শিরকের যত গভীরেই ডুবে থাক না কেন তার মনও কোন না কোন সময় একথা বলে ওঠে, যাকে আমি উপাস্য বানিয়ে বসে আছি সে আল্লাহ হতে পারে না। মনের এই ভেতরের সাক্ষের ফলশ্রুতিতে না পারে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর তাওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে না পারে নাস্তিকতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ ও তা থেকে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে। ফলে বাহ্যিকভাবে তারা যত কঠোর ও দৃঢ় বিশ্বাসই প্রদর্শন করুক না কেন তাদের জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় সন্দেহের ওপরে। এখন প্রশ্ন হলো, এই সন্দেহ তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে না কেন এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও সন্তোষজনক ভিত্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য তারা ধীর ও ঠাণ্ডা মেজাজে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করে না কেন? এর জবাব হলো দীন বা জীবনাদর্শের ব্যাপারে তারা যে জিনিসটি থেকে বঞ্চিত হয় সেটি হচ্ছে ধীর ও ঠাণ্ডা মেজাজ। তাদের দৃষ্টিতে মূল গুরুত্ব লাভ করে শুধু পার্থিব স্বার্থ এবং তার ভোগের উপকরণ। এই বস্তুটি অর্জনের চিন্তা তারা তাদের মন–মগজ ও দেহের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ফেলে। এরপর থাকে জীবনাদর্শের ব্যাপার। সেটা তাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটা খেলা, একটা বিনোদন এবং একটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তারা

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

বেশ তো! সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করো, যে দিন আসমান পরিষ্কার ধোঁয়া নিয়ে আসবে এবং তা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এটা কষ্টদায়ক শাস্তি। (এখন এরা বলে) হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও। আমরা ঈমান আনবো। কোথায় এদের গাফলতি দূর হচ্ছে? এদের অবস্থা তো এই যে, এদের কাছে 'রসূলে মুবীন' এসেছেন।[১১] তা সত্ত্বেও এরা তাঁর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং বলেছে ঃ এতো শিখিয়ে নেয়া পাগল।[১২] আমি আযাব কিছুটা সরিয়ে নিচ্ছি। এরপরও তোমরা যা আগে করছিলে তাই করবে। যেদিন আমি বড় আঘাত করবো, সেদিন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।[১৩]

আমি এর আগে ফেরাউনের কওমকেও এই পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। তাদের কাছে একজন সম্ভ্রান্ত রসূল এসেছিলেন।[১৪]

এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কয়েক মুহূর্তও ব্যয় করতে পারে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হলে বিনোদন হিসেবে পালন করা হচ্ছে। নিরীশ্বরবাদ ও নাস্তিকতা বিষয়ক বিতর্ক বিনোদন মূলক ভাবে করা হচ্ছে। দুনিয়ার ব্যস্ততার মধ্যে কার এত অবসর আছে যে বসে একটু ভেবে দেখবে, আমরা ন্যায় ও সত্যের প্রতি বিমুখ নই তো? আর যদি তা হই তাহলে পরিণামই বা কি?

১১. رسول مبين এর দুটি অর্থ। এক, তাঁর জীবন, তাঁর নৈতিক চরিত্র এবং তাঁর কাজকর্ম থেকে তাঁর রসূল হওয়া পুরোপুরি স্পষ্ট। দুই, তিনি প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে কোন ত্রুটি করেননি।

১২. তাদের কথার উদ্দেশ্য হলো, এ বেচারা তো ছিল সাদামাটা মানুষ। অন্য কিছু লোক তাকে নেপথ্য থেকে উৎসাহ যোগাচ্ছে। তারা আড়ালে থেকে কুরআনের আয়াত

রচনা করে একে শিখিয়ে দেয়। আর এ সাধারণ মানুষের কাছে এসে তা বলে ফেলে। তারা মজা করে লোক চক্ষুর অন্তরালে বসে থাকে আর এ গালমন্দ শোনে এবং পাথর খায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরের পর বছর তাদের সামনে ক্রমাগত যেসব প্রমাণ, সদুপদেশ এবং যুক্তিপূর্ণ শিক্ষা পেশ করে ক্লান্ত প্রায় হয়ে পড়ছিলেন এভাবে একটি সস্তা কথা বলে তারা তা উড়িয়ে দিতো। কুরআন মজীদে যেসব যুক্তিপূর্ণ কথা বলা হচ্ছিলো তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতো না, আবার যিনি এসব কথা পেশ করছিলেন তিনি কেমন মর্যাদার লোক তাও দেখতো না। তাছাড়া এসব অভিযোগ আরোপের সময়ও এ কথা ভেবে দেখার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতো না যে, তারা যা বলছে তা অর্থহীন কথাবার্তা কিনা। এটা সর্বজন বিদিত যে নেপথ্যে বসে শেখানোর মত অন্য কোন ব্যক্তি যদি থাকতো তাহলে তা খাদীজা (রা), আবু বকর (রা), আলী (রা), যায়েদ ইবনে হারেসা এবং প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী অন্যান্য মুসলমানদের কাছে কি করে গোপন থাকতো। কারণ তাদের চাইতে আর কেউ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ও সার্বক্ষণিক সাথী ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব লোকই নবীর (সা) সর্বাধিক ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন তারই বা কারণ কি? অথচ নেপথ্যে থেকে অন্য কারোর শেখানোর ওপর ভিত্তি করে নবুওয়াতের কাজ চালানো হয়ে থাকলে এসব লোকই সর্ব প্রথম তাঁর বিরোধিতা করতো। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহল, টীকা ১০৭; আল ফুরকান, টীকা ১২)।

১৩. এ আয়াত দুটির অর্থ বর্ণনায় মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং এই মতভেদ সাহাবাদের যুগেও ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বিখ্যাত শাগরেদ মাসরুক বলেন ঃ একদিন আমরা কুফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম এক বক্তা লোকদের সামনে বক্তৃতা করছে। সে يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ পাঠ করলো। তারপর বলতে লাগলো ঃ জানো, সে ধোঁয়া কেমন? এই ধোঁয়া কিয়ামতের দিন আসবে এবং কাফের ও মুনাফিকদের অন্ধ ও বধির করে দেবে। কিন্তু ঈমানদারদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে শুধু এতটুকু যেন সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে। তার এই বক্তব্য শুনে আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কাছে গেলাম এবং তাকে বক্তার এই তাফসীর বর্ণনা করে শুনালাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ শুয়ে ছিলেন। এ তাফসীর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, কারো যদি জানা না থাকে তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জেনে নেয়া উচিত। প্রকৃত ব্যাপার হলো, কুরাইশরা যখন ক্রমাগত ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতাই করে চলছিলো তখন তিনি এই বলে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, ইউসুফ আলাইহিস সালামের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। সুতরাং এমন কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, মানুষ হাড়, চামড়া এবং মৃতজন্তু পর্যন্ত খেতে শুরু করলো। তখনকার অবস্থা ছিল, যে ব্যক্তিই আসমানের দিকে তাকাতো ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে শুধু ধোঁয়াই দেখতে পেতো। অবশেষে আবু সুফিয়ান নবীর (সা) কাছে এসে বললো ঃ আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার আহবান জানান আপনার কওম ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন এ বিপদ দূর করে দেন। এ যুগেই কুরাইশরা বলতে শুরু করেছিলো ঃ হে আল্লাহ! আমাদের ওপর থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান আনবো। এ আয়াত দুটিতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে। আর বড় আঘাত অর্থ

বদর যুদ্ধের দিন কুরাইশদের যে আঘাত দেয়া হয়েছিলো তাই। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ, বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম কতিপয় সনদে মাসরূক থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মাসরূক ছাড়া ইবরাহীম নাখায়ী, কাতাদা, আসেম এবং আমেরও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছিলেন। তাই এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এটিই ছিল তাঁর অভিমত। তাবেয়ীদের মধ্যে থেকে মুজাহিদ, কাতাদা, আবুল আলিয়া, মুকাতিল, ইবরাহীম নাখায়ী, দাহ্হাক, আতায়িতুল আওফী এবং অন্যরাও এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অপর দিকে হযরত আলী, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী, যায়েদ ইবনে আলী এবং হাসান বাসারীর মত পণ্ডিতবর্গ বলেন ঃ এ আয়াতগুলোতে যে আলোচনা করা হয়েছে তা সবই কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের ঘটনা। আর এতে যে ধোঁয়ার কথা বলা হয়েছে তা সেই সময়েই পৃথিবীর ওপর ছেয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে যেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে সেই সব হাদীস থেকেও এ ব্যাখ্যা আরো দৃঢ়তা লাভ করে। হুযাইফা ইবনে আসীদ আল গিফারী বলেন ঃ একদিন আমরা পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলাম। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে হাজির হলেন এবং বললেন ঃ যতদিন না একের পর এক দশটি আলামত প্রকাশ পাবে ততদিন কিয়ামত হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ধোঁয়া, দাব্বা বা জন্তু, ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব, ঈসা ইবনে মারয়ামের অবতীর্ণ হওয়া, ভূমি ধ্বস, পূর্বে, পশ্চিমে ও আরব উপদ্বীপে এবং আদন থেকে আগুনের উৎপত্তি হওয়া যা মানুষকে তাড়া করে নিয়ে যাবে (মুসলিম)। ইবনে জারীর ও তাবারানীর উদ্ধৃত আবু মালেক আশআরী বর্ণিত হাদীস এবং ইবনে আবী হাতেম উদ্ধৃত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীসও এ বর্ণনা সমর্থন করে। এ দুটি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধোঁয়াকে কিয়ামতের আলামতের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাছাড়া নবী (সা) এও বলেছেন যে, যখন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলবে তখন মু'মিনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে সর্দির মত। কিন্তু তা কাফেরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করবে এবং তার শরীরের প্রতিটি ছিদ্র ও নির্গমন পথ দিয়ে বের হয়ে আসবে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে এ দুটি ব্যাখ্যার গরমিল ও বৈপরিত্য সহজেই দূর হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) ব্যাখ্যার ব্যাপারে বলা যায়, নবীর (সা) দোয়ার ফলে মক্কায় কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো যার ফলে কাফেরদের বিদ্রুপ ও উপহাসে কিছুটা ভাটা পড়েছিলো এবং দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য তারা নবীর (সা) কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়েছিলো। কুরআন মজীদের বেশ কিছু জায়গায় এ ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম ২৯, আল আরাফ ৭৭, ইউনুস ১৪, ১৫ ও ২৯ এবং আল মুমিনুন ৭২ টীকা)।

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমেও যে ঐ পরিস্থিরি প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। কাফেরদের উক্তি, "হে প্রভু, আমাদের ওপর থেকে এ আযাব সরিয়ে নিন, আমরা ঈমান আনবো।" আর আল্লাহর এ উক্তি, "কোথায় এদের গাফলতি দূর হচ্ছে? এদের

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى
اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ
هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ
الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾
وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ ۖ
وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا
كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾

তিনি বললেন[১৫] ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সোপর্দ করো।[১৬] আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।[১৭] আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। আমি তোমাদের কাছে (আমার নিযুক্তির) স্পষ্ট সনদ পেশ করছি।[১৮] তোমরা আমার ওপরে হামলা করে বসবে, এ ব্যাপারে আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি। তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তাহলে আমাকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকো।[১৯] অবশেষে তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, এসব লোক অপরাধী।[২০] (জবাব দেয়া হলো) বেশ, তাহলে রাতের মধ্যেই আমার বান্দাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।[২১] তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।[২২] সমুদ্রকে আপন অবস্থায় উন্মুক্ত থাকতে দাও। এই পুরো সেনাবাহিনী নিমজ্জিত হবে।[২৩] কত বাগ–বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ফসল ও জমকালো প্রাসাদ তারা ছেড়ে গিয়েছে। তাদের পিছনে কত ভোগের উপকরণ পড়ে রাইলো যা নিয়ে তারা ফূর্তিতে মেতে থাকতো। এই হয়েছে তাদের পরিণাম। আমি অন্যদেরকে এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।[২৪] অতপর না আসমান তাদের জন্য কেঁদেছে না যমীন[২৫] এবং সামান্যতম অবকাশও তাদের দেয়া হয়নি।

অবস্থা তো এই যে, এদের কাছে 'রসূলে মুবীন' এসেছেন। তা সত্ত্বেও এরা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং বলেছে ঃ এতো শিখিয়ে নেয়া পাগল।" তাছাড়া এই উক্তিও যে,

"আমি আযাব কিছুটা সরিয়ে নিচ্ছি। এরপরও তোমরা আগে যা করছিলে তাই করবে।" এ ঘটনাগুলো নবীর (সা) যুগের হলে কেবল সেই পরিস্থিতিতেই এসব কথা খাপ খায়। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে এমন ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এসব কথার প্রয়োগ বোধগম্য নয়। তাই ইবনে মাসউদের (রা) ব্যাখ্যার এতটুকু অংশ সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু ধোঁয়াও সেই যুগেই প্রকাশ পেয়েছিলো এবং প্রকাশ পেয়েছিলো এমনভাবে যে, ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে মানুষ যখন আসমানের দিকে তাকাতো তখন শুধু ধোঁয়াই দেখতে পেতো, তার ব্যাখ্যার এই অংশটুকু সঠিক বলে মনে হয় না। একথা কুরআন মজীদের বাক্যের সাথেও বাহ্যত খাপ খায় না এবং হাদীসসমূহেরও পরিপন্থী। কুরআনে একথা কোথায় বলা হয়েছে যে, আসমান ধোঁয়া নিয়ে এসেছে এবং মানুষের ওপর ছেয়ে গিয়েছে? সেখানে তো বলা হয়েছে, 'বেশ, তাহলে সেই দিনটির অপেক্ষা করো যেদিন আসমান সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে এবং তা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।' পরবর্তী আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার করলে এ বাণীর পরিষ্কার অর্থ যা বুঝা যায় তা হচ্ছে, তোমরা যখন উপদেশও মানছো না এবং দুর্ভিক্ষের আকারে যেভাবে তোমাদের সতর্ক করা হলো তাতেও সম্বিত ফিরে পাচ্ছো না, তাহলে কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো। সেই সময় যখন দুর্ভাগ্য ষোলকলায় পূর্ণ হবে তখন তোমরা ঠিকই বুঝতে পারবে হক কি আর বাতিল কি? সুতরাং ধোঁয়া সম্পর্কে সঠিক কথা হলো তা দুর্ভিক্ষকালীন সময়ের জিনিস নয়, বরং তা কিয়ামতের একটি আলামত। হাদীস থেকেও একথাই জানা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বড় বড় মুফাসসিরদের মধ্যে যারা হযরত ইবনে মাসউদের মত সমর্থন করেছেন তারা তাঁর পুরো বক্তব্যই সমর্থন করেছেন। আবার যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তারাও পুরোটাই প্রত্যাখ্যান করে বসেছেন। অথচ কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে এর কোন্ অংশ ঠিক এবং কোন্ অংশ ভুল তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

১৪. মূল আয়াতে رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। كريم শব্দটি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন তার দ্বারা বুঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে যে অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্ট আচার-আচরণ এবং অতীব প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী। সাধারণ গুণাবলী বুঝাতে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

১৫. প্রথমেই একথা বুঝে নেয়া দরকার যে, এখানে হযরত মূসার যেসব উক্তি ও বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তা যুগপৎ একই ধারাবাহিক বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ নয়, বরং বছরের পর বছর দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে যেসব কথা তিনি ফেরাউন ও তার সভাসদদের বলেছিলেন তার সারসংক্ষেপ কয়েকটি মাত্র বাক্যে বর্ণনা করা হচ্ছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, টীকা ৮৩ থেকে ৯৭; ইউনুস, টীকা ৭২ থেকে ৯৩; ত্বাহা, টীকা ১৮ (ক) থেকে ৫২; আশ শুআরা, টীকা ৭ থেকে ৪৯; আন নামল, টীকা ৮ থেকে ১৭; আল কাসাস, টীকা ৪৬ থেকে ৫৬; আর মু'মিন, আয়াত ২৩ থেকে ৪৬; আয যুখরুফ, আয়াত ৪৬ থেকে ৫৬ টীকাসহ)।

১৬. মূল আয়াতে ادوا الى عباد الله বলা হয়েছে। এ আয়াতাংশের একটি অনুবাদ আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। এই অনুবাদ অনুসারে এটা ইতিপূর্বে সূরা আ'রাফ (আয়াত ১৫), সূরা ত্বাহা (৪৭) এবং আশ শুআরায় বনী ইসরাঈলদের আমার সাথে যেতে দাও বলে

যে দাবী করা হয়েছে সেই দাবীর সমার্থক। আরেকটি 'অনুবাদ' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে উদ্ধৃত। অনুবাদটি হলো, হে আল্লাহর বান্দারা, আমার হক আদায় করো অর্থাৎ আমার কথা মেনে নাও, আমার প্রতি ঈমান আনো এবং আমার হিদায়াত অনুসরণ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর এটা আমার হক। পরের বাক্যাংশ অর্থাৎ "আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল" এই দ্বিতীয় অর্থের সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৭. অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রসূল। নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা সংযোজন করে বলার মত ব্যক্তিও আমি নই কিংবা নিজের কোন ব্যক্তিগত আকাংখা বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজেই একটি নির্দেশ বা আইন রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়ারমত ব্যক্তিও নই। তোমরা আমার ওপর এতটা আস্থা রাখতে পার যে, আমার প্রেরণকারী যা বলেছেন কমবেশী না করে ঠিক ততটুকুই আমি তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দেব। (প্রকাশ থাকে যে হযরত মূসা সর্বপ্রথম যখন তাঁর দাওয়াত পেশ করেছিলেন তখন এই দুটি কথা বলেছিলেন)।

১৮. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করছো প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ, আমার যেসব কথা শুনে তোমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছো তা আমার নয়, আল্লাহর কথা। আমি তাঁর রসূল হিসেবে এসব কথা বলছি। আমি আল্লাহর রসূল কিনা এ ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে আমি তোমাদের সামনে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি। এই প্রমাণ বলতে কোন একটি মাত্র মু'জিযা বুঝানো হয়নি। বরং ফেরাউনের দরবারে প্রথমবার পৌছার পর থেকে মিসরে অবস্থানের সর্বশেষ সময় পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে যেসব মু'জিযা মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউন ও তার কওমকে দেখিয়েছেন তার সবগুলোকে বুঝানো হয়েছে। তারা যে প্রমাণটিই অস্বীকার করেছে তিনি পরে তার চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আয যুখরুফ, টীকা নম্বর ৪২ ও ৪৩)।

১৯. এটা সেই সময়ের কথা যখন হযরত মূসার পেশকৃত সমস্ত নিদর্শন দেখা সত্বেও ফেরাউন তার জিদ ও হঠকারিতা বজায় রেখে চলছিলো। কিন্তু মিসরের সাধারণ ও অসাধারণ সব মানুষই প্রতিনিয়ত এসব নিদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে দেখে সে অস্থির হয়ে উঠছিলো। সেই যুগেই প্রথমে সে ভরা দরবারে বক্তৃতা করে যা সূরা যুখরুফের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াতে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে (দেখুন, সূরা যুখরুফের ৪৫ থেকে ৪৯ টীকা)। তারপর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে দেখে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর রসূলকে হত্যা করতে মনস্থ করে। ঐ সময় হযরত মূসা (আ) সেই কথাটি বলেছিলেন যা সূরা মু'মিনের ২৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

إِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ –

"যে অহংকারী জবাবদিহির দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না আমি তার থেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমার ও তোমাদের যিনি রব, তার কাছে।"

এখানে হযরত মূসা (আ) তাঁর সেই কথা উল্লেখ করে ফেরাউন ও তার রাজকীয় সভাসদদের বলছেন, দেখো, আমি তোমাদের সমস্ত হামলার মোকাবিলার জন্য ইতিপূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আশ্রয় চেয়েছি। এখন তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণ কামনা করো তাহলে আমার ওপর হামলা করা থেকে বিরত থাকো। আমার কথা মানতে না চাইলে না মানো। আমাকে কখনো আঘাত করবে না। অন্যথায়, ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

২০. এটা হযরত মূসা কর্তৃক তাঁর রবের কাছে পেশকৃত সর্বশেষ রিপোর্ট। 'এসব লোক অপরাধী' অর্থাৎ এদের অপরাধী হওয়াটা এখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এদের প্রতি আনুকূল্য দেখানো এবং এদেরকে সংশোধনের সুযোগ দানের অবকাশ আর নেই। এখন জনাবের চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়ার সময় এসে গিয়েছে।

২১. অর্থাৎ সেই সব লোককে যারা ঈমান এনেছে। তাদের মধ্যে বনী ইসরাঈলও ছিল এবং হযরত ইউসুফের যুগ থেকে হযরত মূসার যুগের আগমন পর্যন্ত মিসরের যেসব কিবতী মুসলমান হয়েছিলো তারাও। আবার সেই সব মিসরীয় লোকও যারা হযরত মূসার নিদর্শনসমূহ দেখে এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, টীকা ৫৮)

২২. এটা হযরত মূসাকে হিজরতের জন্য দেয়া প্রাথমিক নির্দেশ। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বাহা, টীকা ৫৩; আশ শুআরা টীকা ৩৯ থেকে ৪৭)।

২৩. এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সেই সময় যখন হযরত মূসা তাঁর কাফেলাসহ সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছেন এবং তিনি চাচ্ছিলেন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে যাওয়ার আগে তা যেমন ছিল লাঠির আঘাতে পুনরায় তেমন করে দেবেন। যাতে মু'জিযার সাহায্যে যে রাস্তা তৈরী হয়েছে ফেরাউন ও তার সৈন্য-সামন্ত সেই রাস্তা ধরে এসে না পড়ে। সেই সময় বলা হয়েছিলো, তা যেন না করা হয়। সমুদ্রকে ঐভাবেই বিভক্ত থাকতে দাও, যাতে ফেরাউন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এই রাস্তায় নেমে আসে। তারপর সমুদ্রের পানি ছেড়ে দিয়ে এই গোটা সেনাবাহিনীকে ডুবিয়ে মারা হবে।

২৪. হযরত হাসান বাসারী বলেন ঃ এর অর্থ বনী ইসরাঈল, যাদেরকে ফেরাউনের কওমের ধ্বংসের পর আল্লাহ মিসরের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। কাতাদা বলেন ঃ এর অর্থ অন্য জাতির লোক, যারা ফেরাউনের অনুসারীদের ধ্বংস করার পরে মিসরের উত্তরাধিকারী হয়েছিলো। কারণ, ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নেই যে, মিসর থেকে বের হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা আর কখনো সেখানে ফিরে গিয়েছিলো এবং সে দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলো। পরবর্তীকালের মুফাসসিরদের মধ্যেও এই মতভেদ দেখা যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শুআরা, টীকা ৪৫)।

২৫. অর্থাৎ তারা যখন শাসক ছিল তখন তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজতো। পৃথিবীতে তাদের প্রশংসা গীত প্রতিধ্বনিত হতো। তাদের আগে ও পিছে চাটুকারদের ভিড় লেগে থাকতো। তাদের এমন ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা হতো যেন গোটা জগতই তাদের গুণাবলীর ভক্ত-অনুরক্ত, তাদের দয়া ও করুণার দানে ঋণী এবং পৃথিবীতে তাদের চেয়ে জনপ্রিয় আর কেউ নেই। কিন্তু যখন তাদের পতন হলো একটি চোখ থেকেও তাদের জন্য

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝٣٠ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ۝٣١ وَلَقَدِ اخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَٰلَمِينَ ۝٣٢ وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ الْءَايَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا مُّبِينٌ ۝٣٣ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ۝٣٤ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۝٣٥

২ রুকূ'

এভাবে আমি বনী ইসরাঈলদের কঠিন অপমানজনক আযাব, ফেরাউন[২৬] থেকে নাযাত দিয়েছিলাম। সীমালংঘনকারীদের মধ্যে সে ছিল প্রকৃতই উচ্চ পর্যায়ের লোক।[২৭] তাদের অবস্থা জেনে শুনেই আমি দুনিয়ার অন্য সব জাতির ওপর তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম।[২৮] তাদেরকে এমন সব নিদর্শন দেখিয়েছিলাম যার মধ্যে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।[২৯]

এরা বলে : আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। এরপর আমাদের পুনরায় আর উঠানো হবে না।[৩০]

অশ্রুপাত হয়নি বরং সবাই প্রাণ ভরে এমন শ্বাস নিয়েছে যেন তার পাঁজরে বিদ্ধ কাঁটাটি বের হয়ে গিয়েছে। একথা সবারই জানা, তারা আল্লাহর বান্দাদের কোন কল্যাণ করেনি যে তারা তার জন্য কাঁদবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যও কোন কাজ করেনি যে, আসমান–বাসীরা তাদের ধ্বংসের কারণে আহাজারি করবে। আল্লাহর ইচ্ছানুসারে যতদিন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তারা পৃথিবীর বুকের ওপর দুর্বলদের অত্যাচার করেছে। কিন্তু তাদের অপরাধের মাত্রা সীমালংঘন করলে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে যেমন ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়।

২৬. অর্থাৎ তাদের জন্য ফেরাউন নিজেই ছিল লাঞ্ছনাকর আযাব। অন্য সব আযাব ছিল এই মূর্তিমান আযাবের শাখা–প্রশাখা।

২৭. এর মধ্যে কুরাইশ গোত্রের কাফের নেতাদেরকে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে। অর্থাৎ দাসত্বের সীমালংঘনকারীদের মধ্যে তোমরা কি এমন মর্যাদার অধিকারী? অতি বড় বিদ্রোহী তো ছিল সেই যে তৎকালীন পৃথিবীর সবচাইতে বড় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে খোদায়ীর দাবী নিয়ে বসেছিলো। তাকেই যখন খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে তোমাদের এমন কি অস্তিত্ব আছে যে আল্লাহর আযাবের সামনে টিকে থাকেব?

২৮. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের গুণাবলী ও দুর্বলতা উভয় দিকই আল্লাহর জানা ছিল। তিনি না দেখে শুনে অন্ধভাবে তাদেরকে বাছাই করেননি। সেই সময় পৃথিবীতে যত জাতি ছিল তাদের মধ্য থেকে তিনি এই জাতিকে যখন তাঁর বার্তাবাহক এবং তাওহীদের

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

"যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো।"[৩১] 'এরাই উত্তম না তুব্বা' কওম[৩২] এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা? আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম। কারণ তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিলো।[৩৩] আমি এই আসমান ও যমীন এবং এর মাঝের সমস্ত জিনিস খেলাচ্ছলে তৈরী করিনি। এসবই আমি যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।[৩৪] এদের সবার পুনরুজ্জীবনের জন্য নির্ধারিত সময়টিই এদের ফায়সালার দিন।[৩৫] সেটি এমন দিন যেদিন কোন নিকটতম প্রিয়জনও[৩৬] কোন নিকটতম প্রিয়জনের কাজে আসবে না এবং আল্লাহ যাকে রহমত দান করবেন সে ছাড়া তারা কোথাও থেকে কোন সাহায্য লাভ করবে না। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও অত্যন্ত দয়াবান।[৩৭]

দাওয়াতের ঝাণ্ডাবাহী বানানোর জন্য মনোনীত করলেন তখন তা করেছিলেন এ জন্য যে, তাঁর জ্ঞানে তৎকালীন জাতিসমূহের মধ্যে এরাই তার উপযুক্ত ছিল।

২৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৬৪ থেকে ৮৫; আন নিসা, টীকা ১৮২ থেকে ১৯৯; আল মায়েদা, টীকা ৪২ থেকে ৪৭; আল আ'রাফ, টীকা ৯৭ থেকে ১৩; ত্বাহা, টীকা ৫৬ থেকে ৭৪।

৩০. অর্থাৎ প্রথমবার মরার পরই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। তারপর আর কোন জীবন নেই। 'প্রথম মৃত্যু' কথা দ্বারা একথা বুঝায় না যে, এরপর আরো মৃত্যু আছে। আমরা যখন বলি, অমুক ব্যক্তির প্রথম সন্তান জন্ম নিয়েছে তখন একথা সত্য হওয়ার জন্য জরুরী নয় যে, এরপর অবশ্যই তার দ্বিতীয় সন্তান জন্ম নেবে। একথার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে তার কোন সন্তান হয়নি।

৩১. তাদের যুক্তি ছিল এই যে, মৃত্যুর পর আমরা কখনো কাউকে পুনরায় জীবিত হতে দেখিনি। তাই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন হবে না। তোমরা যদি দাবী করো, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন হবে তাহলে আমাদের বাপদাদাদের কবর থেকে উঠিয়ে আনো যাতে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তোমরা যদি তা না করো তাহলে আমরা মনে করবো তোমাদের দাবী ভিত্তিহীন। তাদের মতে এটা যেন মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করার মজবুত প্রমাণ। অথচ এটি একেবারেই নিরর্থক কথা। কে তাদেরকে একথা বলেছে যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে আবার এই দুনিয়াতেই ফিরে আসবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কোন মুসলমান কবে এ দাবী করেছিলো যে, আমরা মৃতদের জীবিত করতে পারি?

৩২. হিময়ার গোত্রের বাদশাহদের উপাধি ছিল তুব্বা' যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের উপাধি ছিল কিসরা, কায়সার, ফেরাউন প্রভৃতি। তুব্বা' কওম সাবা কওমের একটি শাখার সাথে সম্পর্কিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১১৫ সনে এরা সাবা দেশটি দখল করে এবং ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তা শাসন করে। শত শত বছর ধরে আরবে এদের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী সবার মুখে মুখে ছিল (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ৩৭)।

৩৩. এটা কাফেরদের আপত্তির প্রথম জবাব। এ জবাবের সারকথা হচ্ছে, আখেরাত অস্বীকৃতি এমনই জিনিস যা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিকে অপরাধী না বানিয়ে ছাড়ে না। নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া এর অনিবার্য ফল। মানবেতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে জাতিই জীবন সম্পর্কে এই মতবাদ গ্রহণ করেছে পরিণামে সে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন বাকি থাকে এই প্রশ্নটির ব্যাখ্যা, যে, "এরাই উত্তম না তুব্বা' কওম এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা?" এর অর্থ হচ্ছে, তুব্বা' কওম তার পূর্বের সাবা ও ফেরাউনের কওম এবং আরো অন্য কওম যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গৌরব ও শান-শওকত অর্জন করেছিলো মক্কার এই কাফেররা তার ধারে কাছেও পৌছতে পারেনি। কিন্তু এই বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পার্থিব গৌরব ও জাঁকজমক নৈতিক অধপতনের ভয়াবহ পরিণাম থেকে কবে তাদের রক্ষা করতে পেরেছিলো যে, তারা নিজেদের সামান্য পুঁজি এবং উপায়-উপকরণের জোরে তা থেকে রক্ষা পাবে? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ২৫ ও ৩৬)।

৩৪. এটা তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। এর সারমর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তিই মৃত্যুর পরের জীবন এবং আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তিকে অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে সে এই বিশ্ব সংসারকে খেলনা এবং তার স্রষ্টাকে নির্বোধ শিশু মনে করে। তাই সে এই সিদ্ধান্তে পৌছে যে, মানুষ এই পৃথিবীতে সব কিছু করে একদিন এমনি মাটিতে মিশে যাবে এবং তার ভাল বা মন্দ কাজের কোন ফলাফল দেখা দেবে না। অথচ এই বিশ্ব জাহান কোন খেলোয়াড়ের সৃষ্টি নয়, এক মহাজ্ঞানী স্রষ্টার সৃষ্টি। মহাজ্ঞানী সত্তা কোন অর্থহীন কাজ করবেন তা আশা করা যায় না। আখেরাত অস্বীকৃতির জবাবে কুরআনের বেশ কয়েকটি স্থানে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে এবং আমরা তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও পেশ করেছি (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আনয়াম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১০ ও ১১; আল আম্বিয়া, টীকা ১৬ ও ১৭; আল মু'মিনুন, টীকা ১০১ ও ১০২; আর রূম, টীকা ৪ থেকে ১০)।

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৩ রুক্‌'

'যাককূম[৩৮] গাছ হবে গোনাগারদের খাদ্য। তেলের তলানির মত।[৩৯] পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলাতে থাকবে যেমন ফুটন্ত পানি উথলায়। পাকড়াও করো একে এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যখানে। তারপর ঢেলে দাও তার মাতার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব। এখন এর মজা চাখো। তুমি বড় সম্মানী ব্যক্তি কিনা, তাই। এটা সেই জিনিস যার আমার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।

৩৫. এটা তাদের এই দাবীর জবাব যে, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের বাপ–দাদাদের জীবিত করে আনো। অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন কোন তামাশা নয় যে, যেখানেই কেউ তা অস্বীকার করবে তখনি কবরস্থান থেকে একজন মৃতকে জীবিত করে তাদের সামনে এনে হাজির করা হবে। বিশ্ব জাহানের রব এ জন্য একটি সময় বেঁধে দিয়েছেন। সেই সময় তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সবাইকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর আদালতে সমবেত করবেন এবং তাদের মোকদ্দমার রায় ঘোষণা করবেন। তোমরা বিশ্বাস করো কিংবা না–ই করো, এ কাজ নির্দিষ্ট সময়েই হবে। তোমরা বিশ্বাস করলে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। কারণ, এভাবে সময় থাকতেই সতর্ক হয়ে ঐ আদালতে সফলকাম হওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারবে। বিশ্বাস না করলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। কারণ সে ক্ষেত্রে এই ভুলের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করবে যে ভাল–মন্দ যাই আছে এই দুনিয়া পর্যন্তই তা সীমাবদ্ধ। মৃত্যুর পর কোন আদালত হবে না যেখানে আমাদের ভাল অথবা মন্দ কাজকর্মের স্থায়ী কোন ফল থাকতে পারে।

৩৬. মূল আয়াতে مولى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়, যে কোন সম্পর্কের কারণে অন্য কোন ব্যক্তিকে সহযোগিতা করে। সেই সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক কিংবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন প্রকারের সম্পর্ক হোক তা দেখার বিষয় নয়।

৩৭. ফায়সালার দিন যে আদালত কায়েম হবে তা কেমন প্রকৃতির হবে সে কথা এই আয়াতাংশগুলোতে বলা হয়েছে। সেদিন কারো সাহায্য–সহযোগিতা কোন অপরাধীকে রক্ষা করতে কিংবা তার শাস্তি হ্রাস করতে পারবে না। নিরংকুশ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

আল্লাহভীরু লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গায় থাকবে[৪০] বাগান ও ঝর্ণা ঘেরা জায়গায়। তারা রেশম ও মখমলের[৪১] পোশাক পরে সামনাসামনি বসবে। এটা হবে তাদের অবস্থা। আমি সুন্দরী হরিণ নয়না[৪২] নারীদের সাথে তাদের বিয়ে দেবো। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে মনের সুখে সবরকম সুস্বাদু জিনিস চেয়ে চেয়ে নেবে।[৪৩] সেখানে তারা কখনো মৃত্যুর স্বাদ চাখবে না। তবে দুনিয়াতে যে মৃত্যু এসেছিলো তা তো এসেই গেছে। আর আল্লাহ তাঁর করুণায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।[৪৪] এটাই বড় সফলতা।

হে নবী, আমি এই কিতাবকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে এই লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। এখন তুমিও অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষা করছে।[৪৫]

সত্যিকার সেই বিচারকের হাতে থাকবে যার সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়া রোধ করার শক্তি কারো নেই এবং যার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও কারো নেই। তিনি দয়াপরবশ হয়ে কাকে শাস্তি দিবেন না আর কাকে কম শাস্তি দিবেন এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজের বিচার–বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে। ইনসাফ করার ক্ষেত্রে তিনি দয়ামায়াহীনতা নয় বরং দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেন এবং এটাই তাঁর নীতি। কিন্তু যার মোকদ্দমায় যে ফায়সালাই তিনি করবেন তা সর্বাবস্থায় অবিকল কার্যকর হবে। আল্লাহর আদালতের এই অবস্থা বর্ণনা করার পর যারা ঐ আদালতে অপরাধী প্রমাণিত হবে তাদের পরিণাম কি হবে এবং যাদের সম্পর্কে প্রমাণিত হবে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকেছে তাদেরকে কি কি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে ছোট ছোট কয়েকটি বাক্যে তা বলা হয়েছে।

৩৮. 'যাক্‌কুম'–এর ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফফাত, টীকা ৩৪।

৩৯. মূল আয়াতে المهل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার কয়েকটি অর্থ আছে ঃ গলানো ধাতু, পুঁজ, রক্ত, গলানো আলকাতরা, লাভা এবং তেলের তলানি। আরবী ভাষাভাষী এবং মুফাসসিরগণ এই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। আমাদের দেশে যাকে ফনীমনসা বলা হয় 'যাক্‌কুম' বলতে যদি সেই জিনিসকেই বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে তা চিবালে যে রস নির্গত হবে তা তেলের তলানির সাথে বেশী সাদৃশ্য পূর্ণ হবে।

৪০. শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গা অর্থ এমন জায়গা যেখানে কোন প্রকার আশংকা থাকবে না। কোন দুঃখ, অস্থিরতা, বিপদ, আশংকা এবং পরিশ্রম ও কষ্ট থাকবে না। হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীদের বলে দেয়া হবে, তোমরা এখানে চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না, চিরদিন জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না, চিরদিন সুখী থাকবে, কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হবে না এবং চিরদিন যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না।" (মুসলিম—আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীস)।

৪১. মূল আয়াতে سُنْدُس ও اِسْتَبْرَق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়কে سُنْدُس বলে। اِسْتَبْرَق ফারসী শব্দ এর আরবী রূপ। মোটা রেশমী কাপড় বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৪২. মূল শব্দ হচ্ছে حُوْرٌعِيْن । حُوْر শব্দটি حَوْرَاء শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় সুন্দরী নারীকে حَوْرَاء বলা হয়। عين শব্দটি عيناء শব্দের বহুবচন। এ শব্দটি বড় চোখ বিশিষ্ট নারীদের বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেকুন, সূরা সাফ্‌ফাত, টীকা ২৬ ও ২৯)।

৪৩. 'নিশ্চিন্তে মনের সুখে' চাওয়ার অর্থ যে জিনিস যত পরিমাণে ইচ্ছা দ্বিধাহীনভাবে জান্নাতের খাদেমদেরকে তা আনার নির্দেশ দেবে এবং তা এনে হাজির করা হবে। দুনিয়াতে হোটেল তো দূরের কথা কোন ব্যক্তি নিজের বাড়ীতেও এরূপ নিশ্চিন্তে ও মনের সুখে কোন কিছু এমনভাবে চাইতে পারে না যেমন সে জান্নাতে চাইবে। কারণ, এখানে কারো কাছেই কোন জিনিসের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে না। এবং ব্যক্তি যাই ব্যবহার করে তার মূল্য তাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হয়। জান্নাতে সম্পদ হবে আল্লাহর এবং ব্যক্তিকে তা ব্যবহারের অবাধ অনুমতি দেয়া হবে। কোন জিনিসের ষ্টক শেষ হয়ে যাওয়ার বিপদ যেমন থাকবে না তেমনি পরে বিল আসারও কোন প্রশ্ন থাকবে না।

৪৪. এ আয়াতে দুটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

এক—জান্নাতের নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করার পর জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার কথা আলাদা করে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। অথচ কোন ব্যক্তির জান্নাত লাভ করাই আপনা আপনিই তার জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়াকে অনিবার্য করে তোলে। এর কারণ, মানুষ আনুগত্যের পুরস্কারের মূল্য পুরোপুরি তখনই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যখন নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে সে কোথায় পৌঁছেছে এবং কোন ধরনের মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়েছে তা তার সামনে থাকে।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, এ লোকদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করাকে আল্লাহ তাঁর দয়ার ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করছেন। এর দ্বারা মানুষকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর অনুগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ভাগ্যেই এই সফলতা আসতে পারে না। ব্যক্তি তার সৎকর্মের পুরস্কার লাভ করবে। কিন্তু প্রথমত আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ব্যক্তি তার সৎকর্ম করার তাওফীক বা সামর্থ কিভাবে লাভ করবে। তাছাড়া ব্যক্তি দ্বারা যত উত্তম কাজই সম্পন্ন হোক না কেন তা পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণতর হতে পারে না। সুতরাং সে কাজ সম্পর্কে দাবী করে একথা বলা যাবে না যে, তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা নেই। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তিনি বান্দার দুর্বলতা এবং তার কাজকর্মের অপূর্ণতাসমূহ উপেক্ষা করে তার খেদমত কবুল করেন এবং তাকে পুরস্কৃত করে ধন্য করেন। অন্যথায়, তিনি যদি সূক্ষ্মভাবে হিসেব নিতে শুরু করেন তাহলে কার এমন দুঃসাহস আছে যে নিজের বাহুবলে জান্নাত লাভ করার দাবী করতে পারে? হাদীসে একথাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا ان احدا لن يدخله عمله الجنة

"আমল করো এবং নিজের সাধ্যমত সর্বাধিক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো। জেনে রাখো, কোন ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।"

লোকেরা বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনার আমলওকি পারবে না? তিনি বললেন ঃ

ولا انا الا ان يتغمدنى الله برحمته

"হাঁ, আমিও শুধু আমার আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবো না। তবে আমার রব যদি তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করেন।"

৪৫. অর্থাৎ এখন যদি এসব লোক উপদেশ গ্রহণ না করে তাহলে দেখো, কিভাবে তাদের দুর্ভাগ্য আসে। আর তোমার এই দাওয়াতের পরিণাম কি হয় তা দেখার জন্য এরাও অপেক্ষমান।

আল জাসিয়াহ

৪৫

নামকরণ

২৮ আয়াতের وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'জাসিয়াহ' শব্দ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়–কাল কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় এটি সূরা 'দুখান' নাযিল হওয়ার অল্প দিন পরই নাযিল হয়েছে। এ দুটি সূরার বিষয়বস্তুতে এতটা সাদৃশ্য বর্তমান যে সূরা দুটিকে যমজ বা যুগ্ম বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের সন্দেহ, সংশয় ও আপাত্তির জবাব দেয়া এবং কুরআনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে তারা যে নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে সতর্ক করা।

তাওহীদের সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনের প্রতি ইংগিত দিয়ে বলা হয়েছে, যেদিকেই চোখ মেলে তাকাও না কেন তোমরা যে তাওহীদ মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছো প্রতিটি বস্তু তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। নানা রকমের এসব জীব–জন্তু, এই রাতদিন, এই বৃষ্টিপাত এবং তার সাহায্যে উৎপন্ন উদ্ভিদ রাজি, এই বাতাস এবং মানুষের নিজের জন্ম এর সবগুলো জিনিসকে কোন ব্যক্তি যদি চোখ মেলে দেখে এবং কোন প্রকার গোঁড়ামি বা অন্ধ আবেগ ছাড়া নিজের বিবেক–বুদ্ধিকে সরাসরি কাজে লাগিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে এসব নিদর্শন তার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট যে এই বিশ্ব জাহান খোদাহীন নয় বা এখানে বহু খোদায়ী চলছে না, বরং এক আল্লাহ এটি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একাই এর ব্যবস্থাপক ও শাসক। তবে যে ব্যক্তি মানবে না বলে শপথ করেছে কিংবা সন্দেহ–সংশয়ের মধ্যে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কথা ভিন্ন। দুনিয়ার কোন জায়গা থেকেই সে ঈমান ও ইয়াকীনের সম্পদ লাভ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় রুকূ'র শুরুতে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে মানুষ যত জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করছে এবং এই বিশ্ব জাহানে যে সীমাসংখ্যাহীন বস্তু ও শক্তি তার স্বার্থের সেবা করছে

তা আপনা আপনি কোথাও থেকে আসেনি বা দেব–দেবীরাও তা সরবরাহ করেনি, বরং এক আল্লাহই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাকে এসব দান করেছেন এবং এসবকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। কেউ যদি সঠিকভাবে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে তার বিবেক–বুদ্ধিই বলে দেব, সেই আল্লাহই মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী মানুষ তাঁর শোকর গোজারী করবে এটা তাঁর প্রাপ্য।

এরপর মক্কার কাফেররা হঠকারিতা, অহংকার, ঠাট্টা–বিদ্রূপ এবং কুফরকে আঁকড়ে ধরে থেকে কুরআনের দাওয়াতের যে বিরোধিতা করছিলো। সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে এবং সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ কুরআন সেই নিয়ামত নিয়ে এসেছে যা ইতিপূর্বে বনী–ইসরাঈলদের দেয়া হয়েছিলো যার কল্যাণে বনী ইসরাঈলরা গোটা বিশ্বের সমস্ত জাতির ওপর মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলো। কিন্তু তারা এই নিয়ামতের অমর্যাদা করেছে এবং দীনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করে তা হারিয়ে ফেলেছে। তাই এখন তা তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটা এমন একটি হিদায়াতনামা যা মানুষকে দীনের পরিষ্কার রাজপথ দেখিয়ে দেয়। নিজেদের অজ্ঞতা ও বোকামির কারণে যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তারা নিজেদেরই ধ্বংসের আয়োজন করবে। আর আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের উপযুক্ত বিবেচিত হবে কেবল তারাই যারা এর আনুগত্য করে তাকওয়ার নীতি ও আচরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের বলা হয়েছে, এসব লোক আল্লাহকে ভয় করে না। এরা তোমাদের সাথে যে অশোভন আচরণ করছে তা উপেক্ষা করো এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো। তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করলে আল্লাহ নিজেই এদের সাথে বুঝাপড়া করবেন এবং তোমাদের এই ধৈর্যের প্রতিদান দিবেন।

তারপর আখেরাত বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত কাফেরদের জাহেলী ধ্যান–ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। কাফেররা বলতো ঃ এই দুনিয়ার জীবনই সব। এরপর আর কোন জীবন নেই। যুগের বিবর্তনে আমরা ঠিক তেমনি মরে যাব যেমন একটি ঘড়ি চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে রূহের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না যে, তা কব্জ করা হবে এবং পুনরায় কোন এক সময় এনে দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। তোমরা যদি এ ধরনের দাবী করো তাহলে আমাদের মৃত বাপ–দাদাদের জীবিত করে দেখাও। এর জবাবে আল্লাহ একের পর এক কয়েকটি যুক্তি পেশ করেছেন ঃ

এক ঃ কোন জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে তোমরা একথা বলছো না, বরং শুধু ধারণার ভিত্তিতে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছ। সত্যিই কি তোমাদের জানা আছে যে, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই এবং রূহ কব্জ করা হয় না, বরং ধ্বংস হয়ে যায়?

দুই ঃ তোমাদের এই দাবীর ভিত্তি বড় জোর এই যে, তোমরা কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে দেখোনি। এতটুকু বিষয়ই কি এতবড় দাবী করার জন্য যথেষ্ট যে মৃতরা আর কখনো জীবিত হবে না? তোমাদের অভিজ্ঞতায় ও পর্যবেক্ষণে কোন জিনিস ধরা না পড়ার অর্থ কি এই যে, তোমরা তার অস্তিত্বহীন হওয়ার জ্ঞান লাভ করেছো?

তিন ঃ এ কথা সরাসরি বিবেক–বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী যে ভাল ও মন্দ, অনুগত ও অবাধ্য এবং জালেম ও মজলুম সবাইকে শেষ পর্যন্ত একই পর্যায়ভুক্ত করে দেয়া হবে। কোন ভাল কাজের ভাল ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দেখা দেবে না। কোন মজলুমের আর্তনাদ শোনা হবে না কিংবা কোন জালেম তার কৃতকর্মের শাস্তি পাবে না। বরং সবাই একই পরিণাম ভোগ করবে। আল্লাহর সৃষ্ট এই বিশ্ব জাহান সম্পর্কে যে এই ধারণা পোষণ করে সে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। জালেম ও দুষ্কর্মশীল লোকদের এ ধারণা পোষণ করার কারণ হলো এই যে, তারা তাদের কাজ–কর্মের মন্দ ফলাফল দেখতে চায় না। কিন্তু আল্লাহর এই সার্বভৌম কর্তৃত্ব কোন অনিয়মের রাজত্ব নয়। এটি একটি ন্যায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, যেখানে সৎ ও অসৎকে এক পর্যায়ভুক্ত করে দেয়ার মত জুলুম কখনো হবে না।

চার ঃ আখেরাত অস্বীকৃতির এই আকীদা নৈতিকতার জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। এই আকীদা তারাই গ্রহণ করে যারা প্রবৃত্তির দাস হয়ে আছে। তারা এ আকীদা গ্রহণ করে এ জন্য, যাতে প্রবৃত্তির দাসত্ব করার অবাধ সুযোগ লাভ করতে পারে। কাজেই তারা যখন এ আকীদা গ্রহণ করে তখন তা তাদেরকে চরমতম গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। এমনকি তাদের নৈতিক অনুভূতি একেবারেই মরে যায় এবং হিদায়াত লাভের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

এসব যুক্তি–প্রমাণ পেশ করার পর আল্লাহ অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছেন, যেভাবে তোমরা নিজে নিজেই জীবন লাভ করোনি, আমি জীবন দিয়েছি বলে জীবন লাভ করেছো, তেমনি নিজে নিজেই মরে যাবে না, বরং আমি মৃত্যু দেই বলে মারা যাও এবং এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমাদের সবাইকে যুগপৎ একত্র করা হবে। আজ যদি মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তোমরা একথা না মানতে চাও তাহলে মেনো না। কিন্তু সে সময়টি যখন আসবে তখন নিজের চোখেই তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমরা তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির আছো এবং কোন প্রকার কমবেশী ছাড়াই তোমাদের পুরো আমলনামা প্রস্তুত আছে, যা তোমাদের প্রতিটি কাজের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে সময় তোমরা জানতে পারবে আখেরাতের আকীদার এই অস্বীকৃতি এবং এ নিয়ে যে ঠাট্টা–বিদ্রূপ তোমরা করছো এর কত চড়া মূল্য তোমাদের দিতে হচ্ছে।

পরম করুণাময় ও মেহেরবান আল্লাহর নামে

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا
يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَتَصْرِيْفِ الرِّيْحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ
بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

হা–মীম। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[১]

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মু'মিনদের জন্য আসমান ও যমীনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।[২] তোমাদের নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে এবং যেসব জীব–জন্তুকে আল্লাহ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তার মধ্যে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের জন্য।[৩] তাছাড়া রাত ও দিনের পার্থক্য ও ভিন্নতার মধ্যে,[৪] আল্লাহ আসমান থেকে যে রিযিক[৫] নাযিল করেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে যে জীবিত করে তোলেন তার মধ্যে[৬] এবং বায়ু প্রবাহের আবর্তনের মধ্যে[৭] অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বুদ্ধি–বিবেচনাকে কাজে লাগায়। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি তোমাদের সামনে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাদি ছাড়া এমন আর কি আছে যার প্রতি এরা ঈমান আনবে?[৮]

১. এটা এই সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এতে শ্রোতাদেরকে দুটি বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এর একটি বিষয় হচ্ছে, এ কিতাব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

নিজের রচনা নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হচ্ছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, এ কিতাব নাযিল করছেন আল্লাহ, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। তাঁর মহাপরাক্রমশালী হওয়ার দাবী হলো, মানুষ যেন তাঁর আদেশের অবাধ্য হওয়ার দুঃসাহস না দেখায়। কারণ অবাধ্য হয়ে সে তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। তাঁর মহাজ্ঞানী হওয়ার দাবী হলো মানুষ পূর্ণ মানসিক প্রশান্তিসহ স্বেচ্ছায় আগ্রহ নিয়ে তাঁর হিদায়াত ও আদেশ–নিষেধ পালন করবে। কারণ, তাঁর শিক্ষা ভ্রান্ত, অসংগত ও ক্ষতিকর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

২. ভূমিকার পর মূল বক্তব্য এভাবে শুরু করায় স্পষ্ট বুঝা যায় এর পটভূমিতে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার বিরুদ্ধে মক্কার লোকদের পেশকৃত আপত্তিসমূহ। তারা বলতো ঃ আজ পর্যন্ত যেসব সম্মানিত সত্তার আস্তানার সাথে আমাদের ভক্তি–শ্রদ্ধা জড়িত তারা সবাই তুচ্ছ। নগণ্য আর সার্বভৌম কর্তৃত্ব শুধু এক মাত্র আল্লাহর, এক ব্যক্তির কথায় এত বড় একটা জিনিস আমরা কি করে মেনে নেই। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যে সত্যটি মানার জন্য তোমাদের আহবান জানানো হচ্ছে সারা বিশ্ব জাহান তার সত্যতার নিদর্শনে ভরা। চোখ মেলে দেখো। তোমাদের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র শুধু নিদর্শনই ছড়িয়ে আছে। এসব নিদর্শন সাক্ষ্য দিচ্ছে, গোটা এই বিশ্ব জাহান একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি এবং তিনি একাই এর মালিক, শাসক ও ব্যবস্থাপক। আসমান ও যমীনে কোন জিনিসের নিদর্শন আছে তা বলার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তখন বিবাদের মূল বিষয় ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহর সাথে অন্য সব খোদা এবং উপাস্যদের মানার জন্য জিদ ধরেছিলো। পক্ষান্তরে কুরআনের দাওয়াত ছিল এই যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। তাই নিদর্শনসমূহ অর্থ যে তাওহীদের সত্যতা ও শিরক বাতিল হওয়ার নিদর্শন একথা বলা না হলেও পরিবেশ পরিস্থিতি থেকেই তা প্রকাশ পাচ্ছিলো।

তাছাড়া এই যে বলা হয়েছে, "এসব হচ্ছে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন" এর অর্থ, যদিও এগুলো সমস্ত মানুষের জন্যই নিদর্শন, কিন্তু এসব দেখে সঠিক সিদ্ধান্ত কেবল তারাই নিতে পারে যারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত। গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকা মানুষ, যারা পশুর ন্যায় বেঁচে থাকে এবং একগুঁয়ে ও জেদী লোক, যারা না মানার সংকল্প করে বসেছে তাদের জন্য এগুলো নিদর্শন হওয়া না হওয়া সমান কথা। বাগানের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য তো চক্ষুষ্মানদের জন্য। অন্ধরা কোন চাকচিক্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না। তাদের জন্য বাগানের অস্তিত্বই অর্থহীন।

৩. অর্থাৎ যারা না মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিংবা যারা নিজেদের জন্য সন্দেহের গোলক ধাঁধায় হাতড়িয়ে বেড়ানো পসন্দ করেছে তাদের ব্যাপার তো ভিন্ন। কিন্তু যাদের মনের দরজা বন্ধ হয়নি তারা যখন নিজের জন্মের প্রতি নিজের অস্তিত্বের গঠন আকৃতির প্রতি এবং পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা নানা রকম জীব–জন্তুর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাবে তখন এমন অসংখ্য আলামত দেখতে পাবে যা দেখার পর এ সন্দেহ পোষণের সামান্যতম অবকাশও থাকবে না যে, এসব কিছু হয়তো কোন আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে কিংবা তার

সৃষ্টির ক্ষেত্রে হয়তো একাধিক খোদার হাত আছে (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ২৫ থেকে ২৭; আন নাহল, টীকা ৭ থেকে ৯; আল হাজ্জ, টীকা ৫ থেকে ৯; আল মুমিনূন টীকা ১২ ও ১৩; আল ফুরকান টীকা ৬৯; আশ শুআরা, টীকা ৫৭ ও ৫৮; আন নামল, টীকা ৮০; আর রূম, টীকা ২৫ থেকে ৩২ ও ৭৯; আস সাজদা, টীকা ১৪ থেকে ১৮; ইয়াসীন, আয়াত ৭১ থেকে ৭৩; আয যুমার আয়াত ৬ এবং আল মু'মিন, টীকা ৯৭, ৯৮ ও ১১০)।

৪. রাত ও দিনের এই পার্থক্য ও ভিন্নতা এদিক দিয়েও নিদর্শন যে, দুটিই পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে একটার পর আরেকটা আসে। আবার এদিক দিয়েও নিদর্শন যে একটি আলো আরেকটি অন্ধকার। তাছাড়া তার নিদর্শন হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দিন ক্রমান্বয়ে ছোট এবং রাত বড় হতে থাকে এবং এক সময়ে দুটি এক সমান হয়ে যায়। তারপর আবার ক্রমান্বয়ে দিন বড় এবং রাত ছোট হতে থাকে। তারপর এক সময় দিন রাত আবার সমান হয়ে যায়। রাত ও দিনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের এই যে, পার্থক্য ও ভিন্নতা দেখা যায় তার সাথে বিরাট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জড়িত। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্টরূপে একথাই প্রমাণ করে যে, সূর্য, পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব বস্তুর স্রষ্টা মাত্র একজন এবং তিনি এক মহাশক্তির সত্তা। তিনিই এ দুটি গ্রহকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কোন অন্ধ, বধির ও অযৌক্তিক ক্ষমতা নয়, বরং এমন জ্ঞানগর্ভ ক্ষমতা যা এই অনড় হিসাব-নিকাশ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীকে তার সৃষ্ট উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষের মত অসংখ্য প্রজাতির জীবনসত্তার জীবন ধারণের উপযোগী করে দিয়েছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, টীকা ৬৫; আন নামল, টীকা-১০৪; আল কাসাস, টীকা ৯২; লোকমান, আয়াত ২৯; টীকা ৫০ ইয়াসীন, আয়াত ৩৭; টীকা ৩২)।

৫. এখানে রিযিক অর্থ যে বৃষ্টি তা পরবর্তী আয়াতাংশ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনুন, টীকা ১৭; আল ফুরকান, টীকা ৬২ থেকে ৬৫; আশ শুআরা, টীকা ৫, আন নামল, টীকা ৭৩ ও ৭৪; আর রূম, টীকা ৩৫ ও ৭৩ এবং ইয়াসীন, টীকা ২৬ থেকে ৩১।

৭. বায়ু প্রবাহ অর্থ বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্নভাবে হাওয়া প্রবাহিত হওয়া, যার কারণে ঋতুর পরিবর্তন সংঘটিত হয়। দেখার বিষয় শুধু এটাই নয় যে, পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরিভাগে একটি বিশাল বায়ু স্তর আছে যার মধ্যে এমন সব উপাদান বিদ্যমান যা প্রাণীকূলের শ্বাস গ্রহণের জন্য প্রয়োজন এবং বাতাসের এই আবরণ পৃথিবীবাসীদের বহু আসমানী বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বরং এর সাথে এটাও দেখার বিষয় যে, এ বাতাস উর্ধ বায়ুমণ্ডলে শুধু বিদ্যমান নয়, মাঝে মধ্যে তা বিভিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। কখনো মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়, কখনো তীব্রভাবে প্রবাহিত হয় এবং কখনো আবার ঝড় তুফানের রূপ ধারণ করে। কখনো শুষ্ক হাওয়া প্রবাহিত হয়, কখনো আর্দ্র হাওয়া প্রবাহিত হয়। কখনো বৃষ্টিবাহী হাওয়া প্রবাহিত হয় এবং কখনো আবার তা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার হাওয়া প্রবাহিত হয়। নানা ধরনের এসব বাতাস আপনা থেকেই এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হয় না। এরও একটা নিয়ম-কানুন ও শৃংখলা আছে, যা সাক্ষ্য দেয়, এ ব্যবস্থা পূর্ণ মাত্রায় যুক্তিনির্ভর এবং এর দ্বারা অতীব গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী পূরণ

ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও দুষ্কর্মশীল ব্যক্তির জন্য যার সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় এবং সে তা শোনে তারপর পুরো অহংকার নিয়ে কুফরীকে এমনভাবে আঁকড়ে থাকে যেন সে ঐগুলো শোনেইনি।[৯] এ রকম লোককে কষ্টদায়ক আযাবের সুখবর শুনিয়ে দাও। যখন সে আমার আয়াতসমূহের কোন কথা জানতে পারে তখন তা নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করে।[১০] এরূপ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম।[১১] তারা পৃথিবীতে যা কিছু অর্জন করেছে তার কোন জিনিসই তাদের কাজে আসবে না আবার আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে তারাও তাদের জন্য কিছু করতে পারবে না।[১২] তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি। এই কুরআন পুরাপুরি হেদায়াতের কিতাব। সেই লোকদের জন্য কঠিন জ্বালাদায়ক আযাব রয়েছে। যারা নিজেদের রব–এর আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

হচ্ছে। তাছাড়া পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থা অনুসারে শীত ও গ্রীষ্মের যে হ্রাস বৃদ্ধি হয় তার সাথেও এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাছাড়াও ঋতু পরিবর্তন ও বৃষ্টি বন্টনের সাথেও এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর সবগুলো জিনিসই ডেকে ডেকে বলছে, কোন অন্ধ প্রকৃতি আকস্মিকভাবে এর ব্যবস্থা করে দেয়নি। কিংবা সূর্য ও পৃথিবী হাওয়া ও পানি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের জন্য আলাদা আলাদা কোন ব্যবস্থাপক নেই। বরং নিশ্চিতরূপে এক মাত্র আল্লাহই এসবের স্রষ্টা এবং এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর জ্ঞান ও কৌশল এ ব্যবস্থা করেছে। তাঁর অসীম ক্ষমতাবলেই এ ব্যবস্থা পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চলছে।

৮. অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও তাঁর "ওয়াহদানিয়াত" বা একত্বের স্বপক্ষে স্বয়ং আল্লাহর পেশকৃত এসব যুক্তি–প্রমাণ সামনে আসার পরও যখন এসব লোক ঈমান গ্রহণ করছে না

তখন এমন কি জিনিস আর আসতে পারে যার কারণে ঈমানের সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটবে? আল্লাহর কালামই তো সেই চূড়ান্ত বস্তু যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এই নিয়ামত লাভ করতে পারে। আর একটি অদেখা সত্য সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য সর্বাধিক যুক্তি সঙ্গত যেসব দলীল–প্রমাণ পেশ করা সম্ভব তা এই পবিত্র কালামে পেশ করা হয়েছে। এরপরও যদি কেউ অস্বীকার করতেই বদ্ধপরিকর থাকে তাহলে করতে থাকুক। তার অস্বীকৃতির ফলে প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হবে না।

৯. অন্য কথায় যে ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে খোলা মনে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে এবং ঠাণ্ডা মাথায় তা নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করে তার এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য যে অস্বীকৃতির পূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে তা শোনে এবং কোন প্রকার চিন্তা–ভাবনা ছাড়াই এসব আয়াত শোনার পূর্বেই যে সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছিলো তার ওপর স্থির থাকে। প্রথম প্রকারের ব্যক্তি এই আয়াত শুনে যদিও আজ ঈমান আনছে না কিন্তু তার কারণ এ নয় যে, সে কাফের থাকতে চায়। এর কারণ বরং এই যে, সে আরো নিশ্চিত হতে চায়। এ কারণে যদিও তার ঈমান আনায় বিলম্ব হচ্ছে তবুও এটা অবশ্যই আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে অন্য কোন আয়াত হয়তো তার মনে ধরবে এবং সে নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত হয়ে ঈমান আনবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তি কোন আয়াত শুনে কখনো ঈমান আনতে পারে না। কারণ, আল্লাহর আয়াতের জন্য সে আগে থেকেই তার মনের দরজা বন্ধ করে নিয়েছে। যেসব মানুষের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট বিদ্যমান তারাই সাধাণত এই অবস্থার শিকার হয়। এক, তারা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। তাই সত্য ও সততা তাদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। দুই, তারা দুষ্কৃতকারী হয়ে থাকে। তাই তাদের পক্ষে এমন কোন শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা মেনে নেয়া অত্যন্ত কঠিন হয় যা তাদের ওপর নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। তিন, তারা এই অহংকারে আত্মমগ্ন থাকে যে, তারা সব কিছুই জানে কাজেই তাদেরকে আবার কে কি শিখাবে। এ কারণে তাদেরকে আল্লাহর যেসব আয়াত শুনানো হয় তারা তা আদৌ ভেবে চিন্তে দেখার মত কোন জিনিস বলে মনে করে না এবং তাদের শোনা ও না শোনার ফলাফল একই হয়ে থাকে।

১০. অর্থাৎ ঐ একটি আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করাই যথেষ্ট মনে করে না, সব আয়াত নিয়েই বিদ্রূপ করতে শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন সে শোনে যে কুরআনে অমুক কথা বলা হয়েছে তখন তার সোজা অর্থ গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রথমে তার মধ্যেই কোন বাঁকা অর্থ অনুসন্ধান করে নেয়, যাতে তাকে বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বানাতে পারে। অতপর তা নিয়ে বিদ্রূপ করার পরে বলে, জনাব, তার কথা কি বলেন, সে তো প্রতিদিন একেকটি অদ্ভুত কথা শুনাচ্ছে। দেখুন, অমুক আয়াতে সে এই মজার কথাটা বলেছে এবং অমুক আয়াতের মজার বিষয়ের তো কোন জুড়িই নেই।

১১. মূল আয়াতে আছে مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ । আরবী ভাষায় وَرَاء শব্দটি এমন প্রতিটি জিনিস বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যা সামনে থাক বা পেছনে থাক মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। সুতরাং এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে "তাদের পেছনে রয়েছে জাহান্নাম।" যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, তারা নিশ্চিন্তে দ্বিধাহীন চিত্তে এ পথে ছুটে চলেছে, অথচ সামনেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে সে অনুভূতি তাদের নেই। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, তারা আখেরাত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۡ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

তিনিই তো আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ সেখানে চলে[১৩] আর তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে[১৪] এবং কৃতজ্ঞ হতে পার। তিনি যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন,[১৫] সবই নিজের পক্ষ থেকে।[১৬] এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।[১৭]

হে নবী, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দাও, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কঠিন দিন আসার আশংকা করে না[১৮] তাদের আচরণ সমূহ যেন ক্ষমা করে দেয় যাতে আল্লাহ নিজেই একটি গোষ্ঠীকে তাদের কৃতকর্মের বদলা দেন।[১৯] যে সৎকাজ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে অসৎ কাজ করবে তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। সবাইকে তো তার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

নিজেদের এই দুষ্কর্মের মধ্যে ডুবে আছে। কিন্তু জাহান্নাম তাদের অনুসরণ করছে তা তারা জানে না।

১২. এখানে ولى শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, সেই সব দেব–দেবী এবং জীবিত বা মৃত নেতাদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে যাদের সম্বন্ধে মুশরিকরা ধরে নিয়েছে, যে ব্যক্তিই তাদের নৈকট্য লাভ করেছে সে পৃথিবীতে যাই করুক না কেন আল্লাহর দরবারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কেননা, তাদের হস্তক্ষেপ তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। দুই, সেই সব নেতা, আমীর–উমরাহ ও শাসকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ যাদেরকে পথপ্রদর্শক ও অনুসরণীয় বানিয়ে থাকে, অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য করে এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট

করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এ আয়াত এসব লোককে এ মর্মে সাবধান করে যে, এই আচরণ ও ভূমিকার ফলে যখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন এই দুই শ্রেণীর নেতাদের কেউই তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শূরার ব্যাখ্যা, টীকা ৬)।

১৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, টীকা ৮৩, আর রূম; টীকা ৬৯; লোকমান, টীকা ৫৫, আল মু'মিন, টীকা ১১০, আশ শূরা, টীকা ৫৪।

১৪. অর্থাৎ সমুদ্র পথে বাণিজ্য, মৎস্য শিকার, ডুবুরীর কাজ, জাহাজ চালনা এবং অন্যান্য উপায়ে রিযিক অর্জনের চেষ্টা করো।

১৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, টীকা–৪৪, লোকমান, টীকা ৩৫।

১৬. এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই দান দুনিয়ার বাদশাহদের দানের মত নয়। কেননা, তারা প্রজার নিকট থেকে নেয়া সম্পদ প্রজাদেরই কিছু লোককে দান করে থাকে। বিশ্ব জাহানের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর নিজের সৃষ্টি। তিনি নিজের পক্ষ থেকে তা মানুষকে দান করেছেন। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, এসব নিয়ামত সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেমন কেউ আল্লাহর শরীক নয়, তেমনি মানুষের জন্য এগুলোকে অনুগত করার ব্যাপারেও অন্য কোন সত্তার কোন প্রকার দখল বা কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ একাই এ সবের স্রষ্টা এবং তিনিই নিজের পক্ষ থেকে তা মানুষকে দান করেছেন।

১৭. অর্থাৎ অনুগতকরণে এবং এসব জিনিসকে মানুষের জন্য কল্যাণকর বানানোর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। এসব নিদর্শন পরিষ্কারভাবে এ সত্যের প্রতি ইংগিত দান করছে যে, পৃথিবী থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্ব জাহানের সমস্ত বস্তু এবং শক্তির স্রষ্টা, মালিক, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ, যিনি সব কিছুকেই একটি নিয়ম–বিধির অনুগত করে রেখেছেন এবং সেই আল্লাহই মানুষের রব–যিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও কৌশল এবং রহমতে এসব বস্তু ও শক্তিসমূহকে মানুষের জীবন, জীবিকা, আয়েশ–আরাম, উন্নতি ও তাহযীব–তমদ্দুনের উপযোগী ও সহায়ক বানিয়েছেন এবং একা তিনিই মানুষের দাসত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। অন্য সত্তাসমূহ এসব বস্তু ও শক্তি সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই কিংবা এসব বস্তু ও শক্তি মানুষের অনুগত করা ও কল্যাণকর বানানোর ক্ষেত্রে যাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, মানুষের দাসত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও তাদের নেই।

১৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে اَلَّذِيْنَ لاَيَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ । এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "যেসব মানুষ আল্লাহর দিনসমূহের আশা রাখে না।" কিন্তু আরবী বাক রীতিতে এ রকম ক্ষেত্রে اَيَّام অর্থ শুধু দিন নয়, বরং এমন সব স্মরণীয় দিন যখন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছে। যেমন اَيَّامُ الْعَرَب শব্দ আরব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং আরব গোত্রসমূহের এমন সব বড় বড় যুদ্ধ–বিগ্রহ বুঝানোর জন্য বলা হয় যা পরবর্তী বংশধররা শত শত বছর ধরে স্মরণ করে আসছে। এখানে اَيَّامُ اللّٰهِ অর্থ কোন জাতির জীবনের সর্বাধিক অকল্যাণকর দিন, যেদিন তাদের ওপর আল্লাহর গযব

নেমে আসে এবং নিজ কৃতকর্মের পরিণামে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। এই অর্থ অনুসারে আমরা এই আয়াতাংশের অনুবাদ করেছি, 'যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়াবহ দিন আসার আশংকা করে না।" অর্থাৎ যাদের এ চিন্তা নেই যে, কখনো এমন দিনও আসতে পারে যখন আমাদের এসব কাজ–কর্মের ফলশ্রুতিতে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। এই উদাসীনতাই তাদেরকে জুলুম–অত্যাচারের ব্যাপারে দুঃসাহস যুগিয়েছে।

১৯. মুফাসসিরগণ এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। আয়াতের শব্দাবলী থেকে এ দুটি অর্থ গ্রহণেরই অবকাশ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, মু'মিনদেরকে এ জালেম গোষ্ঠীর অত্যাচার উপেক্ষা করতে হবে যাতে আল্লাহ তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে তাদের ধৈর্য ও মহানুভবতা এবং শিষ্টাচারের প্রতিদান দেন এবং তারা আল্লাহর পথে যে দুঃখ–কষ্ট বরদাশত করেছে তার পুরস্কার দান করেন।

আরেকটি অর্থ হচ্ছে, মু'মিনগণ যেন, এই গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে যাতে আল্লাহ নিজেই তাদের অত্যাচারের প্রতিফল দান করেন।

কতিপয় মুফাসসির এ আয়াতকে 'মনসূখ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন ঃ যতদিন মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি ততদিন এ আদেশ বহাল ছিল। কিন্তু যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার পর এ হুকুম 'মনসূখ' হয়ে গিয়েছে। তবে আয়াতের শব্দসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মনসূখ হওয়ার এ দাবী ঠিক নয়। ব্যক্তি যখন কারো জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম নয় তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া অর্থে এই 'মাফ' শব্দটি কখনো ব্যবহৃত হয় না। বরং এ ক্ষেত্রে ধৈর্য, সহ্য ও বরদাশত শব্দগুলো প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ শব্দগুলো বাদ দিয়ে এখানে যখন 'মাফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঈমানদারগণ সেই সব লোকের জুলুম ও বাড়াবাড়ির জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকবে আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক হওয়া যাদেরকে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের সীমালংঘনের দুঃসাহস যুগিয়েছে। যেসব আয়াতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তার সাথে এ নির্দেশের কোন অমিল বা বৈপরীত্য নেই। যুদ্ধের অনুমতি দানের প্রশ্নটি এমন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত যখন কোন কাফের কওমের বিরুদ্ধে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুসলিম সরকারের কাছে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। আর ক্ষমার নির্দেশ এমন সাধারণ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যখন কোন না কোনভাবে মু'মিনদের সম্মুখীন হতে হয় আল্লাহর ভয়ে ভীত নয় এমন সব লোকদের এবং তারা তাদের বক্তব্য, লেখনী ও আচার–আচরণ দ্বারা মু'মিনদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেয়। এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেন তাদের উচ্চতর আসন থেকে নেমে এসব হীন চরিত্র লোকদের সাথে ঝগড়া–বিবাদে জড়িয়ে পড়তে এবং তাদের প্রতিটি অর্থহীন কাজের জবাব দিতে শুরু না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিষ্টতা ও যৌক্তিকতার সাহায্যে কোন অভিযোগ ও আপত্তির জবাব দেয়া কিংবা কোন জুলুমের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কিন্তু যখনই এ সীমা লংঘিত হবে তখনই সেখানেই ক্ষান্তি দিয়ে ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে। মুসলমানরা নিজেরাই যদি তাদের মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাদের সাথে মোকাবিলার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে তাদের আপন অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তারা যদি ক্ষমা ও

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

ইতিপূর্বে আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, হুকুম[২০] ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। আমি তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলাম, সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর মর্যাদা দান করেছিলাম[২১] এবং দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট হিদায়াত দান করেছিলাম। অতপর তাদের মধ্যে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো তা (অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং) জ্ঞান আসার পরে হয়েছিলো এবং এ কারণে হয়েছিলো যে, তারা একে অপরের ওপর জুলুম করতে চাচ্ছিলো।[২২] তারা যেসব ব্যাপারে মতভেদ করে আসছিলো আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই সব ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। অতপর হে নবী, আমি দীনের ব্যাপারে তোমাকে একটি সুস্পষ্ট রাজপথের (শরীয়ত) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি।[২৩] সুতরাং তুমি তার ওপরেই চলো এবং যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।

উপেক্ষার নীতি অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ নিজেই জালেমদের সাথে বুঝা পড়া করবেন এবং মজলুমদেরকে তাদের ধৈর্য ও মহানুভবতার পুরস্কার দান করবেন।

২০. হুকুম অর্থ তিনটি জিনিস। এক–কিতাবের জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং দীনের অনুভূতি। দুই–কিতাবের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করার কৌশল। তিন–বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা।

২১. অর্থ এ নয় যে, চিরদিনের জন্য সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর মর্যাদা দান করেছেন। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, সেই যুগে দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্য থেকে আল্লাহ বনী ইসরাইলকে এই খেদমতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন যে, তারা হবে আল্লাহর কিতাবের ধারক এবং আল্লাহর আনুগত্যের ঝাণ্ডাবাহী।

২২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৩০; আল ইমরান, টীকা ১৭ ও ১৮; আশ শূরা, টীকা ২২ ও ২৩।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ
بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾ هٰذَا بَصَاۗىِٕرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ
كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَاۗءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۭ
سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾

আল্লাহর মোকাবিলায় তারা তোমার কোন কাজেই আসতে পারে না।[২৪] জালেমরা একে অপরের বন্ধু এবং মুত্তাকীদের বন্ধু আল্লাহ। এটা সব মানুষের জন্য দূরদৃষ্টির আলো এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[২৫]

যেসব[২৬] লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীলদেরকে সমপর্যায়ভুক্ত করে দেবো যে তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? তারা যে ফায়সালা করে তা অত্যন্ত জঘণ্য।[২৭]

২৩. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে কাজের দায়িত্ব বনী ইসরাইলদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিলো এখন তার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তারা জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও আত্মস্বার্থের জন্য দীনের মধ্যে এমন মতভেদ সৃষ্টি করে এবং পরস্পর এমন দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে যার ফলে দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানানোর যোগ্যতাই হারিয়ে বসে। বর্তমানে তোমাদের সেই দীনের সুস্পষ্ট রাজপথের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তোমরা সেই খেদমত আঞ্জাম দিতে পার যা বনী ইসরাঈলরা পরিত্যাগ করেছে এবং যার যোগ্যতাও তাদের ছিল না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা আশ শূরা, আয়াত ১৩ থেকে ১৫ এবং টীকা ২০ থেকে ২৬)।

২৪. অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য দীনের মধ্যে কোন প্রকার রদবদল করো তাহলে তারা আল্লাহর সামনে জবাবদিহি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

২৫. অর্থাৎ এই কিতাব এবং এই শরীয়ত পৃথিবীর মানুষের জন্য এমন এক আলো যা হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কিন্তু তা থেকে হিদায়াত লাভ করে কেবল সেই সব লোক যারা তার সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। আর তা রহমত কেবল তাদের জন্যই।

২৬. তাওহীদের দিকে আহবান জানানোর পর এখান থেকে আখেরাত সম্পর্কে বক্তব্য শুরু হচ্ছে।

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۗ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন[২৮] এবং এ জন্য করেছেন যাতে প্রত্যেক প্রাণসত্তাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া যায়। তাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না।[২৯]

তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো যে তার প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে[৩০] আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও[৩১] আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, তার দিলে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখে আবরণ সৃষ্টি করেছেন।[৩২] আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাকে হিদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো না?[৩৩]

এরা বলে ঃ জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই 'এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এদের কোন জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলে।[৩৪]

২৭. আখেরাত সত্য হওয়ার সপক্ষে এটা নৈতিক যুক্তি–প্রমাণ। নৈতিক চরিত্রের ভাল–মন্দ এবং কর্মের মধ্যে সৎ ও অসতের পার্থক্যের অনিবার্য দাবী হলো ভাল এবং মন্দ লোকের পরিণাম এক হবে না বরং এ ক্ষেত্রে সৎ লোক তার সৎ কাজের ভাল প্রতিদান লাভ করবে এবং অসৎ লোক তার অসৎ কাজের মন্দ ফল লাভ করবে। তা যদি না হয় এবং ভাল ও মন্দের ফলাফল যদি একই রকম হয় সে ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্রের ভাল ও মন্দের পার্থক্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বে–ইনসাফীর অভিযোগ আরোপিত হয়। যারা পৃথিবীতে অন্যায়ের পথে চলে তারা তো অবশ্যই চাইবে যেন কোন

প্রকার প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে। কারণ, এই ধারণাই তাদের আরামকে হারাম করে দেয়। কিন্তু বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর যুক্তিপূর্ণ বিধান ও ন্যায় বিচারের নীতির সাথে এটা আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, তিনি সৎ ও অসৎ উভয় শ্রেণীর মানুষের সাথে একই রকম আচরণ করবেন এবং সৎকর্মশীল ঈমানদার ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে কিভাবে জীবন যাপন করেছে আর কাফের ও ফাসেক ব্যক্তিরা কি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তার কিছুই দেখবেন না। এক ব্যক্তি সারা জীবন নিজেকে নৈতিকতার বিধি–বন্ধনে আবদ্ধ রাখলো, প্রাপকদের প্রাপ্য অধিকার দিল, অবৈধ স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখলো এবং ন্যায় ও সত্যের জন্য নানা রকম ক্ষতি বরদাশত করলো। আরেক ব্যক্তি সম্ভাব্য সব উপায়ে প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা পূরণ করলো। সে না আল্লাহর অধিকার চিনলো, না বান্দার অধিকারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত হলো এবং স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ যেভাবে সম্ভব দুই হাতে আহরণ করলো। আল্লাহ এই দুই শ্রেণীর মানুষের জীবনের এই পার্থক্য উপেক্ষা করবেন তা কি আশা করা যায়? মৃত্যু পর্যন্ত যাদের জীবন এক রকম হলো না, মৃত্যুর পর তাদের পরিণাম যদি একই রকম হয় তাহলে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় বে–ইনসাফী আর কি হতে পারে? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, ইউনুস, টীকা ৯ ও ১০; হূদ, টীকা ১০৬; আন নাহল, টীকা ৩৫; আল হাজ্ব, টীকা ৯; আন নামল, টীকা ৮৬; আর রূম, টীকা ৬ থেকে ৮; সূরা সোয়াদ, আয়াত ২৮, টীকা ৩০)

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ খেল–তামাশা করার উদ্দেশ্যে পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেননি। বরং এটা একটা উদ্দেশ্যমুখী জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় একথা একেবারেই অকল্পনীয় যে, যারা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা–ইখতিয়ার ও উপায়–উপকরণ সঠিক পন্থায় ব্যবহার করে ভাল কাজ করেছে এবং যারা ঐগুলোকে ভ্রান্ত পন্থায় ব্যবহার করে জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে শেষ পর্যন্ত তারা সবাই মরে মাটিতে পরিণত হবে এবং এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন হবে না এবং সেখানে ইনসাফ মোতাবেক তাদের ভাল ও মন্দ কাজের কোন ভাল বা মন্দ ফলাফলও প্রকাশ পাবে না। যদি তাই হয় তাহলে এই বিশ্ব জাহান তো খেলোয়াড়ের খেলার বস্তু, কোন মহাজ্ঞানীর সৃষ্ট উদ্দেশ্যমুখী ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনয়াম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১১; ইবরাহীম টীকা ২৬; আন নাহ্ল, টীকা ৬; আল আন্‌কাবূত, টীকা ৭৫ এবং আর রূম, টীকা ৬)।

২৯. পূর্বাপর আলোচনার পেক্ষাপটে এ আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হলো, সৎ মানুষেরা যদি তাদের সৎ কাজের পুরস্কার বা প্রতিদান না পায়, জালেমদেরকে তাদের শাস্তি না দেয়া হয় এবং মজলুমরা কখনো ন্যায় বিচার না পায় তাহলে তা হবে জুলুম। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ব্যবস্থায় এ ধরনের জুলুম কখনো হতে পারে না। একইভাবে কোন সৎ মানুষকে তার প্রাপ্যের তুলনায় কম পুরস্কার দেয়া হবে কিংবা কোন অসৎ মানুষকে তার প্রাপ্যের তুলনায় অধিক শাস্তি দেয়া হবে আল্লাহর বিচারে এ ধরনের কোন জুলুমও হতে পারে না।

৩০. প্রবৃত্তির কামনা–বাসনাকে খোদা বানিয়ে নেয়ার অর্থ ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা আকাংখার দাস হয়ে যাওয়া। তার মন যা চায় তাই সে করে বসে যদিও আল্লাহ তা হারাম

করেছেন এবং তার মন যা চায় না তা সে করে না যদিও আল্লাহ তা ফরয করে দিয়েছেন। ব্যক্তি যখন এভাবে কারো আনুগত্য করতে থাকে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তার উপাস্য আল্লাহ নয়, বরং সে এভাবে যার আনুগত্য করছে সে-ই তার উপাস্য। সে মুখে তাকে 'ইলাহ' এবং উপাস্য বলুক বা না বলুক কিংবা মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করুক বা না করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ, দ্বিধাহীন আনুগত্যই তার উপাস্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এভাবে কার্যত শিরক করার পর কোন ব্যক্তি শুধু এই কারণে শিরকের অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারে না যে, সে যার আনুগত্য করছে মুখে তাকে উপাস্য বলেনি এবং সিজদাও করেনি। অন্যান্য বড় বড় মুফাসসিরও আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারীর এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এইভাবে যে, সে তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। প্রবৃত্তি যা কামনা করেছে সে তাই করে বসেছে। না সে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম বলে মনে করেছে, না তার হালালকৃত বস্তুকে হালাল বলে গণ্য করেছে।" আবু বকর জাসসাস এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, কেউ যেমনভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে সে ঠিক তেমনিভাবে প্রবৃত্তি আকাংখার আনুগত্য করে।" যামাখশারী এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার প্রতি অত্যন্ত অনুগত। তার প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে আহবান জানায় সে সেদিকেই চলে যায়। সে এমনভাবে তার দাসত্ব করে যেমন কেউ আল্লাহর দাসত্ব করে" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল ফুরকান, টীকা ৫৬; সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ৬৩; ইয়াসীন, টীকা ৫৩; আশ শূরা, টীকা ৩৮)।

৩১. মূল বাক্যাংশ হচ্ছে أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ। এই বাক্যাংশের একটি অর্থ হতে পারে এই যে, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ব্যক্তিকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাস হয়ে গিয়েছিলো। আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, সে তার প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকে খোদা বানিয়ে বসেছে এ বিষয়টি জেনে আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।

৩২. আল্লাহ কর্তৃক কাউকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা, তার মন ও কানের ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া এবং চোখের ওপর আবরণ সৃষ্টি করে দেয়ার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমরা এ গ্রন্থের কয়েকটি স্থানে করেছি। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১০ ও ১৬; আল আনয়াম, টীকা ১৭ ও ২৭; আল আরাফ, টীকা ৮০; আত তাওবা, টীকা ৮৯ ও ৯৩; ইউনুস, টীকা ৭১; আর রা'দ, টীকা ৪৪; ইবরাহীম, টীকা ৬, ৭ ও ৪০; আন নাহল, টীকা ১১০; বনী ইসরাঈল, টীকা ৫১; আর রূম, টীকা ৮৪; ফাতের, আয়াত ৮, টীকা ১৬ ও ১৭ এবং আল মু'মিন, টীকা ৫৪।

৩৩. যে প্রসংগে এ আয়াতটি এসেছে তাতে আপনা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যারা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে চায় প্রকৃতপক্ষে সেই সব লোকই আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আখেরাতে বিশ্বাসকে নিজের স্বাধীনতার পথের অন্তরায় মনে করে। তা সত্ত্বেও তারা যখন আখেরাতকে অস্বীকার করে বসে তখন তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং প্রতিনিয়তই তারা আরো বেশী করে গোমরাহীর মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে। এমন কোন অপকর্ম থাকে না যাতে জড়িত হওয়া থেকে তারা বিরত থাকে। কারো হক মারতে তারা দ্বিধান্বিত হয় না। ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি তাদের

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

যখন এদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয়[৩৫] তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের বাপদাদাদের জীবিত করে দেখাও।[৩৬] হে নবী, এদের বলো, আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান।[৩৭] তিনিই আবার সেই কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্রিত করবেন যার আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।[৩৮] কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।[৩৯]

মনে কোন শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। তাই কোন প্রকার জুলুম ও বাড়বাড়ির সুযোগ লাভের পর তা থেকে তারা বিরত থাকবে এ আশা করা যায় না। যেসব ঘটনা দেখে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেই সব ঘটনা তাদের চোখের সামনে আসে কিন্তু তারা তা থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা হচ্ছে, আমরা যা কিছু করছি ঠিকই করছি এবং এসবই আমাদের করা উচিত। কোন উপদেশ বাণীই তাদের প্রভাবিত করে না। কোন মানুষকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য যে যুক্তি প্রমাণ ফলপ্রসূ হতে পারে তা তাদের আবেদন সৃষ্টি করে না। বরং তারা তাদের এই লাগামহীন স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ খুঁজে খুঁজে বের করে। ভাল চিন্তার পরিবর্তে তাদের মন ও মস্তিষ্ক রাত–দিন সম্ভাব্য সফল পন্থায় তাদের নিজেদের স্বার্থ ও কামনা–বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় লেগে থাকে। আখেরাত বিশ্বাসের অস্বীকৃতি যে মানুষের নৈতিক চরিত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। মানুষকে যদি মনুষ্যত্বের গণ্ডির মধ্যে কোন জিনিস ধরে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে তা পারে কেবল এই অনুভূতি যে, আমরা দায়িত্ব মুক্ত নই, বরং আল্লাহর সামনে আমাদের সকল কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই অনুভূতিহীন হওয়ার পর কেউ যদি অতি বড় জ্ঞানীও হয় তাহলেও সে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ না করে পারে না।

৩৪. অর্থাৎ জ্ঞানের এমন কোন মাধ্যমই নেই যার সাহায্যে তারা জেনে নিতে পারে, এই জীবনের পরে মানুষের আর কোন জীবন নেই। তাছাড়া একথা জানতেও কোন মাধ্যম নেই যে, কোন খোদার নির্দেশে মানুষের রূহ কবজ করা হয় না, বরং শুধু কালের প্রবাহ ও বিবর্তনে মানুষ মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আখেরাত অবিশ্বাসীরা জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়, শুধু ধারণার ভিত্তিতে এসব কথা বলে থাকে। যদি তারা জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলে তাহলে বড় জোর বলতে পারে যে, "মৃত্যুর পরে কোন জীবন আছে কিনা তা আমরা জানি না।" কিন্তু একথা কখনো বলতে পারে না যে, "আমরা জানি, এই জীবনের পরে আর

কোন জীবন নেই।" অনুরূপ জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে তারা একথা জানার দাবি করতে পারে না যে, মানুষের রূহ আল্লাহর হুকুমে বের করে নেয়া হয় না, বরং একটি ঘড়ি যেমন চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায় তেমনি তা মরে নিঃশেষ হয়ে যায়। তারা বড় জোর যা কিছু বলতে পারে তা শুধু এই যে, এ দুটির মধ্যে কোনটি সম্পর্কেই আমরা জানি না, প্রকৃতই কি ঘটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের জ্ঞানের সীমা পর্যন্ত মৃত্যুর পরের জীবন হওয়া না হওয়া এবং রূহ কবজ হওয়া অথবা কালের প্রবাহে আপনা থেকেই মরে যাওয়ার সমান সম্ভাবনা যখন বিদ্যমান তখন এসব লোক আখেরাতের সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে আখেরাত অস্বীকৃতির পক্ষে যে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করছে তার কারণ তাহলে কি? প্রকৃতপক্ষে তারা এই বিষয়টির চূড়ান্ত সমাধান যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে করে না বরং নিজেদের কামনা-বাসনার নিরিখে করে থাকে। এ ছাড়া কি এর আর কোন কারণ থাকতে পারে? যেহেতু তারা মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন চায় না এবং মৃত্যু সত্যিকার অর্থে অস্তিত্বহীনতা বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া না হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ কবজ করা হোক এটাও তারা চায় না, তাই নিজেদের মনের চাহিদা অনুসারে তারা আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয় এবং এর বিপরীত জিনিসটি অস্বীকার করে বসে।

৩৫. অর্থাৎ যেসব আয়াতে আখেরাতের সম্ভাবনার মজবুত যুক্তিসংগত দলীল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আখেরাত হওয়া সরাসরি যুক্তি ও ইনসাফের দাবি। আখেরাত সংঘটিত না হলে এই গোটা বিশ্ব ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৩৬. অন্য কথায়, তাদের এই যুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, যখনই কেউ তাদেরকে বলবে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন হবে তখনই তাকে কবর থেকে একজন মৃতকে জীবিত করে উঠিয়ে সামনে আনতে হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে তারা একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, মৃত মানুষকে আবার কোন সময় পুনায় জীবিত করে উঠানো হবে। অথচ কেউ কখনো তাদেরকে একথা বলেনি যে, মাঝে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এই পৃথিবীতে মৃতদের জীবিত করা হবে। যা কিছু বলা হয়েছে তা হচ্ছে, কিয়ামতের পরে আল্লাহ এক সময় যুগপৎ সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাদের সবার কৃতকর্ম পর্যালোচনা করে পুরস্কার ও শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৩৭. তারা বলতো, কালের প্রবাহ ও সময়ের বিবর্তনের আপনা থেকেই মৃত্যু আসে। এটা তাদের সেই কথার জবাব। বলা হচ্ছে, না তোমরা আকস্মিকভাবে জীবন লাভ করে থাকো, না আপনা থেকেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হয়। একজন আল্লাহ আছেন, যিনি তোমাদের জীবন দান করেন এবং তিনিই তা কেড়ে নেন।

৩৮. তারা বলতো, আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো, এটা তারই জবাব। এতে বলা হচ্ছে, তা এখন হবে না এবং বিচ্ছিন্নভাবেও হবে না। বরং সব মানুষকে একত্রিত করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট আছে।

৩৯. অর্থাৎ অজ্ঞতা এবং চিন্তা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতাই মানুষের আখেরাত অস্বীকৃতির মূল কারণ। তা না হলে প্রকৃতপক্ষে আখেরাত সংঘটিত হওয়া নয়, না হওয়াই বিবেক ও যুক্তি-বুদ্ধির পরিপন্থী। কোন ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা ও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে সে আপনা থেকেই অনুভব করবে যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

যমীন এবং আসমানের বাদশাহী আল্লাহর।[৪০] আর যেদিন কিয়ামতের সময় এসে উপস্থিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তোমরা প্রত্যেক গোষ্ঠীকে নতজানু দেখতে পাবে।[৪১] প্রত্যেক গোষ্ঠীকে এসে তার আমলনামা দেখার জন্য আহবান জানানো হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যেসব কাজ করে এসেছো তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। এটা আমাদের তৈরী করানো আমলনামা, যা তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমরা যাই করতে আমি তাই লিপিবদ্ধ করাতাম।[৪২]

৪০. পূর্বাপর প্রসঙ্গ সামনে রেখে বিচার করলে আপনা থেকেই এ আয়াতের যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হচ্ছে, যে আল্লাহ এই বিশাল বিশ্ব জাহান শাসন করছেন তিনি যে মানুষদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর অসীম ক্ষমতার অসাধ্য মোটেই নয়।

৪১. অর্থাৎ সেখানে হাশরের ময়দানের এবং আল্লাহর আদালতের এমন ভীতি সৃষ্টি হবে যে, বড় বড় অহংকারীদের অহংকারও উবে যাবে। সেখানে সবাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নতজানু হবে।

৪২. কলমের সাহায্যে কাগজের ওপর লেখানোই লিখিয়ে রাখার একমাত্র সম্ভব পদ্ধতি নয়। মানুষের কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করা এবং পুনরায় তা হুবহু পূর্বের মত করে উপস্থাপনের আরো কতিপয় পদ্ধতি এই পৃথিবীতে মানুষ নিজেই উদ্ভাবন করেছে। ভবিষ্যতে মানুষের করায়ত্ব হবে এরূপ আরো কি কি সম্ভাবনা আছে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কি কি পন্থায় আল্লাহ মানুষের এক একটি কথা, তার তৎপরতার প্রতিটি জিনিস এবং তার নিয়ত, ইচ্ছা, কামনা–বাসনা ও ধ্যান–ধারণার প্রতিটি গোপন থেকে গোপনতার বিষয় লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন এবং কিভাবে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতির গোটা জীবনের সকল কর্মকাণ্ড অবিকল তার সামনে পেশ করবেন তা কার পক্ষে জানা সম্ভব?

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾

যারা ঈমান এনেছিলো এবং সৎকাজ করেছিলো তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। এটা সুস্পষ্ট সাফল্য। আর যারা কুফরী করেছিলো তাদের বলা হবে আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদেরকে শুনানো হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে[৪৩] এবং অপরাধী হয়ে গিয়েছিলে। আর যখন বলা হতো, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন তোমরা বলতে, কিয়ামত কি জিনিস তা আমরা জানি না। আমরা কিছুটা ধারণা পোষণ করি মাত্র। দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নেই।[৪৪]

৪৩. অর্থাৎ অহংকার বশতঃ তোমরা মনে করেছিলে আল্লাহর আয়াতসমূহ মেনে নিয়ে অনুগত হয়ে যাওয়া তোমাদের মর্যাদার পরিপন্থী এবং তোমাদের মর্যাদা দাসত্বের মর্যাদার অনেক ওপরে।

৪৪. ইতিপূর্বে ২৪ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল খোলাখুলি ও অকাট্য রূপে আখেরাত অস্বীকারকারী। কিন্তু এখানে যাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না, শুধু একটা ধারণা পোষণ করে এবং এর সম্ভাব্যতা অস্বীকার করে না। বাহ্যত এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, একটি গোষ্ঠী আখেরাতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং অপরটি তা সম্ভব বলে ধারণা পোষণ করে। কিন্তু ফলাফল ও পরিণামের দিক দিয়ে এদের মধ্যে কান পার্থক্য নেই। কেননা, আখেরাত অস্বীকৃতি এবং তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকার নৈতিক ফলাফল প্রায় পুরোপুরি এক। কোন ব্যক্তি, যে আখেরাত মানে না বা বিশ্বাস করে না উভয় অবস্থায় অনিবার্যরূপে তার মধ্যে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি থাকবে না এবং এই অনুভূতিহীনতা অবশ্য তাকে চিন্তা ও কর্মের গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। কেবলমাত্র আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা আচার–আচরণ ঠিক রাখতে পারে। এই বিশ্বাস না থাকলে সন্দেহ–সংশয় ও অস্বীকৃতি এ দুটি জিনিস তাকে এক প্রকার দায়িত্বহীন আচরণ ও তৎপরতার দিকে ঠেলে দেয়। এই দায়িত্বহীন আচরণ ও

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

সেই সময় তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফলাফল প্রকাশ পাবে।[৪৫] তারা সেই জিনিসের পাল্লায় পড়ে যাবে যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো। তাদের বলে দেয়া হবে, আজ আমিও ঠিক তেমনি তোমাদের ভুলে যাচ্ছি যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎ ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা এখন দোযখ এবং তোমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই। তোমাদের এই পরিণাম এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টা–বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদের ধোকায় ফেলে দিয়েছিলো। তাই আজ এদেরকে দোযখ থেকেও বের করা হবে না কিংবা একথাও বলা হবে না যে, ক্ষমা চেয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো।[৪৬]

কাজেই সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি যমীন ও আসমানের মালিক এবং গোটা বিশ্ব জাহানের সবার পালনকর্তা। যমীন ও আসমানে তারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

তৎপরতাই যেহেতু আখেরাতে মন্দ পরিণামের মূল কারণ তাই না অস্বীকারকারী দোযখ থেকে রক্ষা পাবে, না সন্দেহ পোষণকারী।

৪৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে যেসব নিয়ম–পদ্ধতি, আচার–আচরণ এবং কাজ–কর্ম ও তৎপরতাকে তারা খুব ভাল বলে মনে করতো তা যে ভাল ছিল না সেখানে তারা তা জানতে পারবে। নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে যে মৌলিক ভুল তারা করেছে, যার

কারণে তাদের জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডই ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে তারা সেখানে তা উপলব্ধি করতে পারবে।

৪৬. এই শেষ বাক্যাংশের ধরন এরূপ যেন কোন মনিব তার কিছু সংখ্যক খাদেমকে তিরস্কার করার পর অন্যদের উদ্দেশ করে বলছেন, ঠিক আছে, এখন এই অপদার্থগুলোকে এই শাস্তি দাও।

আল আহক্বাফ

৪৬

নামকরণ

২১ নম্বর আয়াতের إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়–কাল ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নিরূপিত হয়ে যায়। ঐ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে জিনদের ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসার পথে নাখলা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন সেই সময় ঘটনাটি ঘটেছিলো। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুসারে হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবী (সা) তায়েফ গমন করেছিলেন। সুতরাং এ সূরা যে নবুওয়াতের ১০ম বছরের শেষ দিকে অথবা ১১শ বছরের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিলো তা নিরূপিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবীর (সা) পবিত্র জীবনে নবুওয়াতের ১০ম বছর ছিল অত্যন্ত কঠিন বছর। তিন বছর ধরে কুরাইশদের সবগুলো গোত্র মিলে বনী হাশেম এবং মুসলমানদের পুরোপুরি বয়কট করে রেখেছিলো। নবী (সা) তাঁর খান্দানের লোকজন ও মুসলমানদের সাথে শে'বে আবি তালিব* মহল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে ছিলেন। কুরাইশদের লোকজন এই মহল্লাটিকে সব দিক থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলো। এ অবরোধ ডিঙিয়ে কোন প্রকার রসদ ভেতরে যেতে পারতো না। শুধু হজ্জের মওসুমে এই অবরুদ্ধ লোকগুলো বের হয়ে কিছু কেনাকাটা করতে পারতো। কিন্তু আবু লাহাব যখনই তাদের মধ্যে কাউকে বাজারের দিকে বা কোন বাণিজ্য কাফেলার দিকে যেতে দেখতো চিৎকার করে বণিকদের বলতো, 'এরা যে জিনিস

* শে'বে আবি তালিব মক্কার একটি মহল্লার নাম। এখানে বনী হাশেম গোত্রের লোকজন বাস করতেন। আরবী ভাষায় شعب শব্দের অর্থ উপত্যকা বা পাহাড়ের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র বাসযোগ্য ভূমি। মহল্লাটি যেহেতু 'আবু কুবাইস' পাহাড়ের একটি উপত্যকায় অবস্থিত ছিল এবং আবু তালিব ছিলেন বনী হাশেমদের নেতা। তাই এটিকে শে'বে আবি তালিব বলা হতো। পবিত্র মক্কার যে স্থানটি বর্তমানে স্থানীয় বর্ণনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম স্থান হিসেবে পরিচিত তার সন্নিকটেই এই উপত্যকা অবস্থিত ছিল। বর্তমানে একে শে'বে আলী বা শে'বে বনী হাশেম বলা হয়ে থাকে।

কিনতে চাইবে তার মূল্য এত অধিক চাইবে যেন এরা তা খরিদ করতে না পারে। আমি ঐ জিনিস তোমাদের নিকট থেকে কিনে নেব এবং তোমাদের লোকসান হতে দেব না। একাধারে তিন বছরের এই বয়কট মুসলমান ও বনী হাশেমদের কোমর ভেঙে দিয়েছিলো। তাদেরকে এমন সব কঠিন সময় পাড়ি দিতে হয়েছিলো যখন কোন কোন সময় ঘাস এবং গাছের পাতা খাওয়ার মত পরিস্থিতি এসে যেতো।

অনেক কষ্টের পর এ বছরই সবেমাত্র এই অবরোধ ভেঙ্গেছিলো। নবী (সা) চাচা আবু তালিব, যিনি দশ বছর ধরে তাঁর জন্য ঢাল স্বরূপ ছিলেন ঠিক এই সময় ইন্তেকাল করেন। এই দুর্ঘটনার পর এক মাস যেতে না যেতেই তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদীজাও ইন্তেকাল করেন যিনি নবুওয়াত জীবনের শুরু থেকে ঐ সময় পর্যন্ত নবীর (সা) জন্য প্রশান্তি ও সান্তনার কারণ হয়ে ছিলেন। একের পর এক এসব দুঃখ কষ্ট আসার কারণে নবী (সা) এ বছরটিকে (عام الحزن) "আমুল হুযন্" বা দুঃখ বেদনার বছর বলে উল্লেখ করতেন।

হযরত খাদীজা ও আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আরো অধিক সাহসী হয়ে উঠলো এবং তাঁকে আগের চেয়ে বেশী উত্যক্ত করতে শুরু করলো। এমন কি তাঁর জন্য বাড়ীর বাইরে বের হওয়াও কঠিন হয়ে উঠলো। ইবনে হিশাম সেই সময়ের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন কুরাইশদের এক বখাটে লোক জনসমক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করে।

অবশেষে তিনি তায়েফে গমন করলেন। উদ্দেশ্য সেখানে বনী সাকীফ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে অন্তত এ মর্মে তাদের সম্মত করাবেন যেন তাঁকে তাদের কাছে শান্তিতে থেকে তারা ইসলামের কাজ করার সুযোগ দেবে। সেই সময় তাঁর কাছে কোন সওয়ারীর জন্তু পর্যন্ত ছিল না। মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত গোটা পথ তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তিনি একাই তায়েফ গিয়েছিলেন এবং কোন কোন বর্ণনা অনুসারে শুধু যায়েদ ইবনে হারেসা তাঁর সাথে ছিলেন। সেখানে পৌছার পর তিনি কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করলেন এবং সাকীফের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে আলাপ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর কোন কথা যে মানলো না শুধু তাই নয়, বরং স্পষ্ট ভাষায় তাদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম শুনিয়ে দিল। কেননা তারা শংকিত হয়ে পড়েছিলো তাঁর প্রচার তাদের যুবক শ্রেণীকে বিগড়ে না দেয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে তায়েফ ত্যাগ করতে হলো। তিনি তায়েফ ত্যাগ করার সময় সাকীফ গোত্রের নেতারা তাদের বখাটে ও পাণ্ডাদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা পথের দুই পাশ দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ, গালিবর্ষণ এবং পাথর ছুঁড়ে মারতে মারতে অগ্রসর হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আহত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়লেন এবং তাঁর জুতা রক্তে ভরে গেলো। এ অবস্থায় তিনি তায়েফের বাইরে একটি বাগানের প্রাচীরের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করলেন ঃ

হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমার কাছে আমার অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা এবং মানুষের দৃষ্টিতে নিজের অমর্যাদা ও মূল্যহীনতার অভিযোগ করছি। হে সর্বাধিক দয়ালু ও করুণাময়!

তুমি সকল দুর্বলদের রব। আমার রবও তুমিই। তুমি আমাকে কার হাতে ছেড়ে দিচ্ছ? এমন কোন অপরিচিতের হাতে কি যে আমার সাথে কঠোর আচরণ করবে? কিংবা এমন কোন দুশমনের হাতে কি যে আমার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে? তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তাহলে আমি কোন বিপদের পরোয়া করি না। তবে তোমার নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ করলে সেটা হবে আমার জন্য অনেক বেশী প্রশস্ততা। আমি আশ্রয় চাই তোমার সত্তার সেই নূরের যা অন্ধকারকে আলোকিত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারসমূহকে পরিশুদ্ধ করে। তোমার গযব যেন আমার ওপর নাযিল না হয় তা থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো এবং আমি যেন তোমার ক্রোধ ও তিরস্কারের যোগ্য না হই। তোমার মর্জিতেই আমি সন্তুষ্ট যেন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তুমি ছাড়া আর কোন জোর বা শক্তি নেই।" (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২)

ভগ্ন হৃদয় ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে যাওয়ার পথে যখন তিনি "কারনুল মানাযিল" নামক স্থানের নিকটবর্তী হলেন তখন মাথার ওপর মেঘের ছায়ার মত অনুভব করলেন। দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সামনেই হাজির। জিবরাঈল ডেকে বললেন : "আপনার কওম আপনাকে যে জবাব দিয়েছে আল্লাহ তা শুনেছেন। এই তো আল্লাহ পাহাড়ের ব্যবস্থাপক ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা তাকে নির্দেশ দিতে পারেন।" এরপর পাহাড়ের ব্যবস্থাপক ফেরেশতা তাঁকে সালাম দিয়ে আরজ করলেন : আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে দুই দিকের পাহাড় এই সব লোকদের ওপর চাপিয়ে দেই।" তিনি বললেন : না, আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশে এমন সব লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক ও লা–শরীক আল্লাহর দাসত্ব করবে।" (বুখারী, বাদউল খালক, যিকরুল মালাইকা, মুসলিম, কিতাবুল মাগাযী, নাসায়ী, আলবু'য়স)।

এরপর তিনি নাখলা নামক স্থানে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করলেন। এখন কিভাবে মক্কায় ফিরে যাবেন সে কথা ভাবছিলেন।

তায়েফে যা কিছু ঘটেছে সে খবর হয়তো সেখানে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে। এখন তো কাফেররা আগের চেয়েও দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। এই সময়ে একদিন রাতের বেলা যখন তিনি নামাযে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন সেই সময় জিনদের একটি দল সেখানে এসে হাজির হলো। তারা কুরআন শুনলো, তার প্রতি ঈমান আনলো এবং ফিরে গিয়ে নিজ জাতির মধ্যে ইসলামের প্রচার শুরু করলো। আল্লাহ তাঁর নবীকে এই সুসংবাদ দান করলেন যে, আপনার দাওয়াত শুনে মানুষ যদিও দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু বহু জিন তার ভক্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছে এবং তারা একে স্বজাতির মধ্যে প্রচার করছে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এই পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়। যে ব্যক্তি একদিকে নাযিল হওয়ার এই পরিস্থিতি সামনে রাখবে এবং অন্য দিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে সূরাটি পড়বে তার মনে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকবে না যে এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়। বরং "এটি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" কেননা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরার মধ্যে কোথাও সেই ধরনের মানবিক আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার সামান্য লেশ মাত্র নেই যা সাধারণত এরূপ পরিস্থিতির শিকার মানুষের

মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়। এটা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হতো যাকে একের পর এক বড় বড় দুঃখ-বেদনা ও মুসিবত এবং তায়েফের সাম্প্রতিক আঘাত দুর্দশার চরমে পৌছিয়ে দিয়েছিলো—তাহলে এই পরিস্থিতির কারণে তাঁর মনের যে অবস্থা ছিল সূরার মধ্যে কোথাও না কোথাও তার চিত্র দৃষ্টিগোচর হতো। উপরে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে দোয়া উদ্ধৃত করেছি তার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। সেটা তাঁর নিজের বাণী। ঐ বাণীর প্রতিটি শব্দ সেই পরিস্থিতিরই চিত্রায়ন। কিন্তু এই সূরাটি সেই একই সময়ে একই পরিস্থিতিতে তাঁরই মুখ থেকে বেরিয়েছে, অথচ সেই পরিস্থিতি জনিত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

কাফেররা বহুবিধ গোমরাহীর মধ্যে শুধু ডুবেই ছিল না বরং প্রচণ্ড জিদ, গর্ব ও অহংকারের সাথে তা আঁকড়ে ধরে ছিল। আর যে ব্যক্তি এসব গোমরাহী থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট ছিল তাকে তারা তিরস্কার ও সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলো। এই সব গোমরাহীর ফলাফল সম্পর্কে কাফেরদের সাবধান করাই সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। তাদের কাছে দুনিয়াটা ছিল একটা উদ্দেশ্যহীন খেলার বস্তু। তারা এখানে নিজেদেরকে দায়িত্বহীন সৃষ্টি মনে করতো। তাদের মতে তাওহীদের দাওয়াত ছিল মিথ্যা। তাদের উপাস্য আল্লাহর অংশীদার, তাদের এ দাবীর ব্যাপারে তারা ছিল একগুঁয়ে ও আপোষহীন। কুরআন আল্লাহর বাণী একথা মানতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। রিসালাত সম্পর্কে তাদের মন-মগজে ছিল একটি অদ্ভুত জাহেলী ধারণা এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবী পরখ করার জন্য নানা ধরনের অদ্ভুত মানদণ্ড পেশ করছিলো। তাদের মতে ইসলামের সত্য না হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল এই যে, তাদের নেতৃবৃন্দ, বড় বড় গোত্রীয় সর্দার এবং তাদের কওমের গবুচন্দ্ররা তা মেনে নিচ্ছিলো না এবং শুধু কতিপয় যুবক, কিছু সংখ্যক দরিদ্র লোক এবং কতিপয় ক্রীতদাস তার ওপর ঈমান এনেছিলো। তারা কিয়ামত, মৃত্যুর পরের জীবন এবং শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়কে মনগড়া কাহিনী বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল, বাস্তবে এসব ঘটা একেবারেই অসম্ভব।

এ সূরায় এসব গোমরাহীর প্রত্যেকটিকে সংক্ষেপে যুক্তি-প্রমাণসহ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং কাফেরদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সত্য ও বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করার পরিবর্তে যদি গোড়ামি ও হঠকারিতার মাধ্যমে কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই ধ্বংস করবে।

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝٣ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤

হা–মী–ম। এই কিতাব মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[১] আমি যমীন ও আসমান এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে বিশেষ সময় নির্ধারিত করে সৃষ্টি করেছি।[২] কিন্তু যে বিষয়ে এই কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে আছে।[৩]

হে নবী, এদের বলে দাও, "তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ডেকে থাকো কখনো কি তাদের ব্যাপারে ভেবে দেখেছো? আমাকে একটু দেখাও তো পৃথিবীতে তারা কি সৃষ্টি করেছে কিংবা আসমানসমূহের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় তাদের কি অংশ আছে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে ইতিপূর্বে প্রেরিত কোন কিতাব কিংবা জ্ঞানের কোন অবশিষ্টাংশ (এসব আকীদা–বিশ্বাসের সমর্থনে) তোমাদের কাছে থাকলে নিয়ে এসো।"[৪]

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরাতুয যুমার, টীকা ১ এবং সূরা আল জাসিয়া, টীকা ১, এর সাথে সূরা আস সিজদার এক নম্বর টীকাও যদি সামনে থাকে তাহলে এই ভূমিকার মূল ভাবধারা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১১; ইবরাহীম, টীকা ৩৩; আল হিজর, টীকা ৪৭; আন নাহল, টীকা ৬; আল আম্বিয়া, টীকা ১৫ থেকে ১৭; আল মু'মিনুন, টীকা ১০২; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫ ও ৭৬; লোকমান, টীকা ৫১; আদ দুখান, টীকা ৩৪ এবং আল জাসিয়া, টীকা ২৮।

৩. অর্থাৎ প্রকৃত সত্য হলো বিশ্ব জাহানের এই ব্যবস্থা উদ্দেশ্যহীন কোন খেলার বস্তু নয়, বরং একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা যেখানে ভাল ও মন্দ এবং জালেম ও মজলুমের ফায়সালা অবশ্যই ইনসাফ মোতাবেক হতে হবে। আবার বিশ্ব জাহানের এই ব্যবস্থা স্থায়ীও নয়। এর জন্য একটা সময় নির্ধারিত আছে যা শেষ হওয়ার পর তাকে অবশ্যই ধ্বংস হতে হবে। তাছাড়া আল্লাহর আদালতের জন্যও একটা সময় নির্ধারিত আছে। সেই সময় আসলে তা অবশ্যই কায়েম হবে। কিন্তু যারা আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাব মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা এসব সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। তারা এ চিন্তা মোটেই করছে না যে, এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন তাদেরকে নিজেদের কাজ-কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তারা মনে করে এসব পরম সত্য সম্পর্কে সারধান করে দিয়ে আল্লাহর রসূল তাদের কোন ক্ষতি করেছেন। অথচ তিনি তাদের অনেক কল্যাণ করেছেন। কারণ, হিসাব, নিকাশ ও জবাবদিহির সময় আসার পূর্বেই তিনি তাদের শুধু বলেননি যে, সে সময় আসবে বরং যাতে তারা সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে সে জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে সাথে সাথে তাও বলে দিয়েছেন।

পরবর্তী বক্তব্য বুঝার জন্য এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ তার আকীদা বা বিশ্বাস নির্ধারণে যে ভুল করে সেটিই তার সবচেয়ে বড় মৌলিক ভুল। এ ব্যাপারে ঢিলাঢালা ও উদাসীন ভাব দেখিয়ে কোন গভীর এবং গঠনমূলক চিন্তা ও বিশ্লেষণ ছাড়া ভাসা ভাসা, হালকা, অগভীর আকীদা গড়ে নেয়া এমন একটি বড় বোকামি যা পার্থিব জীবনে মানুষের চাল চলন ও আচার-আচরণকে এবং চিরদিনের জন্য তার পরিণামকে ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু যে কারণে মানুষ এই বিপজ্জনক গাছাড়া ভাব ও উদাসীনতার মধ্যে হারিয়ে যায় তা হলো, সে নিজেকে দায়িত্বহীন ও জবাবদিহি মুক্ত মনে করে এবং এই ভুল ধারণা পোষণ করে বসে যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে যে আকীদাই গ্রহণ করি না কেন তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। কেননা, হয় মৃত্যুর পরে আদৌ কোন জীবন নেই যেখানে আমাকে কোন প্রকার জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে, কিংবা এমন কোন জীবন হবে যেখানে জবাবদিহি করতে হলেও আমি যেসব সত্তার আশ্রয় নিয়ে আছি তারা আমাকে খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করবে। দায়িত্বানুভূতির এই অনুপস্থিতি ব্যক্তিকে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুবিবেচনাহীন বানিয়ে দেয়। সে কারণে সে পরম নিশ্চিন্ততার সাথে নাস্তিকতা থেকে শুরু করে শিরকের চরম অযৌক্তিক পন্থা পর্যন্ত নানা ধরনের অর্থহীন আকীদা-বিশ্বাস নিজেই রচনা করে অথবা অন্যদের রচিত আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে নেয়।

৪. যেহেতু শ্রোতারা একটি মুশরিক জাতির লোক তাই তাদের বলা হচ্ছে, দায়িত্বানুভূতির অনুপস্থিতির কারণে তারা না বুঝে শুনে কিভাবে এক চরম অযৌক্তিক আকীদা আঁকড়ে ধরে আছে। তারা আল্লাহকে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা স্বীকার করার সাথে

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا
لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ
افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট কে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়।[৫] এমনকি আহবানকারী যে তাকে আহ্বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ।[৬] যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে তখন তারা নিজেদের আহবানকারীর দুশমন হয়ে যাবে এবং ইবাদতকারীদের অস্বীকার করবে।[৭]

যখন এসব লোকদের আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয় এবং সত্য তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে তখন এই কাফেররা বলে এতো পরিষ্কার যাদু।[৮] তারা কি বলতে চায় যে, রসূল নিজেই এসব রচনা করেছেন?[৯] তাদের বলে দাও ঃ "আমি নিজেই যদি তা রচনা করে থাকি তাহলে কোন কিছু আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যেসব কথা তোমরা তৈরী করছো আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। আমার ও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট।[১০] তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[১১]

সাথে আরো বহু সত্তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো। তাদের কাছে প্রার্থনা করতো, তাদেরকে নিজের প্রয়োজন পূরণকারী ও বিপদ ত্রাণকারী মনে করতো, তাদেরকে তোসামোদ করতো এবং নজর–নিয়াজ পেশ করতো এবং মনে করতো, আমাদের ভাগ্য গড়ার ও ভাঙার সমস্ত ক্ষমতা তাদেরই আছে। সেই সব ব্যক্তিদের সম্পর্কেই তাদের জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে, তোমরা কি কারণে তাদেরকে নিজেদের উপাস্যের মর্যাদা দান করেছো? একথা সবারই জানা যে, উপাস্য হওয়ার অধিকারে আল্লাহর সাথে কাউকে

অংশীদার করার দুটি ভিত্তি হতে পারে। সে ব্যক্তি নিজে কোন মাধ্যমের সাহায্যে জেনে নিয়েছে যে, যমীন ও আসমান সৃষ্টির ব্যাপারে সত্যিই তার কোন অংশ আছে, নয়তো আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন যে, খোদায়ীর কাজে অমুক ব্যক্তি আমার অংশীদার। এখন যদি কোন মুশরিক এ দাবী করতে না পারে যে তার উপাস্যদের আল্লাহর শরীক হওয়ার ব্যাপারে তার কাছে সরাসরি জ্ঞান আছে, অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত কোন কিতাবে দেখাতে না পারে যে আল্লাহ নিজেই কাউকে তাঁর শরীক ঘোষণা করেছেন, তাহলে তার এই আকীদা অবশ্যই চূড়ান্তরূপে ভিত্তিহীন।

এই আয়াতে "ইতিপূর্বে প্রেরিত কোন কিতাব" অর্থ এমন কোন কিতাব যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিলের পূর্বে প্রেরিত হয়েছে। আর জ্ঞানের "অবশিষ্টাংশ" অর্থ প্রাচীনকালের নবী–রসূল ও নেক লোকদের শিক্ষার এমন কোন অংশ যা পরবর্তী বংশধরদের কাছে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রে পৌঁছেছে। এই দুটি সূত্রে মানুষ যা কিছুই লাভ করেছে তার মধ্যে শিরকের লেশমাত্র নেই। কুরআন যে তাওহীদের দিকে আহবান জানাচ্ছে সমস্ত আসমানী কিতাব সর্বসম্মতভাবে সেই তাওহীদই পেশ করছে। প্রাচীন জ্ঞান–বিজ্ঞানের যতটুকু স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট আছে তার মধ্যেও কোথাও এ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, নবী, অলী বা নেক্কার ব্যক্তিগণ মানুষকে কখনো আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি কিতাব অর্থ যদি আল্লাহর কিতাব এবং জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ অর্থ যদি নবী–রসূল ও নেক লোকদের রেখে যাওয়া জ্ঞান এই অর্থ গ্রহণ নাও করা হয় তাহলেও পৃথিবীর কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এবং দীনী বা দুনিয়াবী জ্ঞান–বিজ্ঞানের কোন বিশেষজ্ঞের গবেষণা ও বিশ্লেষণেও আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন ইংগিত দেয়া হয়নি যে, পৃথিবী বা আসমানের অমুক বস্তু খোদা সৃষ্টি করেননি, বরং অমুক বুজর্গ অথবা অমুক দেবতা সৃষ্টি করেছে অথবা এই বিশ্ব জাহানে মানুষ যেসব নিয়ামত ভোগ করছে তার মধ্যে অমুক নিয়ামতটি আল্লাহর নয়, অমুক উপাস্যের সৃষ্টি।

৫. জবাব দেয়ার অর্থ কার্যত জবাবী, তৎপরতা দেখানো, শুধু মুখে উচ্চস্বরে জবাব দেয়া কিংবা লিখিতভাবে জবাব পাঠিয়ে দেয়া নয়। অর্থাৎ কেউ যদি সেই উপাস্যদের কাছে নালিশ বা সাহায্য প্রার্থনা করে, কিংবা তাদের কাছে দোয়া করে তাহলে যেহেতু তাদের আদৌ কোন শক্তি ও কর্তৃত্ব নেই তাই তার আবেদনে কোন প্রকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাস্তব তৎপরতা চালাতে সক্ষম নয়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আয যুমার, টীকা ৩৩)

কিয়ামত পর্যন্ত জবাব না দিতে পারার অর্থ হচ্ছে, যত দিন পর্যন্ত এই পৃথিবী আছে ততদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা ওখানেই স্থির থাকবে। অর্থাৎ সেই সব উপাস্যদের পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের কোন জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন কিয়ামত হবে তখন ব্যাপারটা আরো অগ্রসর হয়ে এই দাঁড়াবে যে, সেই সব উপাস্যরা উল্টা এসব উপাসনাকারীদের দুশমন হয়ে যাবে। পরের আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ এসব আহবানকারীদের আহবান আদৌ তাদের কাছে পৌঁছে না। না তারা নিজের কানে তা শোনে, না অন্য কোন সূত্রে তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে যে পৃথিবীতে কেউ তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। আল্লাহর এ বাণীকে আরো পরিষ্কার করে এভাবে বুঝুন ঃ সারা পৃথিবীর মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যেসব সত্তার কাছে প্রার্থনা করছে

তারা তিনভাগে বিভক্ত। এক, প্রাণহীন ও জ্ঞান–বুদ্ধিহীন সৃষ্টি। দুই, অতীতের বুযর্গ মানুষেরা। তিন, সেই সব পথভ্রষ্ট মানুষ যারা নিজেরাও নষ্ট ছিল এবং অন্যদেরও নষ্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলো। প্রথম প্রকারের উপাস্যদের তাদের উপাসনাকারীদের উপাসনা সম্পর্কে অনবহিত থাকা সুস্পষ্ট। এরপর থাকে দ্বিতীয় প্রকারের উপাস্য যারা ছিল আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মানুষ। এদের অনবহিত থাকার কারণ দু'টি। একটি কারণ হচ্ছে, তারা আল্লাহর কাছে এমন একটি জগতে আছে যেখানে মানুষের আওয়াজ সরাসরি তাদের কাছে পৌছে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে, যারা সারা জীবন যেসব মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শিখিয়েছেন তারাই এখন উল্টা তাদের কাছে প্রার্থনা করছে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা তাদের কাছে এ খবর পৌছিয়ে দেন না। কারণ, তাদের কাছে এই খবরের চেয়ে বেশী কষ্টদায়ক জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ তাঁর সেই নেক বান্দাদের কষ্ট দেয়া কখনো পসন্দ করেন না। এরপর তৃতীয় প্রকারের উপাস্যদের সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন, তাদের অনবহিত থাকারও দুটি মাত্র কারণ। একটি কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর কাছে অপরাধী হিসেবে বিচারের অপেক্ষায় বন্দী। সেখানে দুনিয়ার কোন আবেদন–নিবেদন পৌছে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারাও তাদের এ খবর দেন না যে, পৃথিবীতে তোমাদের মিশন খুব সফলতা লাভ করেছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পর মানুষ তোমাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ এ খবর তাদের জন্য খুশীর কারণ হবে। অথচ আল্লাহ জালেমদের কখনো খুশী করতে চান না।

এ প্রসঙ্গে একথাও বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর সৎ বান্দাদের কাছে দুনিয়ার মানুষের সালাম এবং তাদের রহমত কামনার দোয়া পৌছিয়ে দেন। কেননা এসব তাদের খুশীর কারণ হয়। একইভাবে তিনি অপরাধীদেরকে দুনিয়ার মানুষের অভিশাপ, ক্রোধ ও তিরস্কার সম্পর্কেও অবহিত করেন। যেমন একটি হাদীস অনুসারে বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরস্কার শুনানো হয়েছিলো। কারণ, তা ছিল তাদের জন্য কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু যা নেককার বান্দাদের জন্য দুঃখ ও মনকষ্টের এবং অপরাধীদের জন্য আনন্দের কারণ হয় সে রকম বিষয় তাদের কাছে পৌছানো হয় না। এই ব্যাখ্যার সাহায্যে মৃতদের শুনতে পাওয়া সম্পর্কিত বিষয়টির তাৎপর্য অতি উত্তম রূপে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৭. অর্থাৎ তারা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে, না আমরা কোন সময় তোমাদের একথা বলেছি যে, আমাদের ইবাদত করতে হবে, না আমাদের জানা আছে যে, এ লোকেরা আমাদের 'ইবাদত' করতো। এই গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। তাই তার পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। এ গুনাহে আমাদের কোন অংশ নেই।

৮. এর অর্থ হচ্ছে, যখন কুরআনের আয়াতসমূহ মক্কার কাফেরদের শুনানো হতো তখন তারা পরিষ্কার উপলব্ধি করতো যে, এ বাণীর মর্যাদা মানুষের কথার চাইতে অনেক গুণ বেশী। কুরআনের অতুলনীয় অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা হৃদয় বিমুগ্ধকারী ভাষণ, উন্নত বিষয় বস্তু এবং হৃদয় উত্তপ্তকারী বর্ণনাভংগির সাথে তাদের কোন কবি, বক্তা এবং শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মেরও কোন তুলনাই ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণীর মধ্যে যে উৎকর্ষতা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাণীর মধ্যেও তা ছিল না। যারা শৈশব থেকে তাঁকে দেখে আসছিলো তারা কুরআনের ভাষা এবং তাঁর ভাষার মধ্যে কত বড় পার্থক্য ছিল তা ভাল করেই জানতো। এক ব্যক্তি, যে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে রাত দিন তাদের মাঝেই অবস্থান করে আসছে সে হঠাৎ কোন সময় এমন এক বাণী রচনা করে ফেলছে যার ভাষার তাঁর নিজের জানা ভাষার সাথে আদৌ কোন মিল নেই, একথা বিশ্বাস করা তাদের জন্য মোটেই সম্ভব ছিল না। এই জিনিসটি তাদের সামনে সত্যকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে তুলে ধরছিলো। কিন্তু তারা যেহেতু কুফরীকে আঁকড়ে ধরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, তাই এই সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেও এই বাণীকে অহীর বাণী হিসেবে মেনে নেয়ার পরিবর্তে বলতো যে, তা কোন যাদুর কারসাজি। (আরো যে দিকটি বিচার করে তারা কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করতো তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। দেখুন, তাফহীমূল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৫; সূরা সোয়াদের তাফসীর, টীকা ৫)।

৯. এই প্রশ্নমূলক বর্ণনাভংগির মধ্যে অতি বিস্ময় পরিলক্ষিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, এরা কি এতই নির্লজ্জ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরআন নিজে রচনা করার অপবাদ আরোপ করে। অথচ এরা ভাল করেই জানে যে, এটা তাঁর রচিত বাণী হতে পারে না। তাছাড়া এ বাণীকে তাদের যাদু বলা পরিষ্কারভাবে একথাই স্বীকার করে নেয়া যে, এটা একটা অসাধারণ বাণী যা তাদের নিজেদের মতেও কোন মানুষের রচনা হওয়া সম্ভব নয়।

১০. তাদের অপবাদ যে ভিত্তিহীন এবং সরাসরি হঠকারিতামূলক তা যেহেতু সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল তাই তার প্রতিবাদে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। অতএব, শুধু একথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যদি প্রকৃতই আমি নিজে একটি বাণী রচনা করে তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মত মহা অপরাধ করে থাকি—যে অভিযোগে তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করছো—তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তোমরা আসবে না। কিন্তু এটা যদি আল্লাহরই বাণী হয়ে থাকে আর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তোমরা তা প্রতিরোধ করে থাকো তাহলে তোমাদের সাথে আল্লাহই বুঝাপড়া করবেন। প্রকৃত সত্য আল্লাহর অজানা নয়। সুতরাং মিথ্যা ও সত্যের ফায়সালার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সারা পৃথিবী যদি কাউকে মিথ্যাবাদী বলে আর আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই তার পক্ষে হবে। আর গোটা পৃথিবী যদি কাউকে সত্যবাদী বলে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত সে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত হবে। অতএব, আবোল তাবোল না বলে নিজের পরিণামের কথা চিন্তা করো।

১১. এখানে এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা। যারা আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠিত নয়, এই দয়া ও ক্ষমার কারণেই তারা পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে। কোন নির্দয় ও কঠোর আল্লাহ যদি এই বিশ্ব জাহানের মালিক হতেন তাহলে এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের একটি শ্বাস গ্রহণের পর আরেকটি শ্বাস গ্রহণের ভাগ্য হতো না। এ আয়াতাংশের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এই যে, হে জালেমরা এখনো যদি এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও তাহলে আল্লাহর

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠﴾

এদের বলো, 'আমি কোন অভিনব রসূল নই। কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে এবং আমার সাথেই বা কি আচরণ করা হবে তা আমি জানি না। আমি তো কেবল সেই অহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে পাঠানো হয় এবং আমি সুস্পষ্ট সাবধানকারী ছাড়া আর কিছুই নই।[১২] *হে নবী (সা)! তাদের বলো, 'তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো, যদি এই বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো (তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে)?*[১৩] *এ রকম একটি বাণী সম্পর্কে তো বনী ইসরাঈলদের একজন সাক্ষী সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা আত্মম্ভরিতায় ডুবে আছো।*[১৪] *এ রকম জালেমদের আল্লাহ হিদায়াত দান করেন না।"*

রহমতের দরজা তোমাদের জন্য খোলা আছে এবং অদ্যাবধি তোমরা যা কিছু করেছো তা মাফ হতে পারে।

১২. এ বাণীর পটভূমি এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজেকে আল্লাহর রসূল হিসেবে পেশ করলেন তখন মক্কার লোকেরা একথা শুনে নানা রকম কথা বলতে শুরু করলো। তারা বলতো : এ আবার কেমন রসূল যার সন্তানাদি আছে, যে বাজারে যায়, পানাহার করে এবং আমাদের মত মানুষের ন্যায় জীবন যাপন করে। তাহলে তার মধ্যে আলাদা কি বৈশিষ্ট আছে যে দিক দিয়ে সে সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন এবং যার ফলে আমরাও বুঝতে পারবো যে, আল্লাহ বিশেষভাবে এই ব্যক্তিকেই তাঁর রাসূল বানিয়েছেন? তারা আরো বলতো, আল্লাহ যদি এই ব্যক্তিকেই তাঁর রসূল বানাতেন তাহলে তার আরদালী হিসেবে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন। সেই ফেরেশতা ঘোষণা করতো, তিনি আল্লাহর রসূল। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সামান্যতম বে-আদবীও করতো সে তাকেই শাস্তি স্বরূপ বেত্রাঘাত করতো। আল্লাহ যাকে তাঁর রাসূল হিসেবে নিয়োগ করবেন তাঁকে মক্কার অলিতে গলিতে এভাবে চলতে এবং সবরকম জুলুম-অত্যাচার বরদাশত করার জন্য অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবেন তা কি করে হতে পারে? আর কিছু না হলেও অন্তত এতটুকু হতো যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য একটি জাঁকালো রাজ প্রাসাদ এবং একটি সবুজ-শ্যামল তরুজাতা বাগান তৈরী করে দিতেন। তাহলে তাঁর রসূলের স্ত্রীর অর্থ-সম্পদ যখন নিঃশেষ হতো তখন তাঁর অভুক্ত থাকার মতো পরিস্থিতি আসতো না এবং তায়েফ

যাওয়ার জন্য সওয়ারী থাকতো না। এমন অবস্থাও দেখা দিতো না তাছাড়াও তারা তাঁর কাছে নানা ধরনের মু'জিযার দাবী করতো এবং গায়েবী বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইতো। তাদের ধারণায় কোন ব্যক্তির আল্লাহর রসূল হওয়ার অর্থ ছিল সে অতিমানবিক শক্তির মালিক হবে। তাঁর একটি ইংগিতে পাহাড় স্থানচ্যুত হবে, চোখের পলকে মরুভূমি শ্যামল শস্য ক্ষেতে পরিণত হবে, অতীত ও ভবিষ্যত সব কিছু তাঁর জানা থাকবে এবং অদৃশ্য সব কিছু তাঁর কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হবে।

আয়াতটির বিভিন্ন ছোট ছোট অংশে একথাগুলোরই জবাব দেয়া হয়েছে। এর প্রতিটি অংশের মধ্যেই ব্যাপক অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে।

একটি অংশে বলা হয়েছে, এদের বলো, "আমি অন্য রসূলদের থেকে ভিন্ন কোন রসূল নই।" অর্থাৎ আমাকে রসূল বানানো দুনিয়ার ইতিহাসে রসূল বানানোর প্রথম ঘটনা নয় যে, রসূল কি এবং কি নন তা বুঝতে তোমাদের কষ্ট হবে। আমার পূর্বে বহু রসূল এসেছিলেন। আমি তাদের থেকে আলাদা কিছু নই। পৃথিবীতে এমন কোন রসূল কখন এসেছেন যার সন্তানাদি ছিল না, কিংবা যিনি পানাহার করতেন না অথবা সাধারণ মানুষদের মত জীবন যাপন করতেন না? কোন্ রসূলের সাথে ফেরেশতা এসে তাঁর রিসালাতের ঘোষণা দিতো এবং তাঁর আগে আগে চাবুক হাতে চলতো? কোন্ রসূলের জন্য বাগান ও রাজ প্রাসাদ তৈরী করে দেয়া হয়েছে এবং আমি যে দুঃখ–কষ্ট বরদাশত করছি আল্লাহর পথে ডাকতে গিয়ে কে তা করেনি? এমন রসূল কে এসিছিলেন যিনি তাঁর ইচ্ছামত মু'জিযা দেখাতে পারতেন কিংবা নিজের জ্ঞান দিয়েই সব কিছু জানতেন? তাহলে শুধু আমার রিসালাত পরখ করে দেখার জন্য এই অভিনব ও স্বতন্ত্র মানদণ্ড তোমরা কোথা থেকে নিয়ে আসছো?

এর পরে বলা হয়েছে, জবাবে তাদের একথাও বলো, "কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে এবং আমার সাথেই বা কি আচরণ করা হবে তা আমি জানি না।" আমি তো কেবল আমার কাছে প্রেরিত অহী অনুসরণ করি। অর্থাৎ আমি আলেমুল গায়েব নই যে, আমার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছু সুস্পষ্ট থাকবে এবং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই আমার জানা থাকবে। তোমাদের ভবিষ্যত তো দূরের কথা আমার নিজের ভবিষ্যতও আমার জানা নেই। আমাকে অহীর মাধ্যমে যে জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হয় আমি শুধু সেটাই জানি। এর চেয়ে বেশী জানার দাবী আমি কবে করেছিলাম? এমন জ্ঞানের অধিকারী রসূলই বা পৃথিবীতে কবে এসেছিলেন যে তোমরা আমার রিসালাত পরখ করার জন্য আমার গায়েবী জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছো। হারানো বস্তুর সন্ধান বলা, গর্ভবতী নারী পুত্র সন্তান প্রসব করবে না কণ্যা সন্তান এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে না মারা যাবে এসব বলা কবে থেকে রসূলের কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সব শেষে বলা হয়েছে, তাদের বলে দাও, "আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।" অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী নই যে, তোমরা প্রতিনিয়ত আমার কাছে যে মু'জিযার দাবী করছো তা দেখিয়ে দেবো। আমাকে যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে তা শুধু এই যে, আমি মানুষের সামনে সঠিক পথ পেশ করবো এবং যারা তা গ্রহণ করবে না তাদেরকে এর মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দেবো।

১৩. এ বিষয়টি ইতিপূর্বে অন্যভাবে সূরা হা–মীম আস–সাজদার ৫২ আয়াতে বলা হয়েছে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, উল্লেখিত সূরার তাফসীর, টীকা ৬৯।

১৪. মুফাসসিরদের একটি বড় দল এই সাক্ষী বলতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে বুঝিয়েছেন। তিনি মদীনার একজন বড় ইহুদী আলেম ছিলেন। তিনি হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনেন। এ ঘটনা যেহেতু মদীনাতে সংঘটিত হয়েছিলো তাই মুফাসসিরদের মত হলো, এটি মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত। আয়াতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের এই বর্ণনাই এ ব্যাখ্যার ভিত্তি। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর)। এ কারণেই ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, দাহ্হাক, ইবনে সিরীন, হাসান বাসারী, ইবনে যায়েদ এবং 'আওফ ইবনে মালেক আল–আশজায়ীর মত কিছু সংখ্যক বড় বড় মুফাসসিরও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অপর দিকে ইকরিমা, শাবী ও মাসরুক বলেন ঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে হতে পারে না। কারণ, গোটা সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। ইবনে জারীর তাবারীও এ মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হলো, প্রথম থেকেই মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ করে ধারাবাহিকভাবে গোটা বক্তব্য চলে আসছে এবং পরের সবটুকু বক্তব্যও তাদের উদ্দেশেই পূর্বাপর এই প্রসংগের মধ্যে হঠাৎ মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত এসে যাওয়া কল্পনা করা যায় না। পরবর্তীকালের যেসব মুফাসসির এই দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন তারা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করেন না। তারা মনে করেন, আয়াতটি যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারেও খাটে তাই হযরত সা'দ প্রাচীনদের অভ্যাস অনুসারে বলেছেন এটি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি যখন ঈমান এনেছেন তখন এটি তাঁর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, এ আয়াত তাঁর বেলায়ও হুবহু ঠিক। তাঁর ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে এ আয়াত পুরোপুরি প্রযোজ্য।

বাহ্যত এই দ্বিতীয় মতটিই অধিক বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এরপর আরো একটি প্রশ্নের সমাধান দেয়া দরকার যে, সাক্ষী বলতে এখানে কাকে বুঝানো হয়েছে? যেসব মুফাসসির এই দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন তাদের কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা মূসা আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্যাংশ, "সে ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা আত্মম্ভরিতায় ডুবে আছো।"–এর এই ব্যাখ্যার সাথে কোন মিল নেই। মুফাসসির নিশাপুরী ও ইবনে কাসীর যে মত ব্যক্ত করেছেন সেটিই অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। অর্থাৎ এখানে সাক্ষী অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, বরং বনী ইসরাঈলদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর বাণীর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, কুরআন তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা কোন অভিনব জিনিস নয়। পৃথিবীতে প্রথমবারের মত শুধুমাত্র তোমাদের সামনেই তা পেশ করা হয়নি যে, তোমরা ওজর পেশ করে বলবে ঃ এ ধরনের কথা তো ইতিপূর্বে মানব জাতির কাছে আর আসেনি। তাই আমরা কি করে তা মানতে পারি। ইতিপূর্বেও এসব শিক্ষা এভাবেই অহীর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদের কাছে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাব রূপে এসেছিলো। বনী ইসরাঈলদের একজন সাধারণ মানুষও তা মেনে নিয়েছিলো এবং একথা স্বীকার করে নিয়েছিলো যে, অহীই হচ্ছে এসব শিক্ষা নাযিল হওয়ার মাধ্যম। তাই অহী এবং এই

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

২ রুকূ'

যারা মানতে অস্বীকার করেছে তারা মু'মিনদের সম্পর্কে বলে, এই কিতাব মেনে নেয়া যদি কোন ভাল কাজ হতো তাহলে এ ব্যাপারে এসব লোক আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারতো না।[১৫] যেহেতু এরা তা থেকে হিদায়াত লাভ করেনি তাই তারা অবশ্যই বলবে, এটা পুরনো মিথ্যা।[১৬] অথচ এর পূর্বে মূসার কিতাব পথ–প্রদর্শক ও রহমত হয়ে এসেছিলো। আর এ কিতাব তার সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায় এসেছে যাতে জালেমদের সাবধান করে দেয়[১৭] এবং সৎ আচরণ গ্রহণ–কারীদের সুসংবাদ দান করে। যারা ঘোষণা করেছে আল্লাহই আমাদের রব, অতপর তার ওপরে স্থির থেকেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা মন মরা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে না।[১৮] এ ধরনের সব মানুষ জান্নাতে যাবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, তাদের সেই কাজের বিনিময়ে যা তারা পৃথিবীতে করেছিলো।

শিক্ষা দুর্বোধ্য জিনিস তোমরা সে দাবী করতে পার না। আসল কথা হলো, তোমাদের গর্ব, অহংকার এবং ভিত্তিহীন আত্মম্ভরিতা ঈমানের পথে অন্তরায়।

১৫. কুরাইশ নেতারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য যেসব যুক্তি কাজে লাগাতো এটা তার একটা। তারা বলতো, 'এ কুরআন যদি সত্য হতো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি একটি সঠিক জিনিসের দাওয়াত দিতেন তাহলে কওমের নেতারা, গোত্রসমূহের অধিপতিরা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অগ্রসর হয়ে তা গ্রহণ করতো। এটা কি করে হতে পারে যে, কতিপয় অনভিজ্ঞ বালক এবং কিছু সংখ্যক নীচু পর্যায়ের ক্রীতদাস একটি যুক্তিসঙ্গত কথা মেনে নেবে কিন্তু কওমের গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এবং আজ পর্যন্ত কওম যাদের জ্ঞান–বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে আসছে তারা তা

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ
الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

আমি মানুষকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারা যেন পিতা–মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলো এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছিলো। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে।[১৯] এমন কি যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌছেছে এবং তারপর চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তখন বলেছে ঃ "হে আমার রব, তুমি আমাকে ও আমার পিতা–মাতাকে যেসব নিয়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দাও যা তুমি পসন্দ করো।[২০] আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমাকে সুখ দাও। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" এ ধরনের মানুষের কাছে থেকে তাদের উত্তম আমলসমূহ আমি গ্রহণ করে থাকি, তাদের মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করে দেই।[২১] যে প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়ে আসা হয়েছে তা ছিলো সত্য প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে এরা জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রত্যাখ্যান করবে? নতুন এই আন্দোলনে মন্দ কিছু অবশ্যই আছে। তাই কওমের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তা মানছে না। অতএব, তোমরাও তা থেকে দূরে সরে যাও, এই প্রতারণা মূলক যুক্তি খাড়া করে তারা সাধারণ মানুষকে শান্ত করে রাখার চেষ্টা করতো।

১৬. অর্থাৎ এসব লোক নিজেরাই নিজেদেরকে হক ও বাতিলের মানদণ্ড গণ্য করে রেখেছে। এরা মনে করে, এরা যে হিদায়াতকে গ্রহণ করবে না তাকে অবশ্যই গোমরাহী

ও পথভ্রষ্টতা হতে হবে। কিন্তু এরা একে নতুন মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করার সাহস রাখে না। কারণ, এর আগের যুগের নবী–রসূলগণ এ শিক্ষাই পেশ করেছেন এবং আহলে কিতাবদের কাছে যেসব আসমানী কিতাব আছে তার সবই এ আকীদা–বিশ্বাস ও নির্দেশনায় ভরপুর। এ কারণে এরা একে পুরনো মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে। যারা হাজার হাজার বছর ধরে এসব সত্য পেশ করে এসেছে এবং মেনেছে এদের মতে তারা সবাই জ্ঞান–বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত। সমস্ত জ্ঞান শুধু এদের অংশেই পড়েছে।

১৭. অর্থাৎ সেই সব লোককে খারাপ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেবেন যারা আল্লাহর সাথে কুফরী এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করে নিজের এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতি জুলুম করছে এবং নিজের এই গোমরাহীর কারণে নৈতিক চরিত্র ও কর্মের এমন সব ত্রুটি–বিচ্যুতির মধ্যে ডুবে আছে যার ফলে মানব সমাজ নানা প্রকার জুলুম–অত্যাচার ও বে–ইনসাফীতে ভরে উঠেছে।

১৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা–মীম আস–সাজদা, টীকা ৩৩ থেকে ৩৫।

১৯. সন্তানদের যদিও মা–বাপ উভয়েরই সেবা করতে হবে কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়া মায়ের অধিকার এ কারণে বেশী যে, সে সন্তানের জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার করে। এ আয়াত এ দিকেই ইংগিত করে। একটি হাদীস থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমদ এবং ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলো, আমার ওপর কার খেদমতের হক সবচেয়ে বেশী? নবী (সা) বললেন ঃ তোমার মা'র; সে বললো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে আবারো জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার বাপ। নবীর (সা) এই বাণী হুবহু এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা। কারণ, এতেও মায়ের তিনগুণ বেশী অধিকারের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে ঃ (১) কষ্ট করে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। (২) কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং (৩) গর্ভধারণ ও দুধ পান করাতে ৩০ মাস লেগেছে।

এ আয়াত, সূরা লোকমানের ১৪ আয়াত এবং সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াত থেকে আরো একটি আইনগত বিষয় পাওয়া যায়। একটি মামলায় হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস সেই বিষয়টিই তুলে ধরেছিলেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে হযরত উসমান (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। ঘটনাটা হচ্ছে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত যুগে এক ব্যক্তি জুহায়না গোত্রের একটি মেয়েকে বিয়ে করে এবং বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই তার গর্ভ থেকে একটি সুস্থ ও ত্রুটিহীন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। লোকটি হযরত উসমানের কছে ঘটনাটা পেশ করে। তিনি উক্ত মহিলাকে ব্যভিচারিনী ঘোষণা করে তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা) এই ঘটনা শোনা মাত্র হযরত উসমানের (রা) কাছে পৌছেন এবং বলেন ঃ আপনি এ কেমন ফায়সালা করলেন? জবাবে হযরত উসমান বললেন, বিয়ের ছয় মাস পরেই সে জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করেছে। এটা কি তার ব্যভিচারিনী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়? হযরত আলী (রা) বললেন ঃ না এর পর তিনি কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত তিনটি ধারাবাহিকভাবে পাঠ করলেন। সূরা বাকারায়

আল্লাহ বলছেন ঃ "যে পিতা দুধ পানের পূর্ণ সময় পর্যন্ত দুধ পান করাতে চায় মায়েরা তার সন্তানকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।" সূরা লোকমানে বলেছেন ঃ "তার দুধ ছাড়তে দুই বছর লেগেছে। সূরা আহক্বাফে বলেছেন ঃ "তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে।" এখন ত্রিশ মাস থেকে যদি দুধ পানের দুই বছর বাদ দেয়া হয় তাহলে গর্ভ ধারণকাল ছয় মাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এ থেকে জানা যায়, গর্ভ ধারণের স্বল্পতম মেয়াদ ছয় মাস। এই সময়ের মধ্যে সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হতে পারে। অতএব, যে মহিলা বিয়ের ছয় মাস পরে সন্তান প্রসব করেছে তাকে ব্যভিচারিনী বলা যায় না। হযরত আলীর (রা) এই যুক্তি–প্রমাণ শুনে হযরত উসমান বললেন ঃ আমার মন–মস্তিষ্কে এ বিষয়টি আদৌ আসেনি। এরপর তিনি মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। একটি বর্ণনাতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাসও এ বিষয়ে হযরত আলীর মতকে সমর্থন করেছিলেন এবং তারপর হযরত উসমান তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছিলেন (ইবনে জারীর, আহকামুল কুরআন জাসসাস, ইবনে কাসীর)।

এ তিনটি আয়াত একত্রিত করে পাঠ করলে যেসব আইনগত বিধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ যে মহিলা বিয়ের পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করবে (অর্থাৎ তা যদি গর্ভপাত না হয়, বরং স্বাভাবিক প্রসব হয়) সে ব্যভিচারিনী সাব্যস্ত হবে এবং তার স্বামীর বংশ পরিচয়ে তার সন্তান পরিচিত হবে না।

দুই ঃ যে মহিলা বিয়ের ছয় মাস পর বা তার চেয়ে বেশী সময় পর জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করবে শুধু এই সন্তান প্রসব করার কারণে তাকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না। তার স্বামীকে তার প্রতি অপবাদ আরোপের অধিকার দেয়া যেতে পারে না এবং তার স্বামী ঐ সন্তানের বংশ পরিচয় অস্বীকার করতে পারে না। সন্তান তারই বলে স্বীকার করা হবে এবং মহিলাকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

তিন ঃ দুধপান করানোর সর্বাধিক মেয়াদ দুই বছর। এই বয়সের পর যদি কোন শিশু কোন মহিলার দুধ পান করে তাহলে সে তার দুধ মা হবে না এবং সূরা নিসার ২৩ আয়াতে দুধ পানের যে বিধি–বিধান বর্ণিত হয়েছে তাও এই ধরনের দুধপানের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা অধিক সতর্কতার জন্য দুই বছরের পরিবর্তে আড়াই বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যাতে দুধপান করানোর কারণে যে সব বিষয় হারাম হয় সেই সব নাজুক বিষয়ে ভুল করার সম্ভাবনা না থাকে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা লোকমান, টীকা ২৩)

এখানে এ বিষয়টির অবগতি বে–ফায়েদা হবে না যে, সর্বাধুনিক মেডিকেল গবেষণা অনুসারে একটি শিশুকে পরিপুষ্টি ও পরিবৃদ্ধি লাভ করে জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপযোগী হতে হলে কমপক্ষে ২৮ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে অবস্থান প্রয়োজন। এটা সাড়ে ছয় মাস সময়কালের সামান্য বেশী। ইসলামী আইনে আরো প্রায় অর্ধ মাস সুযোগ দেয়া হয়েছে। কারণ, একজন মহিলার ব্যভিচারিনী প্রমাণিত হওয়া এবং একটি শিশুর বংশ পরিচয় থেকে বঞ্চিত হওয়া বড় গুরুতর ব্যাপার। মা ও শিশুকে আইনগত এই কঠিন পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য বিষয়টির নাজুকতা আরো বেশী সুযোগ পাওয়ার দাবী করে।

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

আর যে ব্যক্তি তার পিতা–মাতাকে বললো ঃ "আহ্! তোমরা বিরক্তির একশেষ করে দিলে। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছো যে, মৃত্যুর পর আমি আবার কবর থেকে উত্তোলিত হবো? আমার পূর্বে তো আরো বহু মানুষ চলে গেছে। (তাদের কেউ তো জীবিত হয়ে ফিরে আসেনি।)।" মা–বাপ আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে ঃ "আরে হতভাগা, বিশ্বাস কর। আল্লাহর ওয়াদা সত্য।" কিন্তু সে বলে, "এসব তো প্রাচীনকালের বস্তাপচা কাহিনী" এরাই সেই সব লোক যাদের ব্যাপারে আযাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। এদের পূর্বে জিন ও মানুষদের মধ্য থেকে (এই প্রকৃতির) যেসব ক্ষুদ্র দল অতীত হয়েছে এরাও গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে। নিশ্চয়ই এরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার লোক।[২২]

তাছাড়া গর্ভ কোন্ সময় স্থিতি লাভ করেছে তা কোন ডাক্তার, কোন বিচারক এবং এমনকি মহিলা নিজে এবং তাকে গর্ভদানকারী পুরুষও সঠিকভাবে জানতে পারে না। এ বিষয়টিও গর্ভধারণের স্বল্পতম আইনগত মেয়াদ নির্ধারণে আরো কয়েক দিনের অবকাশ দাবী করে।

২০. অর্থাৎ আমাকে এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দান করো যা বাহ্যিক দিক দিয়েও অবিকল তোমার বিধান মোতাবেক হবে এবং বাস্তবেও তোমার কাছে গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত হবে। কোন কাজ যদি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে খুব ভালও হয়, কিন্তু তাতে যদি আল্লাহর আইনের আনুগত্য না করা হয়, তাহলে দুনিয়ার মানুষ তার যত প্রশংসাই করুক না কেন আল্লাহর কাছে তা আদৌ কোন প্রশংসার যোগ্য হতে পারে না। অপরদিকে একটা কাজ যদি অবিকল শরীয়ত মোতাবেক হয় এবং তার বাহ্যিক রূপ ও কাঠামোতে ত্রুটি নাও থাকে, কিন্তু অসৎ নিয়ত, প্রদর্শনীর মনোভাব, আত্মতুষ্টি, গর্ব ও অহংকার এবং স্বার্থ লোভ তাকে ভেতর থেকে অন্তসারশূন্য করে দেয়, এমন কাজও আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার যোগ্য থাকে না।

২১. অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে যত বেশী ভাল কাজ করেছে আখেরাতে সেই অনুপাতে তাদের মর্যাদা নিরূপণ করা হবে। তবে তাদেরকে পদস্খলন, দুর্বলতা ও ত্রুটি–বিচ্যুতির

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

উভয় দলের প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা হবে তাদের কর্ম অনুযায়ী। যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেন। তাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না।[২৩] *অতপর এসব কাফেরদের যখন আগুনের সামনে এনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদের বলা হবে, 'তোমরা নিজের অংশের নিয়ামতসমূহ দুনিয়ার জীবনেই ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলোছো এবং তা ভোগ করেছো। কোন অধিকার ছাড়াই তোমরা পৃথিবীতে যে বড়াই করতে থেকেছো এবং যে নাফরমানি করেছো সে কারণে আজ তোমাদের লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে।*[২৪]

জন্য পাকড়াও করা হবে না। এটা ঠিক তেমনি যেমন কোন মহত হৃদয়, উদার ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মনিব তার অনুগত ও বিশ্বস্ত চাকরকে ছোট ছোট সেবা ও খেদমতের নিরিখে মূল্যায়ন করে না বরং তার এমন কোন কাজের বিচারে মূল্যায়ন করে যে ক্ষেত্রে সে বড় কোন কৃতিত্ব দেখিয়েছে কিংবা জীবনপাত ও বিশ্বস্ততার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। এ রকম খাদেমের ছোট ছোট ত্রুটি–বিচ্যুতি তুলে ধরে সে তার সমস্ত সেবাকে খাটো করে দেখানোর মত আচরণ করে না।

২২. এখানে দুই রকম চরিত্র পাশাপাশি রেখে শ্রোতাদেরকে যেন নিঃশব্দ এই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বলো, এ দুটি চরিত্রের মধ্যে কোনটি উত্তম? সমাজে সেই সময় পাশাপাশি এই দুটি চরিত্রই বিদ্যমান ছিল। প্রথম প্রকার চরিত্রের অধিকারী কারা এবং দ্বিতীয় প্রকার চরিত্রের অধিকারী কারা তা জানা মানুষের জন্য আদৌ কঠিন ছিল না। এটা কুরাইশ নেতাদের এই উক্তির জবাব যে, এই কিতাব মেনে নেয়া যদি কোন ভাল কাজ হতো তাহলে এই কতিপয় যুবক ও ক্রীতদাস এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারতো না। এই জবাবের আলোকে প্রতিটি মানুষ নিজেই বিচার করে দেখতে পারতো কিতাব মান্যকারীদের চরিত্র কি এবং অমান্যকারীদের চরিত্র কি?

২৩. অর্থাৎ না ভাল লোকদের ত্যাগ ও কুরবানী নষ্ট হবে না মন্দ লোকদেরকে তাদের প্রকৃত অপরাধের অধিক শাস্তি দেয়া হবে। সৎ ব্যক্তি যদি তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকে কিংবা প্রকৃত প্রাপ্যের চেয়ে কম পুরস্কার পায় তাহলে তা জুলুম। আবার খারাপ লোক যদি তার কৃত অপরাধের শাস্তি না পায় কিংবা যতটা অপরাধ সে করেছে তার চেয়ে বেশী শাস্তি পায় তাহলে সেটাও জুলুম।

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۖ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

এদেরকে 'আদের ভাই (হূদ)–এর কাহিনী কিছুটা শুনাও যখন সে আহক্বাফে তার কওমকে সতর্ক করেছিলো[২৫] –এ ধরনের সতর্ককারী পূর্বেও এসেছিলো এবং তার পরেও এসেছে—যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না। তোমাদের ব্যাপারে আমার এক বড় ভয়ংকর দিনের আযাবের আশংকা আছে। তারা বললো ঃ "তুমি কি এ জন্য এসেছো যে, আমাদের প্রতারিত করে আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে দেবে? ঠিক আছে, তুমি যদি প্রকৃত সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের যে আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে থাকো তা নিয়ে এসো।"

২৪. তারা যেমন বড়াই ও গর্ব করেছে লাঞ্ছনাকর আযাব হবে সেই অনুপাতে। তারা নিজেদের বড় একটা কিছু বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল রসূলের প্রতি ঈমান এনে গরীব ও অভাবী মু'মিনদের দলে শামিল হওয়া তাদের মর্যাদার চেয়ে নীচুমানের কাজ। তারা ভেবেছিলো, কতিপয় ক্রীতদাস ও সহায় সম্বলহীন মানুষ যে জিনিস বিশ্বাস করেছে আমাদের মত গণ্যমান্য লোকেরা যদি তা বিশ্বাস করে তাহলে তাতে আমাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। এ কারণে আখেরাতে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন এবং তাদের গর্ব ও অহংকার মাটিতে মিশিয়ে দেবেন।

২৫. যেহেতু কুরাইশ নেতারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পোষণ করতো এবং নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মোড়লিপনার কারণে আনন্দে আত্মহারা ছিল তাই এখানে তাদেরকে আদ কওমের কাহিনী শুনানো হচ্ছে। আরবে আদ জাতি এভাবে পরিচিত ছিল যে, প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডে তারা ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী কওম।

احقاف শব্দটি حقف শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বালুর এমন সব লম্বা লম্বা টিলা যা উচ্চতায় পাহাড়ের সমান নয়। পারিভাষিক অর্থে এটা আরব মরুভূমির (الربع الخالى) দক্ষিণ পশ্চিম অংশের নাম, বর্তমানে যেখানে কোন জনবসতি নেই। পরের পৃষ্ঠায় মানচিত্রে এর অবস্থান দেখুন ঃ

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে আদ কওমের আবাস ভূমি ওমান থেকে ইয়ামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর কুরআন মজীদ আমাদের বলছে, তাদের আদি বাসস্থান ছিল আল-আহক্বাফ। এখান থেকে বেরিয়ে তারা আশেপাশের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলো
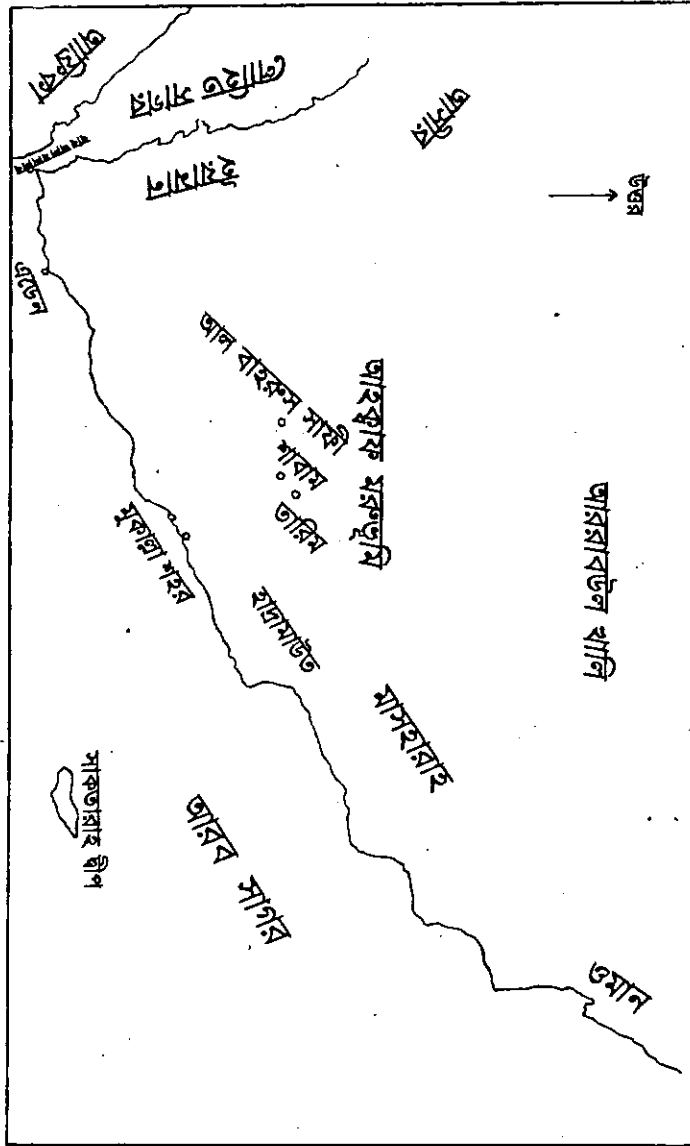
এবং দুর্বল জাতিসমূহকে গ্রাস করে ফেলেছিলো। বর্তমান কাল পর্যন্তও দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের মধ্যে একথা ছড়িয়ে আছে যে, এ এলাকাই ছিল আদ জাতির আবাস ভূমি। বর্তমানে "মুকাল্লা" শহর থেকে উত্তর দিকে ১২৫ মাইল দূরত্বে হাদ্রামাউতের একটি স্থানে লোকেরা হযরত হূদের (আ) মাযার তৈরী করে রেখেছে। সেটি হূদের কবর নামেই বিখ্যাত। প্রতি বছর ১৫ই শা'বান সেখানে 'উরস' হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এ কবরটি হূদের কবর

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

সে বললো ঃ এ ব্যাপারের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে।[২৬] যে পয়গাম দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি শুধু সেই পয়গাম তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিচ্ছি। তবে আমি দেখছি, তোমরা অজ্ঞতা প্রদর্শন করছো।[২৭] পরে যখন তারা সেই আযাবকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখলো, বলতে শুরু করলো ঃ এই তো মেঘ, আমাদের 'ওপর প্রচুর বারিবর্ষণ করবে–না',[২৮] এটা বরং সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, যার মধ্যে কষ্টদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে।

হিসেবে প্রমাণিত নয়। কিন্তু সেখানে তা নির্মাণ করা এবং দক্ষিণ আরবের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কম করে হলেও এতটুকু অবশ্যই প্রমাণ করে যে, আঞ্চলিক ঐতিহ্য এই এলাকাকেই আদ জাতির এলাকা বলে চিহ্নিত করে। এছাড়া হাদ্রামাউতে এমন কতিপয় ধ্বংসাবশেষ (Ruins) আছে যেগুলোকে আজ পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীরা আদের আবাসভূমি বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

আহক্বাফ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এক সময় এখানে জাঁকালো সভ্যতার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতি বাস করতো। সম্ভবত হাজার হাজার বছর পূর্বে এটা এক উর্বর অঞ্চল ছিল। পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন একে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। বর্তমানে এই এলাকা একটি বিশাল মরুভূমি, যার আভ্যন্তরীণ এলাকায় যাওয়ার সাহসও কারো নেই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাভেরিয়ার একজন সৈনিক এর দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় পৌছেছিলো। তার বক্তব্য হলো ঃ যদি হাদ্রামাউতের উত্তরাঞ্চলের উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, তাহলে বিশাল এই মরুপ্রান্তর এক হাজার ফুট নীচুতে দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মাঝে মাঝে এমন সাদা ভূমিখণ্ড আছে যেখানে কোন বস্তু পতিত হলে তা বালুকা রাশির নীচে তলিয়ে যেতে থাকে এবং একেবারে পচে খসে যায়। আরব বেদুইনরা এ অঞ্চলকে ভীষণ ভয় করে এবং কোন কিছুর বিনিময়েই সেখানে যেতে রাজি হয় না। এক পর্যায়ে বেদুইনরা তাকে সেখানে নিয়ে যেতে রাজি না হলে সে একাই সেখানে চলে যায়। তার বর্ণনা অনুসারে এখানকার বালু একেবারে মিহিন পাউডারের মত। সে দূর থেকে তার মধ্যে একটি দোলক নিক্ষেপ করলে ৫ মিনিটের মধ্যেই তা তলিয়ে যায় এবং যে রশির সাথে তা বাঁধা ছিল তার প্রান্ত গলে যায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ঃ.

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾

তার রবের নির্দেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলবে। অবশেষে তাদের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তাদের বসবাসের স্থান ছাড়া সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।[২৯] আমি তাদেরকে এমন কিছু দিয়েছিলাম যা তোমাদের দেইনি।[৩০] আমি তাদেরকে কান, চোখ, হৃদয়–মন সব কিছু দিয়েছিলাম। কিন্তু না সে কান তাদের কোন কাজে লেগেছে, না চোখ, না হৃদয়–মন। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।[৩১] তারা সেই জিনিসের পাল্লায় পড়ে গেল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করতো।

- Arabia and the Isles, Harold Ingram, London, 1946.
The unveiling of Arabia. R. H. Kirnan, London, 1937.
The Empty quarter, Phiby. London, 1933.

২৬. অর্থাৎ কবে তোমাদের ওপর আযাব আসবে তা শুধু আল্লাহই জানেন। তোমাদের ওপর কবে আযাব নাযিল করতে হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়া হবে তার ফায়সালা করা আমার কাজ নয়।

২৭. অর্থাৎ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে আমার এই সতর্কীকরণকে তোমরা তামাশার বস্তু বলে মনে করছো এবং খেলার সামগ্রীর মত আযাবের দাবী করে চলেছো। আল্লাহর আযাব যে কি ভয়াবহ জিনিস সে ধারণা তোমাদের নেই। তোমাদের আচরণের কারণে তা যে তোমাদের কাছে এসে গেছে সে বিষয়েও তোমরা অবগত নও।

২৮. এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট নয় যে, কে তাদেরকে এই জবাব দিয়েছিলো। বক্তব্যের ধরন থেকে আপনাআপনি এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, সেই সময় বাস্তব পরিস্থিতি তাদেরকে কার্যত যে জবাব দিয়েছিলো এটা ছিল সেই জবাব। তারা মনে করেছিলো এটা বৃষ্টির মেঘ, তাদের উপত্যকাসমূহ বর্ষণসিক্ত করার জন্য আসছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল প্রচণ্ড ঝড়–তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছিলো।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

আমি তোমাদের আশে পাশের এলাকায় বহু সংখ্যক জনপদ ধ্বংস করেছি। আমি আমার আয়াতসমূহ পাঠিয়ে বার বার নানাভাবে তাদের বুঝিয়েছি, হয়তো তারা বিরত হবে। কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব সত্তাকে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো[৩২] তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করলো না। বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। এটা ছিল তাদের মিথ্যা এবং মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের পরিণাম, যা তারা গড়ে নিয়েছিলো।

(আর সেই ঘটনাও উল্লেখযোগ্য) যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তারা কুরআন শোনে।[৩৩] যখন তারা সেইখানে পৌছলো (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে) তখন পরস্পরকে বললো ঃ চুপ করো। যখন তা পাঠ করা শেষ হলো তখন তারা সতর্ককারী হয়ে নিজ কওমের কাছে ফিরে গেল।

২৯. আদ জাতির কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, টীকা ৫১ থেকে ৫৬; হূদ, টীকা ৫৪ থেকে ৬৫; আল মু'মিনুন, টীকা ৩৪ থেকে ৩৭; আশ শূআরা, টীকা ৮৮ থেকে ৯৪; আল আনকাবূত, টীকা ৬৫; হা-মীম আস সাজদা, টীকা ২০ ও ২১।

৩০. অর্থাৎ অর্থ, সম্পদ, শক্তি, ক্ষমতা কোন বিষয়েই তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন তুলনা হয় না। তোমাদের ক্ষমতার ব্যাপ্তি মক্কা শহরের বাইরে কোথাও নেই। কিন্তু তারা পৃথিবীর একটি বড় অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো।

৩১. এই সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর আয়াতসমূহই সেই জিনিস যা মানুষকে প্রকৃত সত্যের সঠিক উপলব্ধি ও জ্ঞান দান করে। মানুষের যদি এই জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকে তাহলে সে চোখ দিয়ে টিকমত দেখতে পায়,

কান দিয়ে ঠিকমত শুনতে পায় এবং মন ও মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু সে যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ মানতে অস্বীকার করে তখন চোখ থাকা সত্ত্বেও ন্যায় ও সত্যকে চেনার মত দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য তার হয় না, কান থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি উপদেশ–বাণী শোনার বেলায় সে বধির হয় এবং মন ও মগজের যে নিয়ামত আল্লাহ তাকে দিয়েছেন তা দিয়ে সে উল্টা চিন্তা করে এবং একের পর এক ভ্রান্ত পরিণতির সম্মুখীন হতে থাকে। এমন কি তার সমস্ত শক্তি নিজের ধ্বংসসাধনেই ব্যয়িত হতে থাকে।

৩২. অর্থাৎ তারা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐ সব সত্তার সাথে ভক্তি শ্রদ্ধার সূচনা করেছিলো যে, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এদের অসীলায় আমরা আল্লাহর কাছে পৌছতে পারবো। কিন্তু এভাবে অগ্রসর হতে হতে তারা ঐ সব সত্তাকেই উপাস্য বানিয়ে নেয়। সাহায্যের জন্য তাদেরকেই ডাকতে থাকে, তাদের কাছেই প্রার্থনা করতে শুরু করে এবং তাদের সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করতে থাকে যে, তারাই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক, তাদের সাহায্যের আবেদনে তারাই সাড়া দেবে এবং বিপদ থেকে উদ্ধার তারাই করবে। তাদেরকে এই গোমরাহী থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ রসূলদের মাধ্যমে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠিয়ে নানাভাবে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা এই মিথ্যা খোদাদের দাসত্ব করতে বদ্ধপরিকর থাকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে এদেরকেই আঁকড়ে ধরে থাকার ব্যাপারে একগুঁয়েমি করতে থাকে। এখন বলো, যখন এই মুশরিক কওমের ওপর তাদের গোমরাহীর কারণে আল্লাহর আযাব আসলো তখন তাদের বিপদ ত্রাণকর্তা ও প্রার্থনা শ্রবণকারী উপাস্যরা কোথায় মরে পড়ে ছিলো? সেই দুর্দিনে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলো না কেন?

৩৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত যুবায়ের ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত হাসান বাসারী, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, যার ইবনু হুবায়েশ, মুজাহিদ, ইকরিমা ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিগণ থেকে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াতে জিনদের প্রথম উপস্থিতির যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা 'নাখলা' উপত্যকায় ঘটেছিলো। ইবনে ইসহাক, আবু নু'আইম ইসপাহানী এবং ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তায়েফ থেকে নিরাশ হয়ে মক্কায় ফেরার পথে নাখলা প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন এটা তখনকার ঘটনা। সেখানে এশা, ফজর কিংবা তাহাজ্জুদের নামাযে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। সেই সময় জিনদের একটি দল সে স্থান অতিক্রম করছিলো। তারা নবীর (সা). কিরায়াত শোনার জন্য থেমে পড়েছিলো। এর সাথে সাথে সমস্ত বর্ণনা এ ব্যাপারেও একমত যে, জিনেরা সেই সময় নবীর (সা) সামনে আসেনি, কিংবা তিনিও তাদের আগমন অনুভব করেননি। পরে আল্লাহ তাঁকে তাদের আগমনের এবং কুরআন তিলাওয়াত শোনার বিষয় অবহিত করেন।

যেখানে এ ঘটনা সংঘটিত হয়োছিলো সে স্থানটি ছিল اَلزَّيْمَهْ অথবা اَلسَّيْلُ الْكَبِيْرُ কারণ এ দুটি স্থানেই নাখলা প্রান্তরে অবস্থিত। উভয় স্থানেই পানি ও উর্বরতা বিদ্যমান। তায়েফ থেকে আগমনকারীকে যদি তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে হয়

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٣٠ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٣١

তারা গিয়ে বললো ঃ হে আমাদের কওমের লোকজন! আমরা এমন কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। যা ইতিপূর্বেকার সমস্ত কিতাবকে সমর্থন করে, ন্যায় ও সঠিক পথপ্রদর্শন করে।[৩৪] *হে আমাদের কওমের লোকেরা, আল্লাহর প্রতি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন।*[৩৫]

তাহলে এ দুটি স্থানের কোন একটিতে অবস্থান করতে পারে মানচিত্রে স্থান দুটির অবস্থান দেখুন ঃ
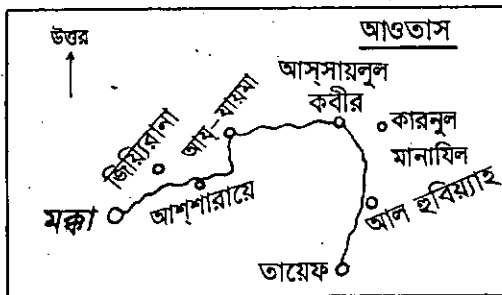
৩৪. এ থেকে জানা যায়, এসব জিন পূর্ব থেকে হযরত মূসা ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখতো। কুরআন শোনার পর তারা বুঝতে পারলো পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ যে শিক্ষা দিয়ে আসছেন এটাও সেই শিক্ষা। তাই তারা এই কিতাব এবং এর বাহক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনলো।

৩৫. নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, এরপর জিনদের প্রতিনিধি দল একের পর এক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে থাকে এবং তাঁর সাথে তাদের সামনা সামনি সাক্ষাত হতে থাকে। এ বিষয়ে হাদীস গ্রন্থসমূহে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তা একত্রিত করলে জানা যায়, হিজরতের পূর্বে মক্কায় এ রকম প্রায় ছয়টি প্রতিনিধি দল এসেছিলো।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۭ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۭ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

আর যে[৩৫] আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেবে না সে না পৃথিবীতে এমন শক্তি রাখে যে আল্লাহকে নিরূপায় ও অক্ষম করে ফেলতে পারে, না তার এমন কোন সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক আছে যে আল্লাহর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। এসব লোক সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।

যে আল্লাহ এই পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো সৃষ্টি করতে যিনি পরিশ্রান্ত হননি তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবিত করে তুলতে সক্ষম, এসব লোক কি তা বুঝে না? কেন পারবেন না, অবশ্যই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম। যে দিন এসব কাফেরকে আগুনের সামনে হাজির করা হবে সেদিন তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, "এটা কি বাস্তব ও সত্য নয়?" এরা বলবে "হাঁ, আমাদের রবের শপথ, (এটা প্রকৃতই সত্য)।" আল্লাহ বলবেন ঃ "ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যে অস্বীকার করতে তার পরিণতি হিসেবে এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।"

এসব প্রতিনিধি দলের একটি সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ একদিন রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত মক্কায় অনুপস্থিত ছিলেন। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম এই ভেবে যে, তাঁর ওপর হয়তো আক্রমণ হয়ে থাকবে। প্রত্যুষ্যে আমরা তাঁকে হেরা পর্বতের দিক থেকে আসতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন ঃ এক জিন আমাকে সংগে করে নিতে এসেছিলো। আমি তার সাথে গিয়ে জিনদের একটি দলকে কুরআন শুনিয়েছি (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদেরই আরো একটি বর্ণনা হচ্ছে, মক্কায়, একবার নবী (সা) সাহাবাদের (রা) বললেন ঃ আজ রাতে তোমাদের মধ্য থেকে কে আমার সাথে

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

অতএব, হে নবী, দৃঢ়চেতা রসূলদের মত ধৈর্য ধারণ করো এবং তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না।[৩৭] এদেরকে এখন যে জিনিসের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যেদিন এরা তা দেখবে সেদিন এদের মনে হবে যেন পৃথিবীতে অল্প কিছুক্ষণের বেশী অবস্থান করেনি। কথা পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে। অবাধ্য লোকেরা ছাড়া কি আর কেউ ধ্বংস হবে?

জিনদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাবে। আমি তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হলাম। মক্কার উচ্চভূমি এলাকায় এক স্থানে দাগ কেটে নবী (সা) আমাকে বললেন ঃ এটা অতিক্রম করবে না। অতপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। আমি দেখলাম, বহু লোক তাঁকে ঘিরে আছে এবং তারা আমার ও নবীর (সা) মাঝে আড়াল করে আছে (ইবনে জারীর, বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত, আবু নু'আইম ইসপাহানী)।

আরো একটি ক্ষেত্রেও রাতের বেলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন এবং নবী (সা) মক্কার হাজুন নামক স্থানে জিনদের একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করেছিলেন। এর বহু বছর পর ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফায় কৃষকদের একটি দলকে দেখে বলেছিলেন ঃ আমি হাজুনে জিনদের যে দলটিকে দেখেছিলাম তারা অনেকটা এই লোকগুলোর মত ছিল (ইবনে জারীর)।

৩৬. হতে পারে এই বাক্যাংশটি জিনদেরই উক্তির একটি অংশ। আবার এও হতে পারে যে, তাদের কথার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি যোগ করা হয়েছে। বক্তব্যের ধরন থেকে দ্বিতীয় মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

৩৭. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী নবী–রসূলগণ যেভাবে বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত ধৈর্য ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের জাতির অসন্তুষ্টি, বিরোধিতা, বাধা–বিপত্তি ও নানা রকম উৎপীড়নের মোকাবিলা করেছেন তুমিও সে রকম করো এবং কখনো মনে এরূপ ধারণাকে স্থান দিও না যে, হয় এসব লোক অনতিবিলম্বে ঈমান আনুক, নয়তো আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করুক।